*Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class IX of all Schools of West Bengal*
*[Vide Notification No. TB/74/IX/PS/50 and also Board's Letter No. 10367/G dated 24. 11. 75.]*

---

# প্রকৃতি-বিজ্ঞান

[ নবম শ্রেণীর জন্য ]



অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এস-সি.
রসায়ন বিভাগ, সিটি কলেজ, কলিকাতা। স্কুল ফাইন্যাল রসায়ন, উচ্চমাধ্যমিক ব্যবহারিক রসায়ন, ডিগ্রীকোর্সের 'A Text Book of Analytical Chemistry' ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক।

অধ্যাপক রণজিৎ বিলাস সাহাচৌধুরী, এম. এস-সি.
পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলিকাতা।

ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট :: কলিকাতা-৭০০০১২

প্রকাশক :

শ্রীপরেশচন্দ্র ভাওয়াল
ক্যালকাটা বুক হাউস
১/১, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১২

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর : ১৯৭৩
পুনর্মুদ্রণ
জানুয়ারী : ১৯৭৪
মে : ১৯৭৫

'Paper used for printing of this book was made available by the Govt. of India at a concessional rate.'

মূল্য : চার টাকা মাত্র।

মুদ্রাকর :

শ্রীপবিত্রলাল দত্ত
প্রিণ্টোগ্রাফ
১০১, বৈঠকখানা রোড
কলিকাতা-৭০০০০৯

শ্রীনিরঞ্জন দাস
দাস প্রিণ্টার্স
১৭, বুদ্ধু ওস্তাগর লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

# ভূমিকা

মানুষ তাহার জন্মলগ্নেই কুটিলা, ভয়ঙ্করা প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রয়োজনের তাগিদে নিজের অজ্ঞাতসারেই যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। একদিকে আক্রমণ অপরদিকে আত্মরক্ষা—এই দুইয়ের সংঘাতে সৃষ্টি হইয়াছে বিজ্ঞান। মানুষ প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিতে চায় এবং এই লড়াইয়ে মানুষ প্রকৃতির হাত হইতে উহার ধনভাণ্ডারের চাবিকাঠি একের পর এক নিজের হাতে কাড়িয়া লইতেছে। এইভাবে মানুষ তাহার পরিবেশকে আরও সুন্দর এবং পৃথিবী নামক গ্রহটিকে তাহার বসবাসের পক্ষে আরও উপযোগী করিয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছে। ইহা ছাড়া, অজানাকে জানিবার যে অতৃপ্ত বাসনা তাহাও মানুষের বিজ্ঞান অনুশীলনের অন্যতম কারন। বিজ্ঞান অর্থবিশিষ্ট বা সম্যক্ জ্ঞান। বিজ্ঞান বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সন্ধান দেয়—বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সত্য স্বরূপটি আমাদের কাছে উদ্ঘাটিত করে—কোন কার্যকারন সূত্রে অণু-পরমাণু গ্রথিত উহা আবিষ্কার করে। সুতরাং, বিজ্ঞানপাঠে আমরা বস্তুর মূলগত পরিচয় লাভ করি। বিচিত্র এবং অগণিত বস্তুপুঞ্জের অন্তরালে কি কি মূল উপাদান নিহিত রহিয়াছে উহা জানিতে সমর্থ হই।

কিন্তু পদার্থ ও শক্তির লীলাক্ষেত্র এই বিরাট বিশ্ব প্রকৃতির সবকিছুই জানা এবং বুঝা কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। অতি পরিচিত ঘটনাসমূহের সম্যক্ উপলব্ধির উপর ভিত্তি করিয়া বিজ্ঞান শিক্ষার বনিয়াদ গড়িয়া তোলাই সাধারণ বিজ্ঞান ( General Science ) শিক্ষার উদ্দেশ্য। তাই, সুপরিকল্পিত পাঠক্রমের অনুসরণে এইরূপ রচনা আবশ্যিক যাহার রচনাশৈলী ছাত্র-ছাত্রীদের মনে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করে ; ঘটনা বিচয়ন ও গ্রহন তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণের পক্ষে সহায়ক হয় এবং সর্বোপরি যাহা ভবিষ্যতে তাহাদিগকে সংস্কারমুক্ত মনের বলিষ্ঠ মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিতে সাহায্য করে।

এই পুস্তকখানি রচনায় যত্নসাধ্য পরিকল্পনার মাধ্যমে উক্ত উদ্দেশ্যসাধনে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। তবে, পুস্তক যে ত্রুটিবিহীন হইয়াছে তাহা বলিবার দুঃসাহস আমাদের নাই।

সুধী এবং সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদিগের মতামত আগামী সংস্করণের উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হইবে বলিয়া আশা করি।

কলিকাতা
২৫।১২।৭৩

শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়
রণজিৎবিলাস সাহা চৌধুরী

## Syllabus

Common to both Physics & Chemistry—
(A single text-book covering the items)

1. Systems of measurement. Different physical quantities and their units. Measuring devices : Ordinary scale, common balance, measuring cylinders, clocks.

2. Matter and energy. Mass and weight, conservation of mass and conservation of energy. Different forms of energy. Transformation of energy (non-quantitative treatment).

3. Change of state. Freezing, melting, boiling, evaporation and condensation. Melting point and boiling point. Factors effecting them, Idea of latent heat.

## PHYSICS

1. Rest and motion ; Displacement, speed, velocity, acceleration and retardation. Newton's laws of motion. Definition of force. (Equations of motion excluded. Rotational motion excluded).

2. Work, energy and power—potential and kinetic energy. Units (No sums). Simple machines inclined plane, wheel and axles and levers (Not mathematical).

3. Nature of heat. Heat and temperature. Factors determining the quantities of heat. Heat as a form of energy. Relationship with work.

4. Source of light. Ray of light. Reflection and Refraction of light. Total internal reflection. Explanation of some natural phenomena on the basis of refraction and reflection. Propagation and velocity of light. Convex lens and its focussing action. Focal length. Convex lens as a magnifying glass. Dispersion of light. Spectrum (Demonstration .

## CHEMISTRY

1. (i) Physical states of matter—reasons for existence of the three states—Melting and boiling points.

   (ii) Identification of matter—physical and chemical properties—How matter (solid, liquid and gas) differs in physical properties (touch, colour, smell, solubility, magnetic property etc.) and chemical properties (behaviour on heating, treatment with acids, etc.)

   (iii) Physical and chemical changes : factors which induce and regulate chemical change viz., contact, temperature, pressure, catalysis, etc. Exothermic and Endothermic change :

   (iv) Elements and Compounds—Metals and Non-Metals.
2. Solution—Solvent and Solute : Unsaturated and saturated solution. Solubility and its relation with temperature.
3. Symbols, formula and chemical equations : Significance of chemical equations and balancing simple equations.
4. Electrolysis—Electrolytes and non-electrolytes—Decomposition of water : Electroplating.
5. Ideas of acids, bases and salts : Neutralization.
6. Oxidation and reduction.
7. Liquid air. Nitrogen and $CO_2$ Cycle (Elementary ideas) ; use of the rare gases in air, Neon lighting.
8. Simple method of preparation and properties of Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Ammonia, Carbon dioxide, Sulphur dioxide, Sulphuretted hydrogen.

## বিষয়সূচী

## পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন

## রসায়ন

## প্রথম অধ্যায় ঃ একক ও পরিমাপের পদ্ধতি

[ Units and System of Measurement ]

### 1-1. ভৌত রাশি ( Physical Quantities ) ঃ

প্রকৃতিবিজ্ঞানে এমন বহু বিষয় আলোচনা করা হয় যাহাদের সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায় এবং ঐ সকল বিষয়ের পরিমাপ জানিতে পারিলেই বিষয়টি ঠিক জানা যায়।

একখণ্ড পাথর হাতে তুলিলে তুমি কিছু পরিমাণ কষ্টবোধ কর। উহার **ওজন** আছে বলিয়া এমন বোধ হয়। বড় পাথর হইলে কষ্টবোধ বেশী হইবে কারণ ওজন বেশী হয়। এই ওজন আমরা তুলার সাহায্যে মাপিতে পারি। একটি টেবিল কত লম্বা বা চওড়া তাহা আমরা উহার দুইদিক বরাবর **দৈর্ঘ্য** স্কেলের সাহায্যে মাপিয়া জানিতে পারি। একটি ঘটনা ঘটিতে কিছু **সময়** লাগিল। কত সময় লাগিল তাহা আমরা ঘড়ির সাহায্যে মাপিয়া জানিতে পারি।

এখানে **ওজন, দৈর্ঘ্য, সময়** এইগুলি **রাশি**। ইহাদের পরিমাপ আছে। এমন শত শত রাশির সহিত প্রকৃতিবিজ্ঞানে আমাদের পরিচয় হয়।

পরিমাপ করা যায় এমন যে কোন জিনিসকেই **ভৌত রাশি** বলা হয়।

### 1-2. পরিমাপের একক ( Units of Measurement ) ঃ

কোন রাশির পরিমাপ সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করিতে গেলে ঐ রাশিকে উহার একটি সুবিধাজনক জানা পরিমাণের তুলনায় প্রকাশ করিতে হয়। এই নির্দিষ্ট বা জানা পরিমাণই হইল রাশির একক।

একটি টেবিল 5 **হাত** লম্বা যেইমাত্র এই কথাটি বলিলাম, আমরা বুঝিতে পারিলাম টেবিলটা কত লম্বা। কারণ 1 **হাত** একটা নির্দিষ্ট জানা দৈর্ঘ্য এবং এই নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য **হাত**-এর 5 গুণ পরিমিত দৈর্ঘ্যই টেবিলটির দৈর্ঘ্য। এখানে হাত দৈর্ঘ্যের একক।

আবার মনে কর, তুমি বাজার হইতে কিছু পরিমাণ চাউল আনিয়াছ। আমরা চাউলের পরিমাণ ঠিক কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। কিন্তু যদি বল তুমি 5 কিলোগ্রাম চাউল আনিয়াছ তাহা হইলে আমাদের চাউলের পরিমাণ সম্বন্ধে একটা সঠিক ধারণা জন্মে। কারণ 1 কিলোগ্রাম চাউল বলিতে কতটুকু

পরিমাণ চাউল বোঝায় তাহার ধারণা আমাদের আছে। এখানে কিলোগ্রাম চাউলের পরিমাণ বা চাউলের ভরের একক।

একটি ট্রেণ খুব দ্রুত যাইতেছে বলিলেই উহার দ্রুততার ধারণা আমরা ঠিক করিতে পারি না। একটি নির্দিষ্ট সময়ে ট্রেণটি কতদূর যাইতে পারে বলিলেই উহার দ্রুততার ধারণা আমরা করিতে পারি। মনে কর, ট্রেণটি 1 ঘণ্টায় 50 মাইল যাইতে পারে। আমরা বলি উহার দ্রুততা বা বেগ 50 মাইল প্রতি ঘণ্টায়। এখানে **1** মাইল প্রতি ঘণ্টায় এই নির্দিষ্ট বেগকে বেগের একক হিসাবে পছন্দ করিয়া লই।

একটি রাশিকে প্রকাশ করিতে হইলে একটি সংখ্যা এবং একটি এককের প্রয়োজন হয়। একই রাশিকে ভিন্ন এককে প্রকাশ করিলে ঐ রাশিকেই আবার ভিন্ন সংখ্যাদ্বারা প্রকাশ করিতে হইবে। যেমন, ট্রেনের বেগ 50 মাইল প্রতি ঘণ্টায় না বলিয়া 80 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বলিলে একই বেগ বোঝায়। 5 কিলোগ্রাম চাউলের পরিবর্তে 5000 গ্রাম চাউল বলিলে একই পরিমাণ চাউল বোঝায়।

**সংজ্ঞা**ঃ কোন রাশির পরিমাপ প্রকাশের জন্য সেই রাশির একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট পরিমাণকে পছন্দ করিয়া লওয়া হয়—উহাকে সেই রাশির একক বলে।

## 1-3. প্রাথমিক একক ( Fundamental Units ) ঃ

পূর্বেই জানিয়াছ প্রকৃতিবিজ্ঞানে শত শত ভিন্ন ভিন্ন রাশি আছে এবং প্রত্যেক রাশি প্রকাশ করিবার জন্য একটি এককের প্রয়োজন হয়। তবে দেখা যায় তিনটি বিশেষ রাশির একক জানিলে অন্যান্য রাশির একক উহাদের একক হইতে বাহির করা যাইতে পারে। এই বিশেষ রাশি তিনটি হইল—(i) দৈর্ঘ্য, (ii) ভর ও (iii) সময়।

ইহাদের একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে—অর্থাৎ একটি হইতে অপরটির একক জানা সম্ভব নহে। কিন্তু অন্যান্য রাশির একক ইহাদের এক বা একাধিক রাশির এককের উপর নির্ভরশীল।

যে রাশি তিনটির একক পরস্পরের উপর নির্ভরশীল নহে অথচ যেগুলি হইতে অন্যান্য রাশির একক বাহির করা যাইতে পারে তাহাদের বলা হয়—প্রাথমিক রাশি। দৈর্ঘ্য, ভর, সময় এই তিনটি প্রাথমিক রাশি। ইহাদের একককে বলা হয় প্রাথমিক একক।

অন্যান্য রাশির একক যাহারা একেবারে স্বতন্ত্র নহে এবং ঐ তিনটি প্রাথমিক এককের এক বা একাধিকের উপর কোনভাবে নির্ভরশীল তাহাদের বলা হয় **লব্ধ একক** (derived units)।

## 1-4. এককের বিভিন্ন পদ্ধতি (Systems of Units):

কোন বিশেষ দৈর্ঘ্যকে দৈর্ঘ্যের একক, কোনও বিশেষ ভরকে ভরের একক, কোনও বিশেষ সময়ের ব্যবধানকে সময়ের একক বলিয়া পছন্দ করিয়া লওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে একই রাশি মাপিবার বিভিন্ন একক এখনও প্রচলিত আছে। বিজ্ঞান এই সকল এককের সংখ্যা যথাসম্ভব কমাইয়াছে।

বিজ্ঞানে সাধারণতঃ দুই রকমের একক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যথা:

(i) **সি. জি. এস্.** (C. G. S) পদ্ধতি এবং (ii) **এফ্. পি. এস্.** (F. P. S.) পদ্ধতি।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে **দৈর্ঘ্যের** একক **সেন্টিমিটার** (centimetre)
**ভরের** একক **গ্রাম** (gramme)
এবং **সময়ের** একক **সেকেণ্ড** (second)

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে **দৈর্ঘ্যের** একক **ফুট** (foot)
**ভরের** একক **পাউণ্ড** (pound)
এবং **সময়ের** একক **সেকেণ্ড** (second)

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতির প্রচলন বর্তমানে খুব সীমিত। সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে দশমিকের সাহায্যে হিসাব করা যায় বলিয়া ইহার ব্যবহার অধিকতর সুবিধাজনক এবং বিজ্ঞানে এই পদ্ধতির ব্যবহারই বেশী।

উপরি উক্ত দুইটি পদ্ধতি ছাড়াও বিজ্ঞান-জগতে বর্তমানে আর একটি পদ্ধতির বহুল প্রচলন দেখা যায়। ইহার নাম **এম্. কে. এস্.** (M. K. S.) পদ্ধতি।

এই পদ্ধতিতে—

**দৈর্ঘ্যের** একক **মিটার** (metre)
**ভরের** একক **কিলোগ্রাম** (kilogram)
এবং **সময়ের** একক **সেকেণ্ড** (second)

### 1·5. দৈর্ঘ্যের একক ( Units of Length ) :

কোনও দৈর্ঘ্যের পরিমাপ প্রকাশ করিতে হইলে উহা একটি নির্দিষ্ট পরিচিত দৈর্ঘ্যের বা একক দৈর্ঘ্যের কতগুণ সেই হিসাবে প্রকাশ করিতে হয়। সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে সেই একক দৈর্ঘ্যটিকে এক **সেন্টিমিটার** ধরা হইয়াছে। এক সেন্টিমিটার এক মিটারের একশত ভাগের এক ভাগ। এক **মিটার** (Metre) বলিতে কি বুঝায় ?

প্যারিসের অদূরে শেভ্রের একস্থানে (Bureau des Poids et Measures) 0°C তাপমাত্রায় রাখা প্লাটিনাম-ইরিডিয়ামের ( 90 ভাগ প্লাটিনাম 10 ভাগ ইরিডিয়াম ) একটি ধাতুদণ্ডের দুই প্রান্তের দুইটি অতি সূক্ষ্মরেখার মধ্যের দূরত্বকে এক মিটার বলিয়া ধরা হয়। এই বিশেষ দৈর্ঘ্যের নাম দেওয়া হয় **মুল আন্তর্জাতিক মিটার**। উহার বিশ্বস্ত অনুকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রাখা আছে। এই বিশেষ দৈর্ঘ্যকে প্রমাণ বা স্ট্যাণ্ডার্ড মিটার ধরিয়া লইয়া দৈর্ঘ্যমাপণী মিটার স্কেল তৈয়ার করা হয়। সুবিধামত উহা হইতে আরও উচ্চতর এবং নিম্নতর দৈর্ঘ্যের একক ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যেমন—

| | |
|---|---|
| 10 মিলিমিটার ( মি মি. বা mm. ) | =1 সেন্টিমিটার ( সে. মি. বা cm.) |
| 10 সেন্টিমিটার | =1 ডেসিমিটার (ডেসি মি. বা dm ) |
| 10 ডেসিমিটার | =1 মিটার ( মি. বা m. ) |
| 10 মিটার | =1 ডেকামিটার (ডেকা মি. বা Dm.) |
| 10 ডেকামিটার | =1 হেক্টোমিটার (হে. মি. বা Hm.) |
| 10 হেক্টোমিটার | =1 কিলোমিটার (কি.মি. বা Km.) |

তবে মিলিমিটার ( 0·1 সেন্টিমিটার ), সেন্টিমিটার, মিটার ( 100 সে. মি. ) এবং কিলোমিটার ( 1000 মি. বা 100,000 সে. মি. ) এই এককগুলি অধিকতর প্রচলিত।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক ফুট। ব্রিটিশ মিউজিয়মে 62 ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপমাত্রায় রাখা ব্রঞ্জ নির্মিত একটি দণ্ডের দুই প্রান্তের দুইটি সোনার প্লাগের উপর দুইটি রেখাচিহ্নের অন্তর্বর্তী দূরত্বকে 1 **গজ** বলে। 1 ফুট হইল 1 গজের এক-তৃতীয়াংশ। 1 ফুটের গুণিতক ও ভগ্নাংশ লইয়া আরও বড় ও ছোট একক ব্যবহার করা হয়। যেমন—

| | |
|---|---|
| 1 মাইল | =1760 গজ |
| 1 ফার্লং | =220 গজ |

| | |
|---|---|
| 1 গজ | =3 ফুট |
| 1 ফুট | =12 ইঞ্চি |

মনে রাখিবে

| | |
|---|---|
| 1 ইঞ্চি | =2·54 সেন্টিমিটার |
| 1 ফুট | =30·48 সে. মি. |
| 1 গজ | =91·44 সে. মি.=0·9144 মিটার |
| 1 মাইল | =1·609 কিলোমিটার |
| আবার 1 সে. মি. | =0·3937 ইঞ্চি=0·0328 ফুট |
| 1 মিটার | =1·0936 গজ=39·37 ইঞ্চি |
| 1 কি. মি. | =0·621 মাইল |

## 1-6. ক্ষেত্রফলের একক ( Unit of Area ) :

যে কোনও সমতল বা বক্রপৃষ্ঠের একটি বিস্তার বা ক্ষেত্রফল আছে। একটি বর্গাকার সমতলপৃষ্ঠের ক্ষেত্রফলকে ক্ষেত্রফলের একক হিসাবে পছন্দ করা যাইতে পারে এবং এই ক্ষেত্রফলের তুলনায় যে কোনও তলের ক্ষেত্রফল প্রকাশ করা যাইতে পারে। 1 সে. মি. দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল=1 সে. মি. ×1 সে. মি.=1 বর্গ সে. মি.। অনুরূপে 1 ফুট দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল=1 বর্গফুট।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক=1 বর্গ সে. মি. বা সে. মি$^2$.

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষেত্রফলের একক=1 বর্গফুট বা ফুট$^2$.

## 1-7. আয়তনের একক ( Unit of Volume ) :

**কোনও বস্তু কতখানি জায়গা জুড়িয়া আছে তাহার পরিমাণকে উহার আয়তন বলে।** একটি একক ঘনকের আয়তনকে আয়তনের একক ধরা সুবিধাজনক। একক ঘনকের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা সবই এক একক। সুতরাং সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে আয়তনের একক হইবে—

দৈর্ঘ্য ( =1 সে. মি. )×প্রস্থ ( =1 সে. মি. )×উচ্চতা ( =1 সে. মি. )
=1 ঘন সে. মি.=1 সি. সি. ( c. c. )

অনুরূপে এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে

আয়তনের একক=1 ঘন ফুট ( c. ft. )

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে **'লিটার'** (litre) নামক আর একটি একক দ্বারাও আয়তনকে প্রকাশ করা হয়। ইহা বিশেষভাবে তরলের আয়তনের একক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

1 লিটার = 1000 সি. সি. ( প্রায় )

1 মিলিলিটার = 1 সি. সি. ,,

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে তরলের আয়তনের ক্ষেত্রে **'গ্যালন'** ( gallon ) একক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

এক গ্যালন = 62° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় 10 পাউণ্ড জলের আয়তন = 0·16 ঘন ফুট।

**উদাহরণ :** 1 ঘন ফুট = কত লিটার ?

1 ঘন ফুট = 1 ফুট × 1 ফুট × 1 ফুট = 1 ফুট$^3$

= (30·48 সে. মি.)$^3$ = 28317 সি. সি.

= 28·317 লিটার

| 1 গ্যালন = 4·53 লিটার ( প্রায় ) |
|---|

**1-8. ভরের একক ( Unit of mass ) :**

কোন বস্তুতে যে পরিমাণ পদার্থ আছে তাহাকে বলা হয় ঐ বস্তুর **ভর**।

প্লাটিনাম ইরিডিয়ামের সংকর ধাতু নির্মিত একটি স্তম্ভক প্যারিসের কাছে শেভ্রেতে রাখা আছে, এই স্তম্ভকের ভরকে **কিলোগ্রাম** বলা হয়।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ভরের একক স্থির হইয়াছে গ্রাম (gramme)। এক গ্রাম এক কিলোগ্রামের 1000 ভাগের এক ভাগ।

সাধারণতঃ অর্থাৎ মোটামুটি হিসাবের ক্ষেত্রে 4° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রক্ষিত 1 ঘন সেন্টিমিটার জলের ভর 1 গ্রাম ধরা হয়।

ব্রিটিশ পদ্ধতিতে একইভাবে একটি নির্দিষ্ট ধাতুখণ্ডের ভরকে এক পাউণ্ড ভর বলা হইয়া থাকে।

ভরের বিভিন্ন প্রচলিত একক এবং তাহাদের সম্বন্ধ নিম্নে দেওয়া হইল।

| | |
|---|---|
| 16 আউন্স (oz.) | = 1 পাউণ্ড (lb.) |
| 28 পাউণ্ড | = 1 কোয়ার্টার |
| 4 কোয়ার্টার | = 1 হন্দর (cwt) |
| 20 হন্দর | = 1 টন বা 2240 পাউণ্ড। |

আবার,

| | |
|---|---|
| 1 গ্রাম = 10 ডেসিগ্রাম | 10 গ্রাম = 1 ডেকাগ্রাম |
| 1 ডেসিগ্রাম = 10 সেন্টিগ্রাম | 10 ডেকাগ্রাম = 1 হেক্টোগ্রাম |
| 1 সেন্টিগ্রাম = 10 মিলিগ্রাম | 10 হেক্টোগ্রাম = 1 কিলোগ্রাম |
| | 100 কিলোগ্রাম = 1 কুইণ্টল |
| | 1000 কিলোগ্রাম = 1 মেট্রিক টন |

তবে, অধিকতর প্রচলিত এককগুলি হইতেছে মিলিগ্রাম (·001 গ্রাম), গ্রাম, কিলোগ্রাম ( 1000 গ্রাম )।

**মনে রাখিবে ঃ** 1 পাউণ্ড = 453·6 গ্রাম
1 কিলোগ্রাম = 2·204 পাউণ্ড

**1-9. সময়ের একক** ( Unit of time ) ঃ

দুইটি ঘটনার মধ্যবর্তী সময়কালকে পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক একক দরকার। পুনরাবৃত্ত হয় এমন ঘটনাকে সময়ের এককের জন্য ব্যবহার করা সুবিধাজনক। ঘটনাটির পর পর দুইবার পুনরাবর্তনের অন্তর্বর্তীকালীন সময়কে বা তাহার কোনও গুণিতক বা ভগ্নাংশকে সময়ের একক হিসাবে লওয়া চলে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতির বা উহার নিজ অক্ষের চতুর্দিকে ঘুরিবার জন্য সূর্য পূর্বদিকে উঠে ও পশ্চিমদিকে অস্ত যায় এবং সূর্য প্রতিদিন উত্তর-দক্ষিণ সরল-রেখা ( মধ্যরেখা ) অতিক্রম করে। কোনও স্থানে পর পর দুইবার মধ্যরেখা অতিক্রম করিতে সূর্যের যে সময় লাগে তাহাকে **সৌরদিন** ( Solar day ) বলে। কয়েকটি কারণে সৌরদিন বৎসরের সব সময় সমান মানের হয় না। সারা বৎসরে সৌর দিনের গড়কে **গড় সৌরদিন** বলে।

এক গড় সৌরদিনের $\frac{1}{24 \times 60 \times 60} = \frac{1}{86400}$ অংশ হইল এক গড় সৌর সেকেণ্ড বা সংক্ষেপে **সেকেণ্ড** ( second )।

1 সৌরদিবস = 24 ঘণ্টা
1 ঘণ্টা = 60 মিনিট
1 মিনিট = 60 সেকেণ্ড

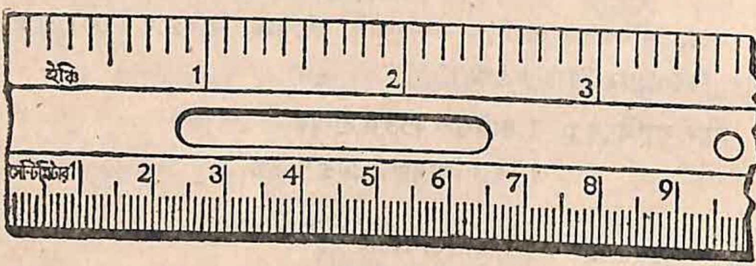
**মনে রাখিও ঃ** সি. জি. এস্. ও এফ্. পি. এস্. উভয় পদ্ধতিতেই সময়ের একক **সেকেণ্ড**।

# দৈর্ঘ্য, ভর ও সময়ের পরিমাপ

## [ Measurement of Length, Mass and Time ]

### 1-10. দৈর্ঘ্যের পরিমাপ—মিটার স্কেল :

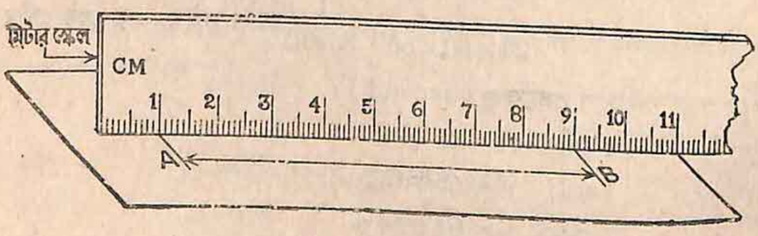
দৈর্ঘ্য মাপিবার জন্য সাধারণতঃ যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাহার নাম **মিটার স্কেল**। ইহা কাঠ বা ধাতু নির্মিত হইয়া থাকে এবং ইহা এক মিটার




চিত্র নং 1 (i)—স্কেল

বা অর্ধ-মিটার লম্বা হয়। এক মিটারের ভগ্নাংশ সেন্টিমিটার ও তাহার ভগ্নাংশ মিলিমিটার ইত্যাদি স্কেলের নীচের দিকে দাগ কাটা থাকে এবং স্কেলের উপর দিকে ইঞ্চি এবং তাহার দশমাংশে দাগ কাটা থাকে [ চিত্র 1 (i) ]। শুধু ইঞ্চি এবং তাহার দশমাংশ দাগগুলি কাটা থাকিলে তাহার নাম হয় **ফুট রুল**।

মনে কর, একটি সরলরেখা AB-এর দৈর্ঘ্য মাপিতে হইবে। স্কেলটিকে এমনভাবে রেখাটির উপর রাখ যাহাতে স্কেলটির দাগ কাটা দিকটা রেখাটির উপর লম্বালম্বিভাবে মিশিয়া যায় [ চিত্র 1 (ii) ]। এখন AB রেখাটির একটি প্রান্ত A স্কেলের একটি বড় দাগের ( মনে কর 1 cm. দাগ ) সহিত মিলাইয়া

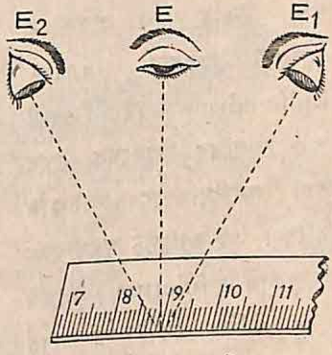



চিত্র নং 1 (ii)—মিটার স্কেলের সাহায্যে দৈর্ঘ্য নির্ণয়

রাখ এবং তারপর ঠিক সোজাসুজি তাকাইয়া দেখ B-প্রান্ত স্কেলের কোন্

দাগের উপর আছে। মনে কর, উহা 9·0 সে.মি. দাগের উপর আছে। তাহা হইলে AB-এর দৈর্ঘ্য = 9·0 সে.মি. − 1·0 সে.মি. = 8·0 সে.মি.।

আবার, যদি দেখ যে B-প্রান্ত স্কেলের ঠিক কোন দাগের সহিত না মিলিয়া পাশাপাশি দুইটি মিলিমিটার দাগের ( মনে কর 8·9 সে. মি. এবং 9·0 সে.মি. ) মাঝামাঝি কোথাও আছে, তখন চোখের আন্দাজের ( eye estimation ) সাহায্যে এক মিলিমিটারকে মোটামুটি দশ বা পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া চোখের আন্দাজ মত দেখিবে ঐ রকম কত ভাগের সহিত B-প্রান্তটি মিলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মনে কর, 8·9 সে.মি. দাগের পর চোখের আন্দাজমত আরও 1 মি. মি.-এর চার-পঞ্চমাংশ ( বা 4 × 0·2 মি.মি. ) B-প্রান্তের পাঠের জন্য দরকার হয়। তখন B-প্রান্তের পাঠ হইবে 8·9 সে.মি. + 0·08 সে.মি. = 8·93 সে.মি. ; কিন্তু এইরূপ আন্দাজ-পদ্ধতি মোটেই ত্রুটিহীন বলা চলে না।



চিত্র নং 1 (iii) - দৃষ্টিভ্রম

মনে রাখিবে, স্কেলের পাঠ করিবার সময় সর্বদা সোজাসুজি তাকাইয়া পাঠ লইতে হইবে, নচেৎ পাঠে দৃষ্টিভ্রম ( parallax )-জনিত ত্রুটি হইবে। তির্যকভাবে তাকাইয়া পাঠ লইলে বিভিন্ন দিক হইতে পাঠ বিভিন্ন হইবে। চিত্র 1 (iii) হইতে উহা বুঝিতে ( E চোখের সঠিক অবস্থান ) পারিবে।

সূক্ষ্মভাবে দৈর্ঘ্য মাপার জন্য ভার্নিয়ার স্কেল ( vernier scale ) নামক একপ্রকার স্কেল ব্যবহার করা হয়। উহাতে 0·001 সে.মি. পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা ( accuracy ) পাওয়া যায়।

## ভরের পরিমাপ

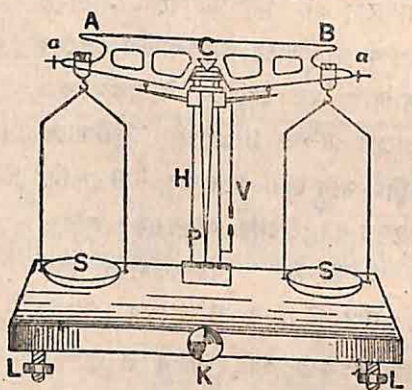
**1-11. সাধারণ তুলা** ( Common Balance )

কোনও বস্তুর ভর মাপিতে হইলে সাধারণতঃ 'সাধারণ তুলা'র সাহায্যে তাহা করা হয়। 'ভর মাপাকে' যদিও সাধারণভাবে 'ওজন করা' অর্থে ব্যবহার করা হয়, আসলে 'ওজন করা' পদার্থ বিজ্ঞানে যে অর্থে ব্যবহার করা হয় তাহা

**স্প্রিং তুলার** সাহায্যে সোজাসুজি করা হইয়া থাকে। সাধারণ তুলায় কতকগুলি প্রমাণ বাটখারার সহিত তুলণামূলকভাবে কোন বস্তুর ভর বাহির করা হয়।

একটি সাধারণ তুলার প্রধান অংশগুলির বর্ণনা দেওয়া হইল [ চিত্র 2 ]ঃ

(i) **তুলা দণ্ড** ( Balance Beam ) AB—ইহা একটি ধাতুনির্মিত লম্বা দণ্ড। উহার ঠিক মাঝখানে অ্যাগেট ক্ষুরধার ( agate knife-edge ) নামীয় একটি শক্ত পাথরের প্রিজমের উপর ইহা আলগাভাবে আটকান থাকে। এই অ্যাগেট ক্ষুরধারকে ফালক্রাম ( fulcrum ) বলে। ধাতু নির্মিত একটি দৃঢ় অথচ ফাঁপা স্তম্ভ (H) একটি অনুভূমিক শক্ত পাটাতনের উপর খাড়াভাবে পোঁতা আছে। স্তম্ভটির মাথায় একটি অ্যাগেটপাতের উপর ক্ষুরধারটি বসান থাকে। স্তম্ভটির নীচের দিকে একটি স্কেল থাকে।



চিত্র নং 2- সাধারণ তুলা

(ii) K—একটি চাবি। ইহাকে ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডটিকে উপরে বা নীচে নামান যায়। উপরে উঠাইলে ফালক্রামের উপর রাখা তুলাদণ্ডটি ক্ষুরধারের উপর দোল খাইবে এবং নীচে নামাইয়া রাখিলে তুলাদণ্ডটি স্থির থাকিবে।

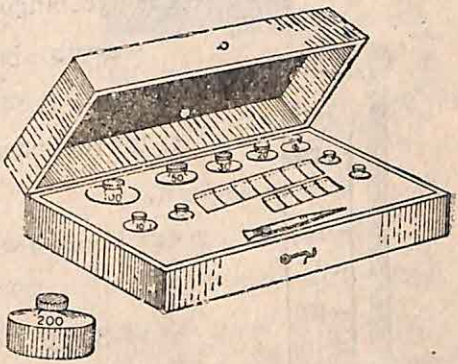
(iii) **সূচক** ( Pointer ) P—ইহা একটি লম্বা এবং সরু কাঁটা। তুলাদণ্ডের মাঝখানে লম্বভাবে ইহা আবদ্ধ। তুলাদণ্ড দোল খাওয়ার সময় সূচকের নীচের সূচালো দিকটি স্কেলের গা ঘেঁষিয়া এদিক-ওদিক দোলে। তুলাদণ্ড স্থির থাকিলে সূচক স্কেলের মধ্যদাগ বা 0-দাগের উপর থাকে।

(iv) তুলাদণ্ডের দুইপ্রান্ত A ও B হইতে সমান ভরের ও সমান দৈর্ঘ্যের দুইটি ষ্টিরাপ ( stirrup ) ঝুলানো থাকে। ইহাদের নীচে সমান ভরের দুইটি পাত্র ( pans ) S, S থাকে। A, B প্রান্তে দণ্ডের উপর দুইটি ছোট অ্যাগেট প্রিজম লাগান থাকে। এই প্রিজম দুইটির উপর হুক দুইটি আলগাভাবে লাগান থাকে।

(v) **স্ক্রু**—তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটি স্ক্রু ( $a$, $a$ ) থাকে। ইহাদের

ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডের দৈর্ঘ্য বরাবর ভিতরের দিকে বা বাহিরের দিকে লইয়া যাওয়া যায়। তুলাপাত্র খালি থাকিলে তুলাদণ্ড যদি অনুভূমিক না থাকে তাহা হইলে ঐ স্ক্রু দুইটিকে ঘুরাইয়া দণ্ডটিকে অনুভূমিক করিতে হয়।

(vi) **ওলন দড়ি** ( plumb line )—প্রত্যেক তুলার সহিত একটি ওলন দড়ি (V) থাকে। ইহার সাহায্যে স্তম্ভ H ঠিক খাড়া আছে কি না বুঝিতে পারা যায়। ঠিক খাড়া না থাকিলে পাটাতনের নীচের স্ক্রু-এর সাহায্যে তাহা করা হয়। বাহিরের বায়ু-প্রবাহ হইতে তুলাযন্ত্রের কার্যে যাহাতে বিঘ্ন না হয় সেজন্য যন্ত্রটি কাচের বাক্সের ভিতর রাখা হয়।




চিত্র নং 3– ওজনের বাক্স

(vii) **ওজনের বাক্স**—প্রত্যেক তুলার সহিত একটি ওজনের বাক্স ( চিত্র 3 ) থাকে উহাতে নানা রকম ভরের প্রমাণ বাটখারা থাকে। যথা 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 500 মিলিগ্রাম, 200 মিলিগ্রাম ইত্যাদি। তবে 10 মিলিগ্রামের কম বাটখারা সাধারণতঃ থাকে না। ইহাদিগকে কখনও হাত দিয়া স্পর্শ করা হয় না। বাক্সের ভিতর একটি চিমটা থাকে। কেবল ইহার সাহায্যেই বাটখারা পাত্রে উঠানো বা পাত্র হইতে নামাইয়া বাক্সে রাখা ইত্যাদি সকল কার্য করা হইয়া থাকে।

**তুলার ব্যবহার ঃ**

চাবি K ঘুরাইয়া তুলাদণ্ডটিকে উপরে তোল। তুলাপাত্র দুইটি খালি থাকিলে, এই অবস্থায় তুলাদণ্ডটি যদি স্থির থাকে তবে উহা অনুভূমিক থাকা উচিত এবং সূচকটি স্কেলের মধ্য দাগে থাকিবে। যদি না থাকে তাহা হইলে তুলাদণ্ডের দুই প্রান্তের স্ক্রু ঘুরাইয়া সূচকটিকে স্কেলের মাঝখানে আনিবে।

যে বস্তুর ভর মাপিতে হইবে তাহা বামদিকের তুলাপাত্রে রাখ এবং ডানদিকের তুলাপাত্রে আস্তে আস্তে বাটখারা চাপাও যতক্ষণ না সূচকটি স্কেলের মধ্য দাগে আসে কিংবা মধ্য দাগের দুই দিকে সমানভাবে দোলে। এই অবস্থায় ডানদিকের তুলাপাত্রের মোট বাটখারার পরিমাণই বস্তুর ভর হইবে।

## 1-12. আয়তনের পরিমাপ :

যদি কোনও বস্তু নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের হয় তবে উহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা, ব্যাসার্ধ ইত্যাদি মাত্রা জানিলেই উহার আয়তন নির্ণয় করা যায়।

**মনে রাখিবে :**

ঘনকের আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা = ( দৈর্ঘ্য )$^3$

ঘন-আয়তক্ষেত্রের ( rectangular parallelopiped )

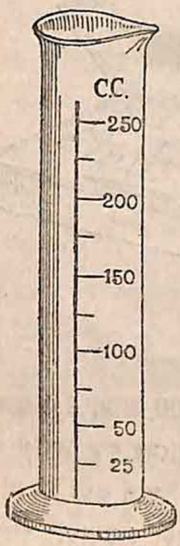
আয়তন = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ × উচ্চতা

গোলকের আয়তন = $\frac{4}{3}\pi$ ( ব্যাসার্ধ )$^3 = \frac{4}{3}\pi r^3$

চোঙের (cylinder) আয়তন = $\pi$ × ( ব্যাসার্ধ )$^2$ × দৈর্ঘ্য = $\pi r^2 h$

শঙ্কুর ( cone ) আয়তন = $\frac{1}{3}\pi$ ( ভূমির ব্যাসার্ধ )$^2$ × দৈর্ঘ্য = $\frac{1}{3}\pi r^2 h$

$\pi = 3{\cdot}1416$ ( প্রায় ) $= \frac{22}{7}$ ( প্রায় )




চিত্র নং 4—আয়তন মাপক চোঙ

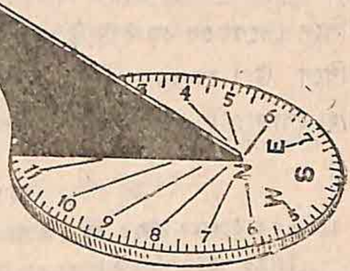
যদি বস্তুটি নির্দিষ্ট জ্যামিতিক আকারের না হয় তবে আর্কিমিডিসের নীতি প্রয়োগ করিয়া বস্তুর আয়তন নির্ণয় করা যায়। **আয়তনমাপক চোঙের** ( measuring cylinder ) সাহায্যে তরলের আয়তন সোজাসুজিভাবে নির্ণয় করা যায়। আয়তনমাপক চোঙ কাচনির্মিত হয় এবং নানা মাপের হইয়া থাকে। ইহা c.c. ( বা ml. )-তে অংশাঙ্কিত থাকে। চোঙের মধ্যে তরল ঢালিয়া তরলের তলের পাঠ নিলেই তরলের আয়তন জানা যায়।

## 1-13. সময়ের পরিমাপ :

কোন ঘটনা যদি নিয়মিত সময়-ব্যবধানে ঘটিয়া থাকে তবে সেই ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া সময়ের পরিমাপ করা যায়।

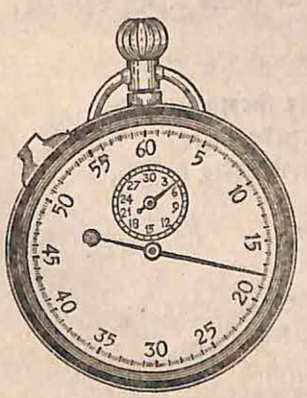
সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট জন্মের বহু বৎসর পূর্বে সময় মাপিবার যন্ত্র গ্রীকদের দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয়। প্রথম প্রচলিত সময়মাপক যন্ত্রের মধ্যে জল-ঘড়ি ( water-clock ) বা বালি ঘড়ি ( sand clock ) বা আওয়ার গ্লাস ( hour glass ), সান ডায়েল ( sun dial ) ইত্যাদির কথা জানা যায়। একটি ছোট ছিদ্রমুখ দিয়া সমান পরিমাণ জল বাহির হইতে নির্দিষ্ট সমান সময় লাগে—এই

সাধারণ নীতির উপর জলঘড়ির প্রবর্তন হয়। অতি প্রাচীনকালে সান ডায়েল নামক এক যন্ত্রের আবিষ্কার হয়। একটি গোলাকার পৃষ্ঠের (dial) উপর 1, 2, 3 ইত্যাদি সময় নির্দেশক ঘণ্টা-সংখ্যা লেখা থাকে। একটি অস্বচ্ছ বস্তু লম্বভাবে উত্তর-দক্ষিণ তলে ডায়েলের উপর আটকান থাকে। সূর্যের আলো ঐ অস্বচ্ছ বস্তুর উপর পড়িলে যে ছায়ার সৃষ্টি হয় উহা সূর্যের গতির সঙ্গে ঘণ্টার অংকগুলির উপর দিয়া যায়। ফলে ইহা সময়জ্ঞাপক হিসাবে কাজ করে। সূর্যালোকিত দিনে সময় নিরূপণের জন্য প্রাচীনকালে এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত।



চিত্র নং 5—সান ডায়েল

আজকাল সময় পরিমাপের জন্য পূর্বোক্ত প্রাচীন ব্যবস্থাগুলির পরিবর্তে দেওয়াল ঘড়ি, হাত ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে দোলকের সূত্রাবলীর আবিষ্কার দোলক ঘড়ির উদ্ভাবন সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। কথিত আছে 1583 খ্রীষ্টাব্দের কোন একদিন গ্যালিলিও পিসা শহরের গির্জায় ঝুলানো বাতির আন্দোলন মনোযোগ দিয়া দেখিতে দেখিতে লক্ষ্য করিলেন যে প্রতিটি পূর্ণ দোলনের জন্য সর্বদা একই সময় লাগিতেছে। নিজের নাড়ীর স্পন্দন গণনা করিয়া তিনি এই দোলনকাল নির্ণয় করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন ঘড়ি নির্মাণের ক্ষেত্রে এই আবিষ্কার কাজে লাগান যাইতে পারে। ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হাইজিন পরে সময় পরিমাপের জন্য দোলক ব্যবহার করেন এবং প্রকৃতপক্ষে 1658 খ্রীষ্টাব্দে তিনি দোলক সমন্বিত ঘড়ি তথা দোলক ঘড়ি আবিষ্কার করেন। ঘড়ির কাঁটার গতির নিয়ামকরূপে তিনিই সর্বপ্রথম দোলক ব্যবহার করেন। পরবর্তীকালে ঘড়ির গঠনশৈলীর নানা রকমের উন্নতি সাধিত হইয়াছে।



চিত্র নং 6—স্টপ ওয়াচ

দৈনন্দিন কাজের জন্য সময় পরিমাপ করিতে সাধারণ ঘড়ি ( যেমন দেওয়াল ঘড়ি, টেবিল ঘড়ি ) ব্যবহার করা হয়। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র সময় মাপার জন্য স্টপ ক্লক ( বা স্টপ ঘড়ি ) বা স্টপ ওয়াচ ব্যবহৃত হয়।

স্টপ ঘড়ির সাহায্যে এক সেকেণ্ড সময়ও নির্ভুলভাবে মাপা যায়। আবার ইহার সাহায্যে $\frac{1}{5}$ সেকেণ্ড বা এমন কি কোন কোন স্টপ ঘড়িতে $\frac{1}{10}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত সময়ের পাঠ লওয়া যাইতে পারে। স্টপ ঘড়ির [ চিত্র 6 ] উপরের বর্তুলটি টিপিলে সেকেণ্ডের বড় কাঁটাটি সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকে এবং বর্তুলটি আবার টিপিলে উহা বন্ধ হয়। ইহার সাহায্যে কত সময় ধরিয়া কোন্ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা সোজাসুজি এবং সূক্ষ্মভাবে মাপা যায়।

## প্রশ্নাবলী

1. একক কাহাকে বলে ? উহার প্রয়োজনীয়তা কি ? প্রাথমিক রাশি কি কি ? এককের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলির নাম কর এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাথমিক রাশিগুলির একক বল।
2. তোমার উচ্চতাকে ফুটে ও ইঞ্চিতে প্রকাশ করিয়া তাহাকে মিটার ও সেন্টিমিটারে পরিণত কর। তোমার ভরকে কিলোগ্রামে প্রকাশ করিয়া তাহাকে পাউণ্ডে পরিণত কর ?
3. একটি রকেট 300 কিলোমিটার উচ্চতায় উঠিল। উহা কত মাইল উচ্চতায় উঠিল ?
4. কোন দৌড় প্রতিযোগিতায় একজন দৌড়বীর 10 সেকেণ্ডে 100 গজ দৌড়িল। আবার অন্য এক প্রতিযোগিতায় ঐ সময়েই 100 মিটার দৌড়িল। কোন্‌টিতে সে বেশী দূরত্ব দৌড়িয়াছিল এবং কত বেশী দৌড়িয়াছিল ?
5. পৃথিবী হইতে চন্দ্রের দূরত্ব 239,000 মাইল। কিলোমিটারে ঐ দূরত্ব কত হইবে ?
6. খুব বড় দূরত্ব মাপিবার সময় 'আলোক-বর্ষ' ( Light year ) একক ব্যবহার করা হয়। আলোক 1 সেকেণ্ডে 186,000 মাইল যায়। উহা এক বৎসরে যত দূরত্ব যাইবে তাহাকে আলোক-বর্ষ বলে। আলোক-বর্ষ = কত মাইল ? আলোক-বর্ষকে কিলোমিটারে প্রকাশ কর।
7. (i) এক গ্যালনকে ঘনফুটে প্রকাশ কর। [ এক গ্যালন = 4.54 লিটার ]
   (ii) এক লিটারকে ঘনফুটে প্রকাশ কর। (iii) এক বৎসরকে সেকেণ্ডে প্রকাশ কর।

### Objective type tests

1. যে উত্তরটি ঠিক তার পাশে √ বসাও :—
   (i) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে দৈর্ঘ্যের একক —লিটার, কিলোমিটার, সেন্টিমিটার।
   (ii) এফ. পি. এস্. পদ্ধতিতে ভরের একক —গ্রাম, পাউণ্ড, লিটার।
   (iii) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে আয়তনের একক —গ্যালন, লিটার, সি. সি.।
2. যাহা বড় তাহার নীচে দাগ দাও :—
   (i) মিটার, গজ, (ii) মাইল, কিলোমিটার, (iii) ঘনফুট, লিটার
   (iv) এক গ্রাম, এক আউন্স।
3. সম্ভাব্য উত্তরগুলি পাশে দেওয়া আছে। যেটি ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও :—
   (i) আয়তনের একককে কি প্রাথমিক একক বলা যাইতে পারে ?
   —হাঁ, না, লব্ধ একক।
   (ii) একটি ইটের আয়তন মাপিতে কি যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ?
   —সাধারণ তুলা, আয়তনমাপক চোঙ, স্কেল।

## দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ পদার্থ ও শক্তি
[ Matter and Energy ]

### 2·1. পদার্থ, বস্তু, শক্তি বলিতে কি বোঝায় ?

এই মহাবিশ্বে অসংখ্য বস্তু আছে। এই সকল বস্তু যে সকল উপাদান দিয়া তৈরী হয় তাহাই **পদার্থ** ( Matter )। এখন বস্তু কি ?

চেয়ার, টেবিল, বই, খাতা ইত্যাদি প্রত্যেকটিই এক একটি বস্তু। আমাদের চক্ষু, কর্ণ, ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা কিছুরই অস্তিত্ব বুঝিতে পারি এবং যাহারই ওজন আছে তাহাই **বস্তু** ( body )।

শক্ত, নরম, হাল্‌কা, ভারী, তরল, গ্যাসীয় কত রূপেই না বস্তুকে আমরা প্রকৃতিতে দেখিতে পাই—ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন রূপ, বিভিন্ন তাহাদের ধর্ম। এখন কেনই বা বস্তুকে বিভিন্নরূপে আমরা দেখি, কিভাবেই বা ইহারা গঠিত হয় এই সকল বিষয়ে মানুষের জানার আগ্রহের অভাব নাই। বিজ্ঞানীদের চিন্তাশীল মন বস্তুর বিচিত্র রূপ, ধর্ম বা আচরণ সম্পর্কে নানা সদুত্তরও রাখিয়াছেন। বস্তুর সংখ্যা অসীম। মনে হইতে পারে যে, যে জিনিস বা উপাদানসমূহ দিয়া বস্তুসকল তৈরী হয় তাহাদের সংখ্যাও বুঝি অসীম। তবে আমাদের সৌভাগ্য, বস্তুরাজির উপাদানের সংখ্যা মূলতঃ অগণিত নহে। চেয়ার একটি বস্তু, ইহা কাঠের তৈরী। কাঠ চেয়ার নামক বস্তুর উপাদান, সুতরাং পদার্থ। আলমারী একটি বস্তু, ইহা ইস্পাতের তৈরী। ইস্পাত পদার্থ। এই রকম বহু পদার্থ আছে তাহাদের আবার নানা রকম ধর্ম। তবে দেখা গিয়াছে যে বিচিত্র এই পদার্থ-সম্ভারের মূলে আছে কিঞ্চিৎ অধিক একশত মৌলিক পদার্থ ( element )। এই সকল মৌলিক পদার্থ হইতে এত অসংখ্য বস্তু এবং এই বস্তুময় জগতের সৃষ্টি। একখণ্ড চক-পেন্সিল একটি বস্তু ; চক পদার্থ। কিন্তু সেই চক আবার ক্যালসিয়াম, কার্বন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে গঠিত। ক্যালসিয়াম, কার্বন, অক্সিজেন এইগুলি মৌলিক পদার্থ।

এই বস্তুময় জগতকে ও বস্তুর বিচিত্র আচরণবিধি বা লীলাখেলা বুঝিতে হইলে আরও একটি বিষয়ের কথা মানুষের চিন্তায় আসে তাহা হইল **শক্তি**। এই শক্তিই নানাভাবে আমাদের স্নায়ুতে কাজ করিয়া বস্তু সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতি ও জ্ঞানদান করে—তেমনি এই শক্তিই বস্তুর গতির উৎস। ইহাই

আবার বস্তুকে নানারকম কাজ করিবার সামর্থ্য যোগায় এবং এই মহাবিশ্বে যে কোনও রকম পরিবর্তনের মূলেও এই **শক্তি** কাজ করে।

**শক্তি**ঃ বস্তুর কাজ করিবার সামর্থ্যই শক্তি। পদার্থের এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় ( যেমন কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় ) পরিবর্তনের জন্য শক্তির দরকার হয়—যে শক্তিতে ইহা করা যায় তাহা **তাপশক্তি**। কোন ঠাণ্ডা বস্তুকে তাপশক্তি প্রয়োগে গরম করা যায়। বস্তুকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে সরাইতে হইলে **যান্ত্রিক শক্তির** প্রয়োজন। কোন বস্তুর অস্তিত্ব ঠিকই আছে—কিন্তু কোন সময় বস্তুটিকে দেখিতে পাই আবার কোন সময় হয়ত বস্তুটিকে দেখিতে পাই না। **আলোক শক্তির** সাহায্যে আমরা বস্তুকে দেখিতে পাই। **বৈদ্যুতিক শক্তির** প্রভাবে পাখা ঘোরে, আলো জ্বলে, ট্রেন চলে—আরও কত কি! শক্তি নিজে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে—তবে শক্তির প্রভাবে বস্তুতে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে যাহা আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারি।

## 2-2. পদার্থের তিন অবস্থা [ Three States of Matter ]ঃ

পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে। যথাঃ (i) **কঠিন**, (ii) **তরল** ও (iii) **গ্যাসীয়**। যেমন জল তিন অবস্থায় দেখা যায়। জলকে খুব ঠাণ্ডা করিলে বা তাহা হইতে তাপশক্তি হ্রাস করিলে উহা একখণ্ড বরফে পরিণত হয়। আবার জলে বেশী তাপ দিলে উহা বাষ্পে পরিণত হয়। এইভাবে একই পদার্থকে বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যাইতে পারে।

## 2-3. বস্তুর ভর ও ওজন বা ভার (Mass and Weight of a Body)ঃ

কোন বস্তুর মধ্যে যে পরিমাণ পদার্থ থাকে তাহাই সেই বস্তুর **ভর**।

সাধারণতঃ বস্তুর ভর অর্থে ভার বা ওজনকেই বুঝিয়া থাকি। কোন বস্তুর ওজন 1 কিলোগ্রাম—এই রকম আমরা প্রায়ই বলিয়া থাকি। কিন্তু এইখানে আমরা বস্তুতে যে পদার্থ আছে তাহার পরিমাণকে বুঝাইবার অর্থেই ওজন কথা ব্যবহার করি ; আসলে কিন্তু উহা ভর। প্রকৃতপক্ষে ওজন বলিতে বিজ্ঞানে অন্য জিনিস বুঝায়।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার আইজাক নিউটন একটি নিয়মে ( নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র ) বলিয়াছেন—প্রত্যেক বস্তু অপর প্রতিটি বস্তুর উপর আকর্ষণী বল প্রয়োগ করে। পৃথিবী একটি বস্তু। পৃথিবীও প্রত্যেক বস্তুর উপর আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে। এই আকর্ষণ বলকে অভিকর্ষ বল বলে।

উক্ত নিয়ম আবিষ্কারের পিছনে বিজ্ঞানী নিউটনের জীবনের একটি ঘটনা মনে রাখিবার মত। যুবক নিউটন একদিন বাগানে বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিলেন। হঠাৎ তিনি তখন একটি আপেল গাছ হইতে একটি আপেল পড়িতে দেখিলেন। যুবক নিউটনের অনুসন্ধিৎসু মনে জিজ্ঞাসার উদয় হইল —আপেলটি নীচের দিকে পড়িল কেন? এই ভাবনার ফলশ্রুতি হইল মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কার।

পৃথিবী সকল বস্তুকে আকর্ষণ করে। ফলে কোনও বস্তু হাতে রাখিলে উহা নীচের দিকে যাইতে চায় বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু হাতে রাখিলে উহা খুব ভারী না হইলে তোমার হাত হইতে পড়িবে না। তোমার হাত হইতে বস্তুটি যাহাতে না পড়িতে পারে তাহার জন্য তুমি বাধা দিতেছ। পৃথিবীর আকর্ষণী বল তোমার হাতের মধ্য দিয়া বস্তুটির উপর নিম্নাভিমুখে কাজ করিতেছে এবং তোমার হাত বস্তুটির উপর সমান বল উপরের দিকে প্রয়োগ করিতেছে বলিয়া বস্তুটি মাটিতে পড়িতেছে না। বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ-জনিত বলই বস্তুর **ওজন**। এই ওজনের বিরুদ্ধে তোমার বাধা দিতে হয় বলিয়াই কোন বস্তু হাতে রাখিলে তোমার ভার বোধ হইয়া থাকে।

পৃথিবী যে-বলে কোন বস্তুকে আকর্ষণ করে তাহাই সেই বস্তুর **ওজন**। সুতরাং ওজন অবশ্যই একজাতীয় বল।

বস্তুর ভর যত বেশী হয় উহার উপর পৃথিবীর আকর্ষণী বলও তত বেশী হইবে।

বস্তু মাত্রেরই ভর আছে—ভর বস্তুর একটি নিজস্ব গুণ। কিন্তু বস্তুর ওজন কোনও স্থানে না-ও থাকিতে পারে। যে স্থানে বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণী বল থাকে না সেই স্থানে বস্তুর ওজনও থাকে না। যেমন পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণী বল নাই বলিয়া উহার ওজন শূন্য হইবে।

বস্তুর ভর নির্দিষ্ট বস্তুর জন্য সর্বত্র একই থাকে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণজনিত বল বস্তুর উপর বিভিন্ন মানের হয় বলিয়া বস্তুর ওজন সর্বত্র সমান থাকে না।

স্প্রিং ব্যালান্স নামক যন্ত্রের সাহায্যে বস্তুর ওজন সরাসরি নির্ণয় করা যায়। ইহাতে একটি স্প্রিং-এর নীচের দিকে বস্তুটি রাখিলে বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণী বল প্রযুক্ত হয় বলিয়া স্প্রিংটির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় এবং দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধির পরিমাণ হইতে বস্তুর ওজন জানা যায়।

## 2-4. **ভর-সংরক্ষণ নীতি** ( Conservation of mass ) :

মহাবিশ্বে পদার্থের সামগ্রিক পরিমাণ সর্বদা একই থাকে। মানুষ-নিয়ন্ত্রিত কোন শক্তি এই পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। ইহাই **ভর-সংরক্ষণ নীতি**।

দৈনন্দিন বহু ঘটনায় আমাদের এই নীতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিতে পারে। যেমন ধর, কেটলীতে সামান্য পরিমাণ জল লইয়া গরম করিতে থাকিলে আস্তে আস্তে সেই জল বাষ্প হইয়া যাইবে এবং কেটলীতে কিছুই থাকিবে না। উনানে কয়লা পুড়াইলে দেখা যায় কিছুক্ষণ পর উনানে যে কয়লার ভস্ম রহিল তাহার ভর আগের কয়লার পরিমাণ অপেক্ষা অনেক কম। দেওয়ালী উৎসবের সময় ম্যাগনেসিয়াম তার পুড়াইলে দেখিতে পাও যে কিছুক্ষণ পর তারটি জলিয়া শুধু সাদা ভস্ম থাকে। কিন্তু সেই ভস্মটুকু ওজন করিলে দেখিবে তাহার ভর কিন্তু আগের তারের ভর অপেক্ষা বেশী দাঁড়ায়। তাহা হইলে কি নূতন করিয়া এখানে পদার্থের সৃষ্টি হইল? আবার, আগের উদাহরণগুলিতে পদার্থের ভর কমিলই বা কেন? তাহা হইলে কি এই সকল ঘটনা ভর সংরক্ষণ নীতির যথার্থতা অপ্রমাণ করিতেছে?

না, আসলে তাহা নহে। জল ফুটিয়া যখন বাষ্প হয় সেই বাষ্পকে আমরা যদি বিশেষ ব্যবস্থায় ওজন করি দেখিব যে বাষ্পের ভর জলের ভরের সমানই। বাষ্প উবিয়া যায় বলিয়া এমন মনে হয়। এখানে শুধুই পদার্থের অবস্থান্তর হয়। মাটিতে ক্ষুদ্র একটি বীজ বপণ করিলে কালক্রমে ইহা বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। এইখানে শুধু বীজটির ভর এবং গাছটির ভর দেখিলেই চলিবে না। মাটি ও বায়ুমণ্ডল হইতে যে বিভিন্ন উপাদান গ্রহণে বীজটির পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয় সেই সকল উপাদানের সামগ্রিক ভর ধরিলেই বুঝা যাইবে বীজের ভর এবং তাহা হইতে সৃষ্ট গাছের ভরে এত তফাত কেন। কয়লা পুড়িয়া ভস্ম হয়। তাহাতে ভরের হ্রাস হয় বলিয়া মনে হয়। ইহার কারণ কয়লা পোড়ার সময় বাতাসের অক্সিজেনের সহিত কয়লার বিক্রিয়ায় যে গ্যাসীয় পদার্থসমূহ উৎপন্ন হয় উহার কথা সাধারণতঃ আমরা চিন্তা করি না। ম্যাগনেসিয়াম তার পুড়িলে বাতাসের অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড নামে ভস্মের আকারে নূতন জিনিস হয়। বাতাস হইতে অক্সিজেন আসিয়াছে বলিয়াই ত ইহার ভর-বৃদ্ধি। এইভাবে দেখান যাইতে পারে সকল পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই ভর-সংরক্ষণ নীতি সত্য।

এই নীতি বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে নানা পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

**2·5. শক্তির বিভিন্ন রূপ** ( Different forms of energy ) :

শক্তি বিভিন্নরূপে আমাদের সম্মুখে বিরাজ করে। মোটামুটিভাবে আমরা শক্তির আটটি রূপ দেখিতে পাই। যথা :

(i) **যান্ত্রিক শক্তি :** কোনও বস্তু স্থির থাকিয়া উহার অবস্থানের জন্য কাজ করিবার সামর্থ্য পাইতে পারে। যেমন কোন বস্তুকে নীচ হইতে উপরে তুলিলে, পৃথিবীর টানে নীচে পড়িবার সময় বস্তুটি কার্য করিতে পারে। এইভাবে কার্য করিবার সামর্থ্যই স্থিতিশক্তি, আবার গতিশীল বস্তু ইহার গতির জন্য কার্য করিবার যে সামর্থ্য পায়—তাহাই গতিশক্তি। এই স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তিকে একত্রে বলা হয় যান্ত্রিক শক্তি। কোন ভার উত্তোলন করিতে, নীচতলা হইতে উপরতলায় জল তুলিতে, কোন গাড়ি চালাইতে যান্ত্রিক শক্তি কার্যকরী হয়।

(ii) **তাপশক্তি :** উত্তপ্ত বাষ্পের তাপের সাহায্যে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চলে। ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন ইত্যাদি জ্বালানী পুড়াইয়া যে তাপ হয় তাহাতে মোটরগাড়ী, এরোপ্লেন, পাম্প ইত্যাদি চলে। সুতরাং তাপ একপ্রকার শক্তি।

(iii) **আলোক শক্তি :** খুব বেশী উত্তপ্ত হইলে একখণ্ড লোহা হইতে আলোক বাহির হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে তার উত্তপ্ত হইলে আলোক নির্গত হয়। তাপ ও বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে এই দুই ক্ষেত্রে আলোক আসে। আলোকও একপ্রকার শক্তি।

(iv) **শব্দশক্তি :** কোন বস্তু মাধ্যমের কম্পন হইতে শব্দের সৃষ্টি হয়। কম্পন হইলে বস্তুকণার মধ্যে কার্য হয়। শব্দ সেইজন্য একপ্রকার শক্তি।

(v) **চৌম্বক শক্তি :** চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করিয়া একস্থান হইতে অন্যস্থানে নিতে পারে। সুতরাং চুম্বকত্বেও শক্তির প্রকাশ হয়।

(vi) **বৈদ্যুতিক শক্তি :** কোন বিদ্যুতাহিত বস্তু অপর বিদ্যুতাহিত বস্তুকে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করিতে পারে। আবার প্রবাহী বিদ্যুতের সাহায্যে নানারকমের যন্ত্রও চালান যায়। বিদ্যুৎ সেইজন্য একপ্রকারের শক্তি।

(vii) **রাসায়নিক শক্তি :** কয়লা পোড়ার সময় বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে রাসায়নিক শক্তি হয় তাহাই তাপশক্তিরূপে

কার্যকরী হয়। চুন জলের মধ্যে ফেলিলে জল গরম হইয়া উঠে। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে শক্তি পাওয়া যায় তাহাই রাসায়নিক শক্তি।

(viii) **পারমাণবিক শক্তি** বা **নিউক্লিয়ার শক্তি ঃ** বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের এক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পদার্থের ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে এবং এইরূপ রূপান্তরে প্রচুর শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্তকে কাজে লাগাইয়াই পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবন বিজ্ঞানীরা করিয়াছেন। ইহার সম্পর্কে এখানে এর বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়। পরমাণু বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি এই শক্তির উপর ভিত্তি করিয়াই তৈরী হইয়াছে। কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল ইত্যাদি জ্বালানী হইতে পাওয়া শক্তি-চালিত ইঞ্জিন পারমাণবিক শক্তির দ্বারা চালানর চেষ্টা চলিতেছে।

## 2-6. **শক্তির রূপান্তর** ( Transformation of energy ) ঃ

শক্তি একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্তিত হইতে পারে। শক্তির এই রূপান্তরের মধ্যেই জগৎ-সংসার চলিতেছে।

রেলগাড়িতে কয়লা পোড়াইয়া যে শক্তি পাওয়া যায় ইঞ্জিন তাহাকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে এবং এই যান্ত্রিক শক্তিতে রেলগাড়ির চাকা ঘোরে। আবার যান্ত্রিক শক্তিও তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। হাতে হাত ঘষিলে হাত গরম হয়। একখণ্ড পাথর উপর হইতে ফেলিয়া দিলে উহার স্থিতিশক্তি ক্রমশঃ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং নীচে পড়িলে এই গতিশক্তি আবার তাপশক্তি, শব্দশক্তি ইত্যাদিতে পরিবর্তিত হয়।

সূর্য হইতে তাপশক্তি পৃথিবীতে আসে। সেই তাপশক্তিতে সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্প উপরে উঠিয়া মেঘে পরিণত হয়। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হয়। তাহাতে পাহাড়ের চূড়ায় নদীর সৃষ্টি হয়। এই নদীর জল উপরে থাকাকালে প্রচুর স্থিতিশক্তি লইয়া থাকে। যখন পাহাড় বাহিয়া নীচে নামিয়া আসে তখন সেই স্থিতিশক্তি আবার গতিশক্তিতে রূপ নিতে থাকে। এই প্রচণ্ড গতিশক্তি ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

এই বিদ্যুৎ-শক্তি হইতে পাওয়া তড়িৎ-প্রবাহ বৈদ্যুতিক পাখার মধ্য দিয়া চালাইলে বিদ্যুৎ শক্তি গতি-শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়া পাখাকে ঘুরাইবে। এই বিদ্যুৎশক্তি পরিবাহী তারের মধ্য দিয়া চালনা করিলে তার উত্তপ্ত হইবে এবং আলোক পাওয়া যাইবে অর্থাৎ তাপশক্তি ও আলোক শক্তি উৎপন্ন হইবে।

আবার পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে তামার পাত ও দস্তার পাত ডুবাইয়া রাখিলে ও পাত দুইটি তামার তার দিয়া যুক্ত করিলে তার দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চলিবে। এখানে রাসায়নিক-শক্তি হইতে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপন্ন হয়।

এইভাবে বহু উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে যাহাতে দেখা যায় শক্তি একরূপ হইতে অন্যরূপে পরিবর্তিত হয়।

## 2·7. শক্তির নিত্যতা ( Conservation of energy ):

শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটিতে পারে এবং এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে শক্তি সঞ্চালিত হইতে পারে। যাহাতে শক্তি আছে তাহা হইতেই শক্তি পাওয়া সম্ভব। নতুন করিয়া শক্তি সৃষ্টি সম্ভব নহে। শক্তির সৃজন বা বিনাশ উভয়ই অসম্ভব। যখন একরূপের শক্তির বিলোপ হয় তখন ইহাই আবার অন্যরূপে দেখা দেয়। বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

**'মহাবিশ্বে মোট শক্তির পরিমাণ সর্বদাই সমান, শক্তির সৃষ্টিও নাই—বিনাশও নাই'। ইহাই শক্তির নিত্যতা সূত্র।**

শক্তির নিত্যতাই বিজ্ঞানের ভিত্তি। এই নীতির কোথাও ব্যতিক্রম দেখা যায় না।

### প্রশ্নাবলী

1. পদার্থ, বস্তু ও শক্তি বলিতে কি বোঝ? পদার্থ ও বস্তুর মধ্যে পার্থক্য বুঝাইয়া দাও।

2. কোন বস্তুর ভর ও ওজনের মধ্যে পার্থক্য কি? বস্তুর ভরকে বস্তুর সহজাত ধর্ম বলা হয় কেন?

3. কোন বস্তুকে পৃথিবী-পৃষ্ঠে ওজন করা হইল। চন্দ্রপৃষ্ঠে উহাকে পুনরায় ওজন করা হইল। দুই ওজনের মধ্যে কোন পার্থক্য হইবে কি? ঐ বস্তুর উক্ত দুইস্থানে কোন পরিবর্তন হইবে কি?

4. উপযুক্ত উদাহরণসহ ভর-সংরক্ষণ নীতি বুঝাইয়া দাও।

5. শক্তি কি? শক্তি কত প্রকার? শক্তির রূপান্তরের পাঁচটি উদাহরণ দাও।

6. শক্তি-সংরক্ষণ সূত্র বিবৃত কর।

7. নীচে কতকগুলি বাক্য দেওয়া হইল। যাহা শুদ্ধ তাহার পাশে (✓) আর যাহা অশুদ্ধ তাহার পাশে (×) বসাও:—

(i) বস্তু ও পদার্থ বলিতে একই জিনিস বুঝায়।

(ii) বস্তুর ওজন সর্বত্র একই থাকে।

(iii) একটি স্প্রিং ব্যালেন্সের সাহায্যে কোন বস্তুকে ওজন করিলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ওজনের কিছু পার্থক্য দেখা যাইবে।

(iv) কয়লা পুড়িয়া ভস্ম হইলে ভস্মের ভর কয়লার ভর অপেক্ষা কমিয়া যাওয়াতে প্রমাণিত হয় যে ভর-সংরক্ষণ নীতি ভুল।

(v) কোন বস্তুর ওজন বলিতে যাহা বুঝায় ভর বলিতে তাহাই বুঝায়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ

## পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন
## [ Change of State ]

পদার্থ তিন অবস্থায় থাকিতে পারে—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। তাপ-প্রয়োগে কঠিন পদার্থ তরল এবং তরল পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আবার, ঠাণ্ডার প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থ তরল এবং তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ, বরফকে উত্তপ্ত করিলে উহা প্রথমে জল এবং পরে স্টীমে রূপান্তরিত হয় ; আবার, স্টীমকে ঠাণ্ডা করিলে উহা প্রথমে জল এবং পরে বরফে রূপান্তরিত হয়।

$$\text{বরফ} \underset{\text{শৈত্য}}{\overset{\text{তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{জল} \underset{\text{শৈত্য}}{\overset{\text{তাপ}}{\rightleftharpoons}} \text{স্টীম}$$

কিন্তু এমন কতকগুলি পদার্থ আছে, যাহারা তাপপ্রয়োগে কঠিন হইতে সোজাসুজি গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং ঠাণ্ডার প্রভাবে গ্যাসীয় অবস্থা হইতে সোজাসুজি কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; যথা—আয়োডিন, কর্পূর ইত্যাদি। এই প্রক্রিয়াকে **ঊর্ধ্বপাতন** ( sublimation ) বলা হয়।

আবার, এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যাহাদের উত্তপ্ত করিতে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে। যেমন কঠিন কার্বনকে বায়ুতে পোড়াইলে উহা একপ্রকার গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। এই গ্যাসীয় পদার্থটি কার্বন ডাই-অক্সাইড নামে পরিচিত। ইহার রাসায়নিক সংযুতি (composition) কার্বন হইতে স্বতন্ত্র। কঠিন কার্বন এবং গ্যাসীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড একই পদার্থের বিভিন্ন ভৌত অবস্থা নহে।

অতএব, **কোন পদার্থ যদি এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং এই বিভিন্ন অবস্থার রাসায়নিক সংযুতি যদি অভিন্ন হয় তাহা হইলে এই রূপান্তরকে 'পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন' বলা হয়।**

### 3-1. গলন ও কঠিনীভবন ( Melting and freezing ) :

কোন পদার্থের কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরকে গলন (fusion or melting) বলে। আবার তরল পদার্থের তরল হইতে কঠিন অবস্থায় রূপান্তরকে কঠিনীভবন (freezing or solidification) বলে।

কোন কঠিন পদার্থকে ক্রমাগত উত্তপ্ত করিলে যতক্ষণ না উহার গলন শুরু হয় ততক্ষণ উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। কিন্তু আনুষঙ্গিক চাপ যদি স্থির থাকে তবে একবার গলন শুরু হইলে উহার তাপমাত্রা আর বৃদ্ধি পায় না যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত কঠিন পদার্থ তরলে রূপান্তরিত হয়। একটি নির্দিষ্ট চাপে বিশুদ্ধ একটি কঠিন পদার্থ ( মৌলিক বা যৌগিক ) একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলিতে আরম্ভ করে এবং এই তাপমাত্রাকে ঐ কঠিন পদার্থের **গলনাঙ্ক** (melting point) বলে। সমস্ত কঠিন পদার্থ যখন তরলে পরিণত হয় তখন আবার যথারীতি তরলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। সাধারণত বিভিন্ন কঠিনের ( মৌলিক বা যৌগিক ) গলনাঙ্ক বিভিন্ন ( যেমন, ন্যাপথলিনের গলনাঙ্ক 80°C, সোনার গলনাঙ্ক 1063°C, তামার গলনাঙ্ক 1083°C ইত্যাদি ) এবং প্রতিটি কঠিনের ক্ষেত্রেই পারিপার্শ্বিক চাপের পরিবর্তন ঘটিলে এই তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে।

খানিকটা বরফকে হিমমিশ্রণে ঠাণ্ডা কর। দেখিবে, উহার উষ্ণতা 0°C-এর নীচে নামিয়া গিয়াছে। এইবার বরফের একটি টুকরা একটি বীকারে লও এবং থার্মোমিটার কুণ্ডদ্বারা নাড়িতে থাক। মাঝে মাঝে থার্মোমিটারে পারদসূত্রের অবস্থান লক্ষ্য কর। প্রথমে বরফের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া **0°C** পর্যন্ত উঠে এবং এই উষ্ণতার কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু বরফ তাড়াতাড়ি গলিতে থাকে এবং যখন সমস্ত বরফ গলিয়া জলে পরিণত হয় তখন আবার উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

আবার একটি পাত্রে খানিকটা তরল পদার্থ লইয়া উহাকে ক্রমাগত শীতল করিতে থাক। দেখিবে প্রথমে উষ্ণতা হ্রাস পাইতে থাকিবে যতক্ষণ না তরল কঠিনে রূপান্তরিত হইতে শুরু করে। এই যে উষ্ণতায় তরল কঠিনে রূপান্তরিত হইতে শুরু করে তাহাকে ঐ তরল পদার্থের **হিমাঙ্ক** (freezing point) বলে। যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত তরল জমিয়া কঠিনে পরিণত হয় ততক্ষণ তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন ঘটিবে না। সমস্ত তরল পদার্থ কঠিনে পরিণত হইবার পরও যদি তাপ হ্রাস করা যায় তাহা হইলে কঠিনের তাপমাত্রা যথারীতি হ্রাস পাইতে থাকিবে। হিমাঙ্কও বিভিন্ন তরলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এবং পারিপার্শ্বিক চাপের পরিবর্তন ঘটিলে এই তাপমাত্রারও অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে।

যে-কোন পদার্থের গলনাঙ্ক এবং হিমাঙ্ক সাধারণত অভিন্ন। বরফ 0°C তাপমাত্রায় গলিতে আরম্ভ করে এবং ঐ একই তাপমাত্রায় জলের বরফে

রূপান্তর শুরু হয়। সুতরাং কোন পদার্থের স্বাভাবিক **গলনাঙ্ক** বলিতে এক অ্যাটমস্‌ফিয়ার চাপে ঐ পদার্থ যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় গলিতে বা কঠিনে রূপান্তরিত হইতে শুরু করে তাহাকে বুঝায়।

গলনের ফলে বরফ, লোহা ইত্যাদি যে সকল পদার্থের আয়তনের সংকোচন ঘটে, চাপ বৃদ্ধিতে উহাদের গলনাঙ্ক হ্রাস পায়। কিন্তু গলনের ফলে মোম ইত্যাদি যে সকল পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি পায় চাপ বৃদ্ধিতে উহাদের গলনাঙ্ক বৃদ্ধি পায়। আবার, ধাতু সংকরের ( alloy ) গলনাঙ্ক উপাদান ধাতুগুলির গলনাঙ্ক অপেক্ষা কম।

### 3-2. বাষ্পায়ন, স্ফুটন ও ঘনীভবন ( Evaporation, boiling and condensation ) :

যে-কোন তাপমাত্রায় কোন পদার্থকে, তরল অবস্থা হইতে বাষ্পীয় বা গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে **বাষ্পীভবন** ( vaporisation ) বলে। আবার কোন পদার্থকে গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে **ঘনীভবন** ( condensation or liquefaction ) বলে।

তরল পদার্থকে দুই উপায়ে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত করা যাইতে পারে ; যথা—বাষ্পায়ন (evaporation ) এবং স্ফুটন ( boiling or ebullition )।

(i) **বাষ্পায়ন :** একটি খোলা ও অগভীর পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া দাও। দেখিবে জলের পরিমাণ আস্তে আস্তে কমিতে থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত জল উবিয়া যাইবে। জলের পরিবর্তে যদি ঐ পাত্রে স্পিরিট, কোহল, ইথার ইত্যাদি রাখিয়া দাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে অপেক্ষাকৃত অনেক কম সময়ের মধ্যেই ঐ পদার্থগুলি উবিয়া যাইবে। এই-সকল ক্ষেত্রেই তরল পদার্থগুলি ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। যেহেতু তরল পদার্থকে এই অবস্থা পরিবর্তনের সময় কোনরূপ নাড়াচাড়া করা হয় না এই পরিবর্তন নিশ্চয়ই তরল পদার্থের উপরি-তল হইতে সংঘটিত হইয়া থাকে। এই পরিবর্তন যে-কোন উষ্ণতাতেই চলিতে থাকে। এই পদ্ধতির নাম বাষ্পায়ন। অতএব যে-কোন তাপমাত্রায় তরল পদার্থের কেবলমাত্র উহার উপরি-তল হইতে ধীরে ধীরে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পদ্ধতিকে **বাষ্পায়ন** বলে। বাষ্পায়ন ধীরে ধীরে কিংবা অপেক্ষাকৃত দ্রুত সম্পন্ন হইবে, তাহা তরল পদার্থের প্রকৃতি এবং অন্যান্য কতকগুলি অবস্থার উপর নির্ভর করে :—

(a) যে-পদার্থ যত **বেশী উদ্বায়ী** তাহার বাষ্পায়ন তত দ্রুত হইবে। ইথার বা স্পিরিট জল অপেক্ষা বেশী উদ্বায়ী বলিয়া উহাদের বাষ্পে পরিণত হইতে যে-সময় লাগে তাহা একই পরিমাণ জলের বাষ্পে পরিণত হইবার সময় অপেক্ষা অনেক কম।

(b) যে-তরলের **উষ্ণতা** যত বেশী তাহার বাষ্পায়ন তত দ্রুত হয়। এই কারণেই ঠাণ্ডা জল অপেক্ষা গরম জল তাড়াতাড়ি উবিয়া যায়।

(c) তরল পদার্থের উপরিস্থিত বায়ু যত তাড়াতাড়ি নূতন বায়ুর দ্বারা **অপসারণ** করা যায় বাষ্পায়নের হার তত দ্রুত হয়। এইজন্য হাওয়া থাকিলে ভিজা কাপড় তাড়াতাড়ি শুকায়।

(d) **বায়ুচাপ** যত কম হয় বাষ্পায়ন তত দ্রুত হয়। এই কারণেই বায়ুশূন্য স্থানে বাষ্পায়ন সর্বাপেক্ষা দ্রুত হয়।

(e) তরল পদার্থের উপরিভাগ যত বেশী **বিস্তৃত** হয় বাষ্পায়ন তত দ্রুত হয়। সেইজন্য ভিজা কাপড় মেলিয়া দিলে তাড়াতাড়ি শুকায়।

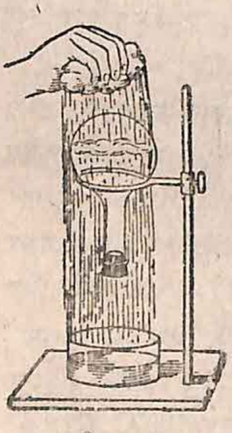
(f) নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে **বাষ্পের পরিমাণ** যত কম হয় বাষ্পায়নের হার তত দ্রুত হয়। তাই, শীতকালে বায়ুতে বাষ্পের পরিমাণ কম থাকায় ভিজা কাপড় বর্ষাকাল অপেক্ষা শীতকালে তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায়।

(ii) **স্ফুটন** (boiling) **: একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরল পদার্থের সমস্ত অংশ হইতে দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে স্ফুটন বলে।** কোন্ তাপমাত্রায় স্ফুটন শুরু হইবে তাহা পারিপার্শ্বিক চাপের উপর নির্ভর করে। যদি পারিপার্শ্বিক চাপ স্থির থাকে তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত তরল বাষ্প অর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই তাপমাত্রা স্থির থাকে। ঐ নির্দিষ্ট তাপমাত্রাই তরল পদার্থ টির **স্ফুটনাঙ্ক** ( boiling point ) এবং ইহা সাধারণত বিভিন্ন তরলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন হইয়া থাকে। যেমন, ইথারের স্ফুটনাঙ্ক 34·5°C, বেঞ্জিনের স্ফুটনাঙ্ক 80°C, জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C ইত্যাদি। তরলের উপরে চাপ বৃদ্ধি পাইলে এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় ; আবার, তরলের উপরে চাপ হ্রাস পাইলে এই তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এক অ্যাটমস্ফিয়ার বায়ুচাপে যে-তাপমাত্রায় তরলের স্ফুটন সংঘটিত হয় ঐ তাপমাত্রাকে তরলের স্বাভাবিক **স্ফুটনাঙ্ক** বলে।

**পরীক্ষা :** একটি ফ্লাস্কের প্রায় অর্ধেক জলদ্বারা ভর্তি কর এবং উহার মুখ-দুইটি ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ছিপিদ্বারা আঁটিয়া দাও। ছিপির মাঝখানের ছিদ্র দিয়া

একটি থার্মোমিটার এমনভাবে প্রবেশ করাও যে থার্মোমিটারের কুণ্ডটি যেন জলের উপরি-তল হইতে খানিকটা উপরে থাকে। অপর ছিদ্র দিয়া একটি বাঁকানো কাচনল প্রবেশ করাও। অতঃপর ফ্লাস্কটি একটি তারজালির উপর রাখিয়া বুনসেন শিখার দ্বারা উত্তপ্ত কর। দেখিবে, প্রথম প্রথম জল হইতে বুদ্‌বুদ্ উঠিতেছে এবং থার্মোমিটারের পারদস্তম্ভও উপরে উঠিতেছে। তাপমাত্রা যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে বুদ্‌বুদের সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বাড়িতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত জলের সকল স্থান হইতে ঐ বুদ্‌বুদ্ অতি দ্রুত উপরে আসিয়া ফাটিতে থাকিবে। ইহার ফলে জল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে এবং যে-স্টীম উঠিতে থাকিবে তাহা ফ্লাস্কের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে বাঁকানো কাচনলের মাধ্যমে অপসারিত করিবে। এই অবস্থায় বলা হয় যে তরলের স্ফুটন আরম্ভ হইয়াছে এবং থার্মোমিটার লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে পারদ 100°C দাগে স্থির হইয়া আছে। অতএব, দেখিতে পাইতেছ যে সাধারণ বায়ুচাপে জলের স্ফুটনাঙ্ক 100°C।

এইবার ফ্লাস্কের ছিপিটি খুলিয়া দাও এবং বুনসেন শিখার সাহায্যে আরও খানিকক্ষণ ফ্লাস্কটিকে গরম কর। শিখাটি সরাইয়া লও এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি রবারের ছিপিদ্বারা ফ্লাস্কের মুখ শক্ত করিয়া আঁটিয়া দাও। লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে যে, জলের টগ্‌বগ্ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। থার্মোমিটারের সাহায্যে তাপমাত্রা লক্ষ্য করিলে দেখিবে যে এত অল্প সময়ের মধ্যে জলের তাপমাত্রার কোন পরিবর্তন হয় নাই ; তবে এইরূপ হইল কেন ? ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করিয়া দেওয়াতে ফ্লাস্কের ভিতরে জলের উপরিস্থিত বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়াই এইরূপ হইয়াছে। অতএব, দেখিতে পাইতেছ যে তাপ-মাত্রার কোন পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও ভিতরের বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পাওয়াতে স্ফুটন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।



চিত্র নং 7
তরলের উপরিস্থিত বাষ্প-চাপ কমাইয়া তরলকে অপেক্ষাকৃত কম তাপমাত্রায় ফুটাইবার পরীক্ষা

অতঃপর ফ্লাস্কটিকে পার্শ্বের চিত্রে যেমন দেখান হইয়াছে ঐরূপভাবে একটি রিটর্ট স্ট্যাণ্ডে উল্টা করিয়া বসাও এবং শীতল জলধারায় শীতল কর। দেখিবে ফ্লাস্কের অভ্যন্তরস্থ জল আবার ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। কেন এইরূপ হইল ?

ফ্লাস্কটিকে শীতল করায় জলের উপরিস্থিত বাষ্পের খানিকটা ঘনীভূত হইয়া তরলে পরিণত হইয়াছে। ইহার ফলে ফ্লাস্কের অভ্যন্তরস্থ বাষ্পচাপ খানিকটা হ্রাস পাইয়াছে এবং কাজে কাজেই স্ফুটনাঙ্কও হ্রাস পাইয়াছে। কিন্তু ফ্লাস্কের অভ্যন্তরস্থ জলের উষ্ণতা বা তাপমাত্রা এই আনুষঙ্গিক স্ফুটনাঙ্কের উর্ধ্বে থাকায় জল পুনরায় এই কম তাপমাত্রাতেই ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

উপরোক্ত ঘটনাসমূহ যে কেবল জলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তাহা নহে; অন্যান্য তরল লইয়াও পরীক্ষা করিতে পার—ফলাফল একইরূপ হইবে।

তরলে কোন দ্রবীভূত অবিশুদ্ধি থাকিলে হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্কের পরিবর্তন ঘটে। বিশুদ্ধ তরল ( দ্রাবক ) অপেক্ষা এই তরলের স্ফুটনাঙ্ক বেশী হয় কিন্তু হিমাঙ্ক কম হয়। ইহা ছাড়া, স্ফুটন পাত্রের উপাদান, উহার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি দ্বারাও স্ফুটনাঙ্ক সামান্য পরিমাণ প্রভাবিত হয়।

**ব্যবহারিক প্রয়োগ ঃ** তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে বাড়ীতে ভাত, মাংস প্রভৃতি রান্না করিবার কালে হাঁড়ির মুখ অনেক সময় ঢাকনা দ্বারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। কেন এরূপ করা হয় বলিতে পার কি ? হাঁড়ির মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করাতে হাঁড়ির ভিতর বাষ্পচাপ বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের স্ফুটনাঙ্কও খানিকটা বৃদ্ধি পায়। এই বর্ধিত উষ্ণতায় ভাত, মাংস ইত্যাদি অপেক্ষাকৃত কম সময়ের মধ্যে সুসিদ্ধ হয়।

আমাদের সমতল ভূমি হইতে উচ্চতর স্থানে অবস্থিত জায়গায় রন্ধনকার্যের জন্য ব্যবহৃত প্রেসার কুকার ( pressure cooker ) নামক যন্ত্র তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে। এই যন্ত্রের সাহায্যে বাষ্পের চাপ বাড়াইয়া জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ান হয়। কেন এইরূপ করা হয় ? কারণ, উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুমণ্ডলের চাপও তত কমিতে থাকে এবং কাজে কাজেই জলের স্ফুটনাঙ্কও হ্রাস পায়। উচ্চ স্থানে তাই মাংস, ডিম ইত্যাদি সহজে সুসিদ্ধ হয় না ; উহাদের সিদ্ধ করিবার জন্য প্রেসার কুকারের সাহায্যে চাপ বাড়াইয়া জলের স্ফুটনাঙ্ক বাড়ান হয় এবং এই বর্ধিত তাপমাত্রায় রন্ধনের ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে।

**বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের পার্থক্য** ( Difference between evaporation and boiling ) :

বাষ্পায়ন ও স্ফুটন—এই উভয় পদ্ধতিতেই তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত পার্থক্য বর্তমান :—

(i) বাষ্পায়ন সকল তাপমাত্রাতেই ঘটিতে পারে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ইহা দ্রুত সংঘটিত হয়। কিন্তু নির্দিষ্ট বায়ুচাপে তরল পদার্থের স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় শুরু হয় এবং বায়ুচাপ পরিবর্তিত হইলে ঐ তাপমাত্রারও ( স্ফুটনাঙ্কের ) পরিবর্তন ঘটে।

(ii) বাষ্পায়ন একটি ধীর প্রক্রিয়া কিন্তু স্ফুটন অতি দ্রুত সংঘটিত হয়।

(iii) বাষ্পায়ন তরল পদার্থের কেবলমাত্র উপরিতল হইতে ঘটিয়া থাকে কিন্তু স্ফুটন তরল পদার্থের সমগ্র অংশ ব্যাপিয়া সংঘটিত হয়।

**বাষ্পায়নে শৈত্যের সঞ্চার** ( Cold caused by evaporation ) :

যখন কোন তরল পদার্থ বাষ্পে পরিণত হয় তখনই এই অবস্থান্তরের জন্য কিছু তাপের প্রয়োজন। বাহির হইতে তাপ প্রয়োগ না করিলে এই তাপ তরল পদার্থ উহার নিজের দেহ হইতে অথবা পরিপার্শ্ব হইতে গ্রহণ করে যাহার ফলে তরল পদার্থ বা পরিপার্শ্ব ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। বাষ্পায়ন যত দ্রুত হয় উহারাও তত দ্রুত শীতল হয়।

গ্রীষ্মকালে মাটির কুঁজা বা কলসীতে জল রাখা হয়। এই কুঁজা বা কলসীতে অসংখ্য ছিদ্র থাকায় দ্রুত বাষ্পায়ন ঘটিতে থাকে এবং জল শীতল হয়। কিন্তু কোন ধাতব পাত্রে ( ধর, পিতলের কলসী ) এইরূপ ছিদ্র না থাকায় বাষ্পায়ন কেবলমাত্র ধাতব পাত্রের খোলা মুখের মাধ্যমে সংঘটিত হয়। অতএব বাষ্পায়ন বেশী দ্রুত হয় না এবং কাজে কাজেই জলও বিশেষ শীতল হয় না।

ঘর্মাক্ত শরীরে পাখার নীচে বসিলে বিশেষ ঠাণ্ডা বোধ হয়। ঘাম বাষ্প হইয়া উবিয়া যায় এবং হাওয়া বাষ্পায়ন দ্রুত করিয়া তোলে। বাষ্পায়নের প্রয়োজনীয় তাপ শরীর জোগায় বলিয়া হাওয়া চলাচলে শরীর অধিক শীতল হয় এবং আমরা আরাম বোধ করি।

পেয়ালা হইতে গরম চা, দুধ ইত্যাদি ডিশে ঢালিয়া পান করা প্রায় প্রাত্যহিক ঘটনা। পেয়ালা হইতে ডিশে ঢালিবার ফলে তরলের উপরি-তলের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায় ; সুতরাং বাষ্পায়নও দ্রুত সংঘটিত হয়। উহাতে উষ্ণ তরল পদার্থ অপেক্ষাকৃত কম সময়ে শীতল হইয়া যায়।

জ্বরের রোগীর কপালে ভিজা ন্যাকড়া লাগাইয়া আস্তে আস্তে হাওয়া করিলে রোগী আরাম বোধ করে। ইহার কারণ, জল বাষ্পে পরিণত হইবার কালে কপাল হইতে যথেষ্ট পরিমাণ তাপ গ্রহণ করে এবং কপালের উষ্ণতা অনেকটা কমিয়া যায়।

তরল অ্যামোনিয়াকে দ্রুত বাষ্পে পরিণত করিলে যে শৈত্যের উৎপত্তি হয় তাহার সাহায্যে জল ঠাণ্ডা করিয়া বরফ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

### 3-3. লীন তাপ ( Latent heat ) :

আমরা জানি কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে উহার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং ঠাণ্ডা করিলে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। তাপমাত্রার এই পরিবর্তন থার্মোমিটারের সাহায্যে লক্ষ্য করা যায় এবং ইহা হইতে বুঝা যায় যে বস্তু তাপ গ্রহণ করিতেছে কিংবা বর্জন করিতেছে। এই তাপকে বলা হয় **বোধগম্য** ( sensible ) তাপ।

খানিকটা জল লইয়া উহাকে শীতল কর এবং থার্মোমিটারের সাহায্যে মাঝে মাঝে উহার তাপমাত্রা লক্ষ্য কর। দেখিবে জলের উষ্ণতা হ্রাস পাইতেছে অর্থাৎ জল তাপ বর্জন করিতেছে। এইভাবে তাপ বর্জন করিতে করিতে জলের উষ্ণতা যখন 0°C হইবে, তখন উহা বরফ হইতে শুরু করিবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল বরফে পরিণত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত জলের তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন হইবে না, অর্থাৎ 0°C-ই থাকিবে। সেইরূপে 0°C তাপমাত্রায় কোন বরফের টুকরায় তাপ প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাইবে যে এই তাপ বরফের গলনে সাহায্য করিবে। কিন্তু থার্মোমিটারে তাপমাত্রার কোন পার্থক্য দেখা যাইবে না। অর্থাৎ, তাপপ্রয়োগ করা সত্ত্বেও তাপমাত্রার বৃদ্ধি হয় না। যখন সমস্ত বরফ গলিয়া জলে পরিণত হইবে তখন তাপপ্রয়োগে আবার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে এবং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ( 100°C ) পৌঁছিলে জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে। যত তাপই প্রয়োগ করা হউক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত না সমস্ত জল আবার ষ্টীমে পরিণত হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত জলের তাপমাত্রার আর কোন পরিবর্তন হইবে না। যখন সমস্ত জল ষ্টীমে পরিণত হইবে তখন আবার থার্মোমিটারে তাপমাত্রার বৃদ্ধি দেখা যাইবে। অতএব, দেখিতে পাইতেছ যে অবস্থা পরিবর্তনের সময় কোন বস্তুর তাপমাত্রা পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্তনের সময় বস্তু যে তাপ গ্রহণ করে বা বর্জন করে তাহা বস্তুর ঐ অবস্থা পরিবর্তনে সাহায্য করে এবং বস্তুতেই লীন ( latent ) হইয়া থাকে। তাই এই তাপকে **লীন** ( latent বা hidden ) **তাপ** বলে।

সুতরাং, 0°C উষ্ণতায় খানিকটা জল এবং ঐ একই তাপমাত্রায় উহার সম-পরিমাণের বরফে পার্থক্য আছে; জলে অপেক্ষাকৃত বেশী তাপ রহিয়াছে।

পদার্থের পরিমাণ যদি 1 গ্রাম হয় তবে বস্তু দুইটির তাপের পার্থক্য 80 ক্যালরি হইয়া থাকে। $0^\circ C$ তাপমাত্রায় বরফকে $0^\circ C$ তাপমাত্রায় জলে পরিণত করিতে বরফের গ্রাম-প্রতি 80 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন। এই তাপই বরফ গলনের লীন-তাপ। আবার, $0^\circ C$ তাপমাত্রায় জলকে $0^\circ C$ তাপমাত্রায় বরফে পরিণত করিতে ঐ জল হইতে গ্রাম-প্রতি 80 ক্যালরি তাপ নিষ্কাশন করিতে হইবে।

## প্রশ্নাবলী

1. 'লীন তাপ,' 'বাষ্পায়ন,' 'স্ফুটন' এবং 'ঘনীভবন' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণ সহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

2. বাষ্পায়ন ধীরে ধীরে কিংবা অপেক্ষাকৃত দ্রুত সম্পন্ন হইবে তাহা কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে? বাষ্পায়ন ও স্ফুটনের মধ্যে প্রভেদ কি?

3. 'স্ফুটনাঙ্ক' এবং 'হিমাঙ্ক' বলিতে কি বুঝায়? তরল পদার্থের স্ফুটনাঙ্ক যে তরলের উপর প্রযুক্ত চাপের উপর নির্ভর করে তাহা পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও।

4. 'গলনাঙ্ক' বলিতে কি বুঝায়? যে যে বিষয়ের উপর গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক নির্ভর করে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

5. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও:—

(a) মাংসের হাঁড়ির মুখ ঢাকনা দিয়া বন্ধ করিলে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে মাংস সুসিদ্ধ হয়। (b) গ্রীষ্মকালে মাটির কুঁজায় রক্ষিত জল ধাতব পাত্রে রক্ষিত জল অপেক্ষা অধিক শীতল হয়। (c) ঘর্মাক্ত শরীরে পাখার নীচে বসিলে বেশি ঠাণ্ডা বোধ হয়। (d) জ্বরাক্রান্ত রোগীর কপালে ভিজা ন্যাকড়া লাগাইয়া আস্তে আস্তে হাওয়া করিলে রোগী আরাম বোধ করে। (e) একটি কাচের গ্লাসে খানিকটা বরফ রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা সঞ্চিত হইতে দেখা যায়।

## সংক্ষিপ্ত বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের (objective test) কয়েকটি নমুনা :

**A. Alternate response type :**

(*i*) *True or False type :*

**নির্দেশ :** নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেগুলি তোমার সত্য বলিয়া বোধ হয় সেইগুলির ডানদিকে—চিহ্নিত স্থানে T এবং যেগুলি ভুল বলিয়া বোধ হয় সেইগুলির অনুরূপ স্থানে F বসাও।

(a) তরলের স্ফুটনাঙ্ক তরলের উপরে প্রযুক্ত চাপের উপর নির্ভর করে। —

(b) যে কোন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করিলে তাপমাত্রা সর্বদাই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। —

(*ii*) *Yes or No type* :

**নির্দেশ** : নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির যেটির উত্তর 'হাঁ' হইবে তাহার ডানদিকে—চিহ্নিত স্থানে Y এবং যেটির উত্তর 'না' হইবে তাহার অনুরূপ স্থানে N বসাও।

(a) তরলের বাষ্পায়নে কি শৈত্যের উৎপত্তি হয় ? —

(b) কোন বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক কি বিভিন্ন ? —

**B. Completion type :**

কোন পদার্থ যদি এক —(a) হইতে অন্য অবস্থায় —(a)
—(b) হয় এবং এই বিভিন্ন —(c) রাসায়নিক —(b), —(c)
সংযুতি যদি —(d) হয় তাহা হইলে এই —(e) —(d), —(e)
পদার্থের —(f) পরিবর্তন বলে। —(f)

**C. Recall type :**

**নির্দেশ** : উপযুক্ত শব্দদ্বারা নিম্নলিখিত বাক্যগুলির অনুক্তি পূরণ কর, বাক্যগুলির ডানদিকে —চিহ্নিত স্থানে ঐ শব্দ বসাও :

(i) একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় তরল পদার্থের সমস্ত অংশ হইতে দ্রুত বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে — বলে। —

(ii) কোন পদার্থকে গ্যাসীয় অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত করার পদ্ধতিকে — বলে। —

(iii) তরল পদার্থের কেবল — হইতে ধীরে ধীরে গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হওয়ার পদ্ধতিকে বাষ্পায়ন বলে। —

**D. Multiple choice type :**

**নির্দেশ** : নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কয়েকটি করিয়া উত্তর দেওয়া আছে। উহাদের মধ্যে যে-উত্তরটি তুমি ঠিক বলিয়া মনে কর তাহার মাথায় ✓ চিহ্ন দাও।

(i) একটি কাচের গ্লাসে খানিকটা বরফ রাখিলে অল্প সময়ের মধ্যেই গ্লাসের গায়ে বিন্দু বিন্দু জলকণা সঞ্চিত হইতে দেখা যায় কেন ?

—বরফের গলনের দরুন/বায়ুমণ্ডলীয় জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় বলিয়া/বরফগলিত জলের বাষ্পায়নের দরুন।

(ii) যে কোন তাপমাত্রায় তরলের কেবল উপরিতল হইতে ধীরে ধীরে বাষ্পে পরিণত হওয়ার পদ্ধতিকে কি বলে ?

—বাষ্পায়ন/ঘনীভবন/স্ফুটন।

---

চতুর্থ অধ্যায় ঃ

## স্থিতি ও গতি
(Rest and Motion)

### 4-1. স্থিতি ও গতি ঃ

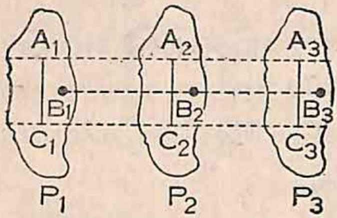
যদি কোনও বস্তু নিজের স্থান ত্যাগ না করিয়া একস্থানেই থাকে তবে বস্তুটিকে আমরা **স্থির** বস্তু বলি। বাড়ি, ঘর, গাছপালা এই অর্থে সবই স্থির বস্তু। আবার যদি কোনও বস্তু উহার নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া প্রতি মুহূর্তেই নূতন নূতন স্থানে অবস্থান করে তাহা হইলে বস্তুটিকে **গতিশীল** বা **সচল** বস্তু বলি। বস্তুর স্থির থাকার অবস্থাকে **স্থিতি** এবং সচল থাকার অবস্থাকে **গতি** বলে।

তবে যে বস্তু স্থির তাহাকে সবসময়ই স্থির ভাবা যায় না; আবার যাহা গতিশীল তাহাকে সবসময়ই গতিশীল ভাবা যায় না। তুমি এবং তোমার বন্ধুরা এক খোলা জায়গায় দাঁড়াইয়া আছ। তোমার কাছে তোমার বন্ধুরা স্থির আছে মনে হইবে, আবার তেমনি তোমার বন্ধুদের কাছে তুমি স্থির আছ বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু মনে কর চন্দ্রে অবস্থানরত কেহ তোমাদিগকে দেখিতে পাইতেছে। তাহার কাছে মনে হইবে তোমরা সকলেই প্রচণ্ড বেগে ঘুরিতেছ। পৃথিবীকে স্থির ভাবিলে পৃথিবীপৃষ্ঠে কোন বস্তু স্থির থাকিলে অপর স্থির বস্তুও প্রথম বস্তু সাপেক্ষে স্থির মনে হইবে। কিন্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করিয়া চন্দ্র অবিরত ঘোরে বলিয়া পৃথিবীর সাপেক্ষে চন্দ্র একটি গতিশীল বস্তু—আবার চন্দ্রের সাপেক্ষে পৃথিবী এবং পৃথিবীর বস্তুসকল গতিশীল। তুমি একটি রেলস্টেশনে একটি স্থির ট্রেনের কামরায় বসিয়া আছ—অপর রেল লাইনে দাঁড়ান ট্রেনটি যখন গতিশীল হইল তখন তোমার কাছে মনে হয় যেন তোমার ট্রেনটি চলিতেছে। আবার পাশাপাশি দুই রেল লাইনে দুইটি ট্রেন একই বেগ নিয়া একই দিকে চলিলে উভয় ট্রেনের যাত্রীর কাছেই মনে হয় যেন উভয়ই স্থির আছে; কারণ পরস্পরের সাপেক্ষে পরস্পরের অবস্থানের পরিবর্তন হইতেছে না—যদিও দুইটি ট্রেনই সচল। সুতরাং পরম স্থিতি (absolute rest) ও পরম গতি (absolute motion) বলিয়া কিছুই নাই। সব কিছুই আপেক্ষিক। **পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যাহা স্থির আছে, আমরা তাহাকেই স্থির বলি এবং পারিপার্শ্বিকের সাপেক্ষে যাহার গতি আছে, তাহাকেই গতিশীল বলি।**

## 4-2. চলন গতি ( Translational motion ) :

যদি কোন গতিশীল দৃঢ় বস্তুর গতি এমন হয় যে গতির ফলে বস্তুটির প্রত্যেকটি কণা সরলরেখায় একই সময়ে একই দূরত্ব অতিক্রম করে, তাহা হইলে এই গতিকে **চলন গতি** বলে।

মনে কর একটি বস্তু ( চিত্র 1 ) প্রথমে কোন সময়ে $P_1$ বিন্দুতে ছিল। তারপর নির্দিষ্ট এক সময় পরে উহা $P_2$ বিন্দুতে আসিল। মনে কর, প্রথম অবস্থানে উহার তিনটি কণা $A_1$, $B_1$, $C_1$ বিন্দুতে ছিল এবং দ্বিতীয় অবস্থানে উহারা $A_2$, $B_2$, $C_2$-তে আসিল। তাহা হইলে বস্তুটি চলন গতিতে থাকিলে $A_1A_2 = B_1B_2 = C_1C_2$ হইবে এবং $A_1A_2$, $B_1B_2$, $C_1C_2$ এই রেখা তিনটি সবসময় পরস্পর সমান্তরাল থাকিবে অর্থাৎ **চলন গতিতে কোন বস্তুর বিভিন্ন অবস্থিতিতে ইহার বিভিন্ন কণার গতিরেখা পরস্পর সমান্তরাল থাকিবে।**



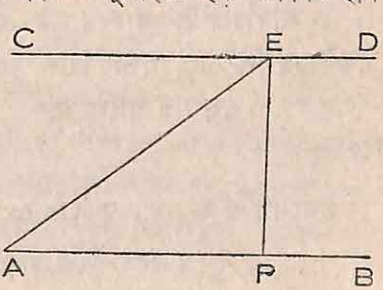
চিত্র নং 1

চলনগতি সম্পর্কীয় কয়েকটি প্রয়োজনীয় সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হইল।

## 4-3. সরণ, দ্রুতি, বেগ ও ত্বরণ :

**কোনও বস্তু চলিবার সময় যখন একস্থান হইতে অন্য স্থানে যায় তখন নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রান্ত সরলরৈখিক দূরত্বকে বস্তুর সরণ (displacement) বলে।**

2নং চিত্রে AB ও CD একটি নদীর দুই তীর বুঝাইতেছে। কোনও স্থান A হইতে একটি নৌকা যাত্রা করিয়া AB তীর বরাবর AP দূরত্ব অতিক্রম করিল এবং পরে উহা আড়াআড়ি-ভাবে নদী অতিক্রম করিয়া E-তে পৌঁছাইল। এখানে নৌকাটির প্রথম অবস্থান A এবং শেষ অবস্থান E। সুতরাং যদিও নৌকাটি প্রথমে AP এবং পরে PE দূরত্ব অতিক্রম করিল তথাপি উহার সরণ হইবে AE।



চিত্র নং 2

সরণ বুঝাইতে শুধু অতিক্রান্ত দূরত্ব বলিলে চলিবে না—কোন্ দিক বরাবর

দূরত্ব তাহাও উল্লেখ করিতে হইবে। উপরে নৌকাটির সরণ হইবে A হইতে E অভিমুখে দূরত্ব AE।

**দ্রুতি : একক সময়ে কোন বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাহাকে উহার দ্রুতি** ( speed ) **বলে**। বস্তুটি যে দিকেই যাউক না কেন বস্তুর অতিক্রান্ত সমগ্র দূরত্বকে মোট সময় দিয়া ভাগ করিলে বস্তুর দ্রুতি পাওয়া যাইবে।

**বেগ : বস্তুর একক সময়ে যে সরণ হয় তাহাকেই বস্তুর বেগ** ( velocity ) **বলে**। এখন সরণ বলিতে নির্দিষ্ট দিকে বস্তুর অতিক্রান্ত দূরত্ব বুঝায়। সুতরাং কোন বস্তুর বেগ প্রকাশ করিতে দিকের উল্লেখ করিতে হয়।

$$\text{বেগ} = \frac{\text{নির্দিষ্ট দিকে অতিক্রান্ত দূরত্ব}}{\text{সময়}}$$

**উদাহরণ :** একটি গাড়ি 4 ঘণ্টা সময়ে পূর্ব দিকে 120 কিলোমিটার দূরে কোন স্থানে গেল। উহার বেগ কত?

উঃ। এখানে অতিক্রান্ত দূরত্ব=120 কিলোমিটার এবং সময়=4 ঘণ্টা

অতএব বেগ $= \frac{120 \text{ কি. মি.}}{4 \text{ ঘণ্টা}} = 30$ কি. মি. প্রতি ঘণ্টায় পূর্বদিকে।

**দ্রুতি ও বেগের একক :** সি. জি. এস. পদ্ধতিতে দ্রুতি ও বেগের একক **সে. মি. প্রতি সেকেণ্ডে** (cm./sec.) এবং এফ. পি. এস্. পদ্ধতিতে **ফুট প্রতি সেকেণ্ডে** (ft./sec.)।

যে জাতীয় রাশি বুঝাইতে মান এবং দিক দুইয়েরই প্রয়োজন হয় তাহাদের **ভেক্টর রাশি** ও যে জাতীয় রাশি বুঝাইতে কেবল মান জানারই প্রয়োজন হয় তাহাদের **স্কেলার রাশি** বলে। যেমন দ্রুতি স্কেলার রাশি এবং বেগ ভেক্টর রাশি।

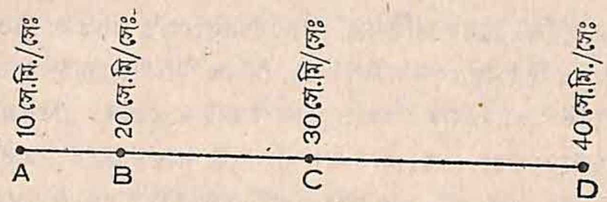
**সমবেগ ও অ-সমবেগ** (Uniform and Non-uniform Velocity) :

যখন কোন বস্তু একই দিকে চলিতে চলিতে সমান সময় ব্যবধানে সমান দূরত্ব যায়, তখন সেই বেগকে **সমবেগ** বলে। আর বস্তুটি সমান সময়ে সমান দূরত্ব অতিক্রম না করিলে বা উহার গতির দিক পরিবর্তিত হইলে বা মান এবং দিক উভয়েরই পরিবর্তন ঘটিলে বস্তুর বেগকে **অসম** বেগ বলা হয়।

ত্বরণ ( Acceleration ) ঃ

**সময়ের সহিত বেগের পরিবর্তনের হারকে ত্বরণ বলে।** অর্থাৎ একক সময়ে বস্তুর বেগের যতটা পরিবর্তন হয় তাহাই বস্তুর ত্বরণ।

3 নং চিত্রে একটি বস্তুর বেগের পরিবর্তন দেখান হইল। যখন বস্তুটি A-তে ছিল তখন উহার বেগ ছিল 10 সে. মি./সেকেণ্ড। 1 সেকেণ্ড পর বস্তুটি B-তে




চিত্র নং 3

আসিলে উহার বেগ হইল 20 সে. মি./সেকেণ্ড। আরও 1 সেকেণ্ড পর C-তে আসিলে বেগ হইল 30 সে. মি./সেকেণ্ড। এইভাবে বস্তুর বেগ ক্রমাগত বাড়িতেছে এবং প্রতি 1 সেকেণ্ড পর উহার বেগের বৃদ্ধি হয় 10 সে. মি./সেকেণ্ড। এখানে বেগ সব সময় সমান থাকিতেছে না কিন্তু প্রতি সেকেণ্ডে বেগের পরিবর্তন সমান থাকিতেছে, অর্থাৎ বস্তুটির ত্বরণ সব সময় সমান থাকে। এই জাতীয় ত্বরণকে সমত্বরণ (uniform acceleration) বলে। ইহার অন্যথায় ত্বরণকে **অ-সম ত্বরণ** (non-uniform acceleration) বলে।

ত্বরণের সংজ্ঞা হইতে বলিতে পারি, যদি স্থান A হইতে B-তে যাইতে কোন বস্তুর $t$ সেকেণ্ড সময় লাগে, তবে

$$\text{ত্বরণ} = \frac{\text{চূড়ান্ত বেগ} - \text{প্রাথমিক বেগ}}{\text{সময়}} = \frac{\text{B-তে বেগ} - \text{A-তে বেগ}}{t}$$

যদি বস্তুটির গতি সমত্বরণসম্পন্ন হয় তাহা হইলে এই ত্বরণ সমত্বরণ বুঝাইবে আর অসম ত্বরণসম্পন্ন হইলে উহা গড় ত্বরণ বুঝাইবে।

**ত্বরণের একক ঃ** একক সময়ে বেগের পরিবর্তন এক একক হইলে সেই ত্বরণকে **একক ত্বরণ** বলে। বেগের পরিবর্তনের একক ও বেগের একক ত একই হইবে। সুতরাং ত্বরণের একক হইবে বেগের একক প্রতি একক সময়ে।

**সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক ঃ** 1 সেমি. প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি সেকেণ্ডে বা 1 সেমি. প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে বা 1 সেমি./সেকেণ্ড$^2$ এবং **এফ. পি এস্. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক ঃ** 1 ফুট প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি সেকেণ্ডে বা 1 ফুট প্রতি বর্গ সেকেণ্ডে বা 1 ফুট/সেকেণ্ড$^2$।

**মন্দন** (Retardation) : যদি অসম-বেগে চলিতেছে এমন কোন বস্তুর বেগ ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে থাকে তবে প্রতি একক সময়ে বেগের যতটা হ্রাস হয় তাহাকে **মন্দন** বলে। যেমন, মনে কর, কোনও সময়ে একটি বস্তুর বেগ 20 সেমি./সেকেণ্ড। 1 সেকেণ্ড পরে বেগ হইল 15 সেমি./সেকেণ্ড। এখানে বস্তুর মন্দন হইবে 5 সেমি./সেকেণ্ড প্রতি সেকেণ্ডে বা 5 সেমি./সেকেণ্ড$^2$।

**4-4. নিউটনের গতিসূত্রাবলী** ( Newton's laws of motion )

কোনও স্থির বস্তু কেন গতিশীল হয়, যে বস্তু নির্দিষ্ট বেগে চলিতেছে তাহার বেগ আরও বাড়ানো যায় কিভাবে, কি ভাবেই বা কোনও গতিশীল বস্তুর বেগ কমান যাইতে পারে—বস্তুর গতি সম্পর্কীয় এই সমস্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে স্যার আইজাক নিউটন তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্র তিনটি সমগ্র গতিবিদ্যার (kinetics) ভিত্তিস্বরূপ বলা যাইতে পারে। এই সূত্র তিনটি নিউটনের গতিসূত্র বলিয়া পরিচিত।

**প্রথম সূত্র : বাহির হইতে প্রযুক্ত বল দ্বারা অবস্থা পরিবর্তনে বাধ্য না হইলে, যে বস্তু স্থির আছে তাহা চিরকাল স্থির-ই থাকিবে এবং সচল বস্তু সমবেগে নির্দিষ্ট সরলরেখা বরাবর চিরকাল চলিতে থাকিবে।**

**দ্বিতীয় সূত্র : কোন বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হার প্রযুক্ত বলের সহিত সমানুপাতিক এবং বল যে দিকে প্রযুক্ত হয় বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনও সেই দিকে হয়।**

**তৃতীয় সূত্র : প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।**

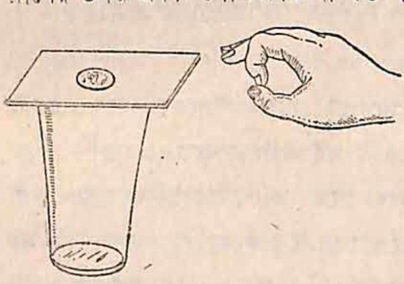
**প্রথম সূত্রের আলোচনা :** আমরা প্রথম সূত্রটিকে দুইভাগে ভাগ করিয়া দেখিতে পারি। এই সূত্রের প্রথম অংশে বলা হইয়াছে স্থির বস্তু আপনা হইতে চলিতে পারে না। আবার যাহা সচল তাহা আপনা হইতেই থামিতে পারে না বা বেগের পরিবর্তন করিতে পারে না। ইহা হইতে পদার্থ মাত্রেরই একটি বিশেষ মৌলিক ধর্ম জানা যায়। এই ধর্মের বলে বস্তু মাত্রই তাহার স্থিতি বা গতি সম্পর্কীয় অবস্থা বজায় রাখিতে চাহে। পদার্থের এই ধর্মকে **জাড্য** (Inertia) বলে। সুতরাং জাড্য দুই রকমের।

(i) **স্থিতিজাড্য** ( Inertia of rest ) : **যে বস্তু স্থির সে চিরকালই**

স্থির থাকিতে চাহে—**বস্তুর এই ধর্মের নাম স্থিতিজাড্য।** দৈনন্দিন জীবনের অসংখ্য অভিজ্ঞতা হইতেই ইহার সত্যতা বুঝিতে পারি।

(a) গাড়ী যখন হঠাৎ চলিতে আরম্ভ করে তখন গাড়ির আরোহী পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে। ইহা বস্তুর স্থিতিজাড্য ধর্মের দরুন হইয়া থাকে। গাড়ি যখন স্থির থাকে তখন গাড়িসহ আরোহীর সকল অংশ স্থির থাকে। হঠাৎ গাড়ি চলিতে শুরু করিলে আরোহীর শরীরের নিম্নাংশ গাড়ীর সংলগ্ন থাকায় গাড়ীর সহিত উহাও সঙ্গে সঙ্গে গতিশীল হয় কিন্তু আরোহীর শরীরের উপরের অংশ স্থিতি-জাড্য ধর্মের প্রভাবে নিজেকে স্থির রাখিবার প্রয়াস পায়। ফলে আরোহী পিছন দিকে হেলিয়া পড়ে।

(b) একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারাও স্থিতিজাড্য বুঝিতে পারা যায়। একটি গ্লাসের উপর একটি পোস্টকার্ড বা শক্ত কাগজের পাত রাখ এবং উহার উপর মাঝখানে একটি মুদ্রা রাখ। হঠাৎ খুব তাড়াতাড়ি তোমার আঙ্গুলের টোকা দিয়া কার্ডটিকে সরাও [চিত্র 4]। দেখিবে যে মুদ্রাটি ঠিক গ্লাসের ভিতরই পড়িবে। কার্ডটির সহিত উহা ছুটিয়া যায় না। ইহা বস্তুর স্থিতিজাড্যের প্রভাবেই হইয়া থাকে। কার্ডটিকে আস্তে আঘাত করিলে বস্তুটি বাহিরে পড়িয়া যাইবে। [ হাতের বদলে স্পীং-এর সাহায্যে আঘাত করিলে আরও ভাল হয়। ]



চিত্র নং 4

(ii) **গতি জাড্য** ( Inertia of motion ) : **সচল বস্তু চিরকাল নির্দিষ্ট সরলরেখা ধরিয়া সমবেগে চলিতে চাহে**—সচল বস্তুর নির্দিষ্ট দিকে বেগ বজায় রাখার এই প্রবণতাই **গতি-জাড্য।**

কোন সচল বস্তুই ত চিরকাল সচল থাকে না। কিছুক্ষণ পরে ইহা থামিয়া যায়। তাহা হইলে গতিশীল বস্তু ত সমবেগে চিরকাল গতিশীল হইতেছে না! তবে গতি-জাড্য নিয়ম কি ভুল? নিশ্চয়ই নহে। মনে রাখিতে হইবে গতি-জাড্যের নিয়ম তখনই কার্যকরী হইবে যখন বাহির হইতে কোনও বল বস্তুর উপর কার্যকরী না হয়। কোন বস্তু যখন রাস্তা দিয়া চলে তখন মাটির সহিত ঘর্ষণ-জনিত বল ইত্যাদি বস্তুর গতির বিরুদ্ধে কাজ করে। বিরুদ্ধ সকল প্রকার বল হইতে কোন গতিশীল বস্তুকে সাধারণতঃ মুক্ত করা অসম্ভব বলিয়াই

গতি-জাড্যের নিয়মের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দেয়। যদি সকল বিরুদ্ধ বল হইতে মুক্ত করা সম্ভব হইত তবেই দেখা যাইত সচল বস্তু অনন্তকাল ধরিয়া সচল থাকে। গতি-জাড্যের কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হইল।

(a) চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামিলে আরোহীরা সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। ইহা গতি-জাড্য ধর্মের জন্যই হইয়া থাকে। চলমান গাড়ির আরোহীর শরীরের উপরের ও নীচের সকল অংশই গাড়ির সঙ্গে গতিশীল। গাড়ি থামিলে শরীরের নীচের দিক গাড়ির সহিত সংলগ্ন বলিয়া সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া যায়, কিন্তু শরীরের উপরের অংশ উহার পূর্বের গতি বজায় রাখিতে চাহে বলিয়া আরোহী সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে। সেইরূপে চলন্ত গাড়ি হইতে নামিবামাত্রই পা মাটির সঙ্গে লাগিয়া স্থির অবস্থায় আসে কিন্তু শরীরের উপরের অংশ গাড়ির গতি তখনও বজায় রাখিতে চায় বলিয়া আরোহী সামনের দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়ে।

(b) চলন্ত ট্রেনের ভিতরে কোন আরোহী সোজা উপরের দিকে একটি মুদ্রা ছুঁড়িলে উহা আবার তাহার হাতের উপরই আসিয়া পড়ে। মুদ্রাটি গতি-জাড্যের জন্য গাড়ির অনুভূমিক গতি বজায় রাখে এবং আরোহীর সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া যায়। ফলে উহা আরোহীর হাতের উপরই আসিয়া পড়ে ; যদি না ইতিমধ্যে গাড়ির গতির কোন পরিবর্তন ঘটে।

নিউটনের প্রথম গতিসূত্র হইতে আর একটি যে-বিষয় আমরা জানিতে পারি তাহা হইল—**বলের সংজ্ঞা : যাহা কোনও বস্তুর স্থির অবস্থার বা গতির পরিবর্তন করে বা পরিবর্তন ঘটাইতে চেষ্টা করে তাহাই বল।**

বেগের মান বা দিক বা উভয়েরই পরিবর্তন হইলে বস্তুর গতির পরিবর্তন হয়। বলের সাহায্যে যাহা স্থির তাহাকে সচল করা যাইতে পারে। ধর একটি গাড়ি স্থির অবস্থায় আছে ; তুমি ধাক্কা দিয়া উহাকে একটুও সরাইতে পারিতেছ না, তাহা হইলে কি তুমি বলপ্রয়োগ করিতেছ না ? নিশ্চয়ই করিতেছ, কারণ তুমি দাঁড়াইয়া থাকা গাড়িটিকে গতিশীল করার চেষ্টা করিতেছ। এখানে গাড়িটির ভর যদি খুব কম হইত তাহা হইলে ধাক্কা দিয়া ইহাকে তুমি সচল করিতে পারিতে। সুতরাং একই বল দ্বারা একটি বস্তুর স্থিতি-জড়তার অবস্থার পরিবর্তন হইতেছে না, কিন্তু অপর একটি বস্তুর ক্ষেত্রে আবার পরিবর্তন সম্ভব হইতেছে। বস্তুর মূলতঃ যে ধর্মের জন্য এখানে দুই ক্ষেত্রে দুই রকম হইতেছে তাহা হইল বস্তুর ভর। প্রথম ক্ষেত্রে বস্তুর ভর বেশী বলিয়া তোমার ধাক্কায়

উহা সচল হয় না, কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুটির ভর কম বলিয়া তোমার ধাক্কাতেই সচল হইতে পারে। এইজন্য **বস্তুর ভরকে বস্তুর জাড্যের বা জড়তার পরিমাপ** ( measure of inertia ) বলা হয়।

বল যে শুধু স্থির বস্তুকে সচল করিতে পারে তাহা নয়, বস্তুর গতি-জড়তার অবস্থার পরিবর্তনও করিতে পারে বা পরিবর্তনের চেষ্টা করিতে পারে। একটি গাড়ি ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার বেগে যাইতেছে, তাহাকে বল প্রয়োগ করিয়া যেমন ঘণ্টায় 50 কিলোমিটার বা অন্য কোন বেগে চালাইতে পারা যায়, আবার বিরুদ্ধ দিকে বল প্রয়োগ করিয়া তেমন উহার বেগ কমাইতে বা উহাকে থামাইতে পারা যায় ; অর্থাৎ বল ত্বরণের কিংবা মন্দনের সৃষ্টি করিতে পারে বা করিতে চেষ্টা করে।

## দ্বিতীয় গতিসূত্রের আলোচনা ঃ

এই সূত্র বলের পরিমাণ নির্ণয়ের একটি উপায় নির্দেশ করে। একটি মসৃণ মেঝেতে একটি হাল্কা বলকে ধাক্কা দিলে যে বেগে গড়াইয়া যাইবে, অপর একটি ভারী বলকে একই রকম ধাক্কা দিলে সেই বেগে গড়াইয়া যাইবে না ; আরও কম বেগে গড়াইয়া যাইবে। দুইটি একই রকমের ট্রাকের একটি মালবোঝাই ও অপরটি খালি অবস্থায় একই বেগে গতিশীল থাকিলে প্রথমটিকে থামাইতে বেশী বলের প্রয়োজন হয়। এই জন্যই বস্তুর গতি বুঝিতে হইলে বস্তুর ভর ও বেগকে একসঙ্গে চিন্তা করিতে হইবে।

ভর ও বেগের সমন্বয়ে গতিশীল বস্তুতে যে ধর্মের সৃষ্টি হয় তাহাকে **ভরবেগ** বলে। উহা বস্তুর ভর ও বেগের গুণফলের সমান। বস্তুর ভরকে যেমন উহার জড়তার পরিমাপ বলা যায়, ভরবেগকে তেমন বস্তুর গতির পরিমাপ বলা যায়। বস্তুর ভরবেগ যত বেশী হইবে তাহাকে থামাইতে তত বেশী বলের প্রয়োজন হইবে। বেগের দিক আছে। ভরবেগেরও দিক আছে। বস্তুর বেগের দিকই উহার ভরবেগের দিক।

যত কম সময়ে ভরবেগের পরিবর্তন করিতে হইবে বস্তুতে তত বেশী বল প্রয়োগ করিতে হইবে। ভরবেগের কোন নির্দিষ্ট পরিবর্তনের জন্য যে সময় লাগে তাহা প্রযুক্ত বলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ভরবেগ এবং বলের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিউটন সূত্রের আকারে প্রকাশ করেন এবং ইহা দ্বিতীয় গতিসূত্র নামে পরিচিত। প্রযুক্ত বল ভরবেগের পরিবর্তনের হারের উপর নির্ভরশীল এবং উহার সহিত সমানুপাতিক।

এখন ভরবেগ পরিবর্তনের হার

$$= \frac{\text{ভরবেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}},$$

$$= \text{ভর} \times \frac{\text{বেগের পরিবর্তন}}{\text{সময়}}$$ [ গতির জন্য বস্তুর ভর পরিবর্তিত হয় না বলিয়া ]

$$= \text{ভর} \times \text{ত্বরণ।}$$ [ ত্বরণের সংজ্ঞা হইতে ]

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্রানুযায়ী, বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল 'ভর × ত্বরণ' এই গুণফলের উপর নির্ভরশীল। এইজন্য ভর এবং ত্বরণের এককের উপর নির্ভর করিয়া বলের একক পাওয়া যায়।

**একক বল : একক ভরসম্পন্ন কোনও বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করিলে একক ত্বরণ সৃষ্টি করে তাহাই একক বল।**

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক **ডাইন**। **যে বল 1 গ্রাম ভরসম্পন্ন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে বস্তুতে 1 সেমি./সেকেণ্ড$^2$ ত্বরণ সৃষ্টি করে তাহাই 1 ডাইন** (dyne) **বল।**

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক **পাউণ্ডাল**। **যে বল 1 পাউণ্ড ভরসম্পন্ন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োগ করিলে বস্তুতে 1 ফুট/সেকেণ্ড$^2$ ত্বরণ সৃষ্টি করে তাহাই 1 পাউণ্ডাল** (poundal) **বল**।

**গ্রাম-ভার ও পাউণ্ড-ভার**—এই জাতীয় এককেও অনেক সময় বলকে প্রকাশ করা হয়। ইহাদের বলের অভিকর্ষীয় একক বলে।

**গ্রাম-ভার :** 1 গ্রাম ভরসম্পন্ন বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে তাহাই **1 গ্রাম-ভার**।

**পাউণ্ড-ভার :** 1 পাউণ্ড ভরসম্পন্ন কোনও বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে তাহাই **1 পাউণ্ড-ভার**।

মনে রাখিবে 1 **গ্রাম-ভার** = g ডাইন = 980 ডাইন [ g = অভিকর্ষজ ত্বরণ = 980 সেমি/সে.$^2$ ] 1 **পাউণ্ড-ভার** = g পাউণ্ডাল = 32 পাউণ্ডাল [ g = 32 ফুট/সে.$^2$ ]

অনেক সময় বলকে **নিউটন** এককে প্রকাশ করা হয়। 1 কিলোগ্রাম ভরসম্পন্ন কোন বস্তুতে যে বল প্রয়োগ করিলে 1 মিটার/সেকেণ্ড$^2$ ত্বরণ উৎপন্ন হয় তাহাই **নিউটন**। ইহা এম. কে. এস. পদ্ধতিতে বলের চরম একক।

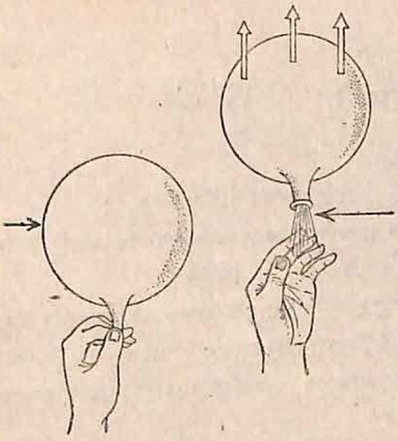
**মনে রাখিবে**—বল যে দিকে প্রযুক্ত হয় ভরবেগের পরিবর্তন সেই দিকে হয়। বল যতক্ষণ ধরিয়া প্রযুক্ত হয় বেগের পরিবর্তন ততক্ষণ ধরিয়াই হয়।

কোন মুহূর্তে বল প্রয়োগ বন্ধ হইলে সেই মুহূর্তে বস্তুর যে বেগ ছিল তাহা লইয়াই বস্তু বেগের দিকে সরলরেখা বরাবর চলিতে থাকে।

**তৃতীয় সূত্রের আলোচনা :**

ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া বলিতে এখানে বল বোঝায়। মনে কর, A ও B দুইটি বস্তু। A-এর উপর B কোন বল প্রয়োগ করিলে তৃতীয় সূত্রানুযায়ী A বস্তুটিও B-এর উপর সমান ও বিপরীত বল প্রয়োগ করিবে। A-র উপর বলকে ক্রিয়া বলিলে B-এর উপর বলকে প্রতিক্রিয়া বলিব। টেবিলের উপর একখানি বই আছে। বইটির ওজন আছে। সুতরাং বইটি টেবিলের উপর চাপ দিতেছে। আবার টেবিলও বইটির উপর সমান চাপ উপর দিকে দিতেছে। টেবিলের উপর চাপকে ক্রিয়া বলিলে টেবিল যে বইটিকে চাপ দিতেছে তাহাকে প্রতিক্রিয়া বলিব। ক্রিয়া যতক্ষণ কার্যকরী থাকিবে, প্রতিক্রিয়াও ততক্ষণ কাজ করিবে। বস্তু সচল বা নিশ্চল থাকুক, পরস্পর সংস্পর্শে থাকুক বা না থাকুক, তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সর্বদা সমান ও বিপরীত হইবে। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া সবসময়ই দুইটি ভিন্ন বস্তুর উপর পড়িবে, কখনও একই বস্তুর উপর নহে। কেবল ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া কখনও সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারে না। কারণ সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য সমান বিপরীতমুখী দুইটি বল একই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হইতে হইবে।

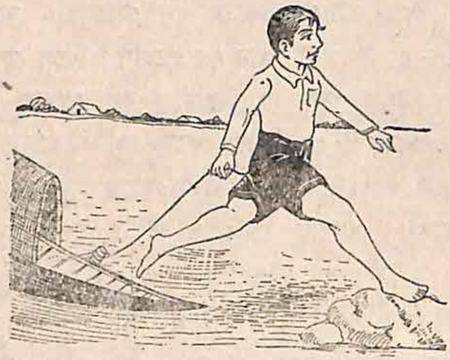
**তৃতীয় সূত্রের কয়েকটি উদাহরণ :**



চিত্র নং 5

(i) একটি বায়ুপূর্ণ বেলুনকে [চিত্র 5] হঠাৎ খুলিয়া দাও। দেখিবে বায়ু যেদিক দিয়া বাহির হইয়া আসে তার বিপরীত দিকে বেলুনটি উঠিয়া যাইতেছে। বায়ু নির্গমনের প্রতিক্রিয়ার জন্যই বেলুনের এই ঊর্ধ্বগতি। আতসবাজী ও রকেট এই জন্যই ঊর্ধ্বে ছুটিয়া যায়। ইহাদের ভিতর যে জ্বালানি থাকে তাহার দহনের ফলে উচ্চচাপবিশিষ্ট গ্যাস নীচের দিকে ছুটিয়া আসে। ইহার ফলে যে বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া বল সৃষ্টি হয় তাহারই ধাক্কায় রকেট উপরে ছুটিয়া যায়।

(ii) যখন একটি নৌকার আরোহী হঠাৎ নৌকা হইতে লাফ দিয়া তীরে নামে, নৌকাটি পিছন দিকে সরিয়া যায় [ চিত্র 6 ], লাফ দেওয়ার সময় লোকটি পা দিয়া নৌকার উপর চাপ দেয়। ইহা ক্রিয়া। নৌকাও



চিত্র নং 6

লোকটির পায়ের উপর সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া বল প্রয়োগ করে যাহার ফলে লোকটি তীরে আসিয়া পড়ে।

(iii) যখন বন্দুক হইতে গুলি ছোঁড়া হয় তখন যে ব্যক্তি বন্দুক ছোঁড়ে সে পিছনে ধাক্কা অনুভব করে। ইহা গুলিতে যে ক্রিয়া হয় বন্দুকের উপর তাহার প্রতিক্রিয়ার ফল।

এই রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে।

## প্রশ্নাবলী

1. সংজ্ঞা লিখ : দ্রুতি, বেগ, ত্বরণ ও মন্দন।

2. দ্রুতি ও বেগের পার্থক্য বুঝাইয়া দাও। ত্বরণ ও মন্দনের পার্থক্য কি ?

ত্বরণের একক কি ? ইহাতে প্রতি সেকেণ্ড$^2$ বা প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি সেকেণ্ডে কথাটি আসে কেন ?

3. একটি ট্রেনের বেগ ঘণ্টায় 80 কিলোমিটার, উহার বেগ ফুট/সেকেণ্ড এককে প্রকাশ কর।

4. একটি গাড়ি কোন এক সময়ে ঘণ্টায় 40 কিলোমিটার বেগে যাইতেছিল। তারপর উহার বেগ বাড়িতে বাড়িতে 12 সেকেণ্ড পরে ঘণ্টা-প্রতি 65 কিলোমিটার হইল। উহার ঐ সময়ে ত্বরণ কত ছিল ?

5. নিউটনের প্রথম গতিসূত্র বিবৃত কর। গতিজাড্য ও স্থিতিজাড্য বলিতে কি বোঝ ? বস্তুর ভরকে বস্তুর জাড্যের পরিমাপ বলা হয় কেন ?

6. বল ও ভরবেগের সংজ্ঞা লিখ। বলের সি. জি. এস. পদ্ধতির এককের সংজ্ঞা লিখ। নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র বিবৃত কর।

7. নিউটনের গতিসূত্রগুলি বিবৃত কর। তৃতীয় গতিসূত্রের দুইটি দৃষ্টান্ত দাও।

8. নিম্নলিখিত উক্তিগুলির মধ্যে যেটি সত্য বলিয়া মনে হয় তাহার ডানদিকে শূন্যস্থানে R এবং যেটি ভুল বলিয়া মনে হয় তাহার ডান দিকের শূন্যস্থানে W বসাও।

(i) নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকে জড়তার সূত্র বলা হয়। —

(ii) মন্দন বলিতে এক বিশেষ প্রকারের ত্বরণকে বোঝায়। —

(iii) দ্রুতি ও বেগ বলিতে একই জিনিস বোঝায়। —

(iv) দ্রুতি ও বেগের একক একই। —

(v) বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল ভরবেগের পরিবর্তনের সহিত সমানুপাতিক। —

(vi) ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া একই বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয়। —

9. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির পাশে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যেটি নির্ভুল মনে কর তাহার নীচে দাগ দাও।

(i) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে বলের একক কি হইবে? — ডাইন, গ্রাম, পাউণ্ডাল।

(ii) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ত্বরণের একক কি হইবে?

সেমি./সেকেণ্ড, মি./সেকেণ্ড, সেমি./সেকেণ্ড²।

(iii) সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ওজনের একক কি হইবে? গ্রাম, কিলোগ্রাম, ডাইন।

(iv) চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামিলে আরোহীরা সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে কেন?— স্থিতিজাড্যের দরুন, গতিজাড্যের দরুন।

10. নিম্নলিখিত প্রশ্ন দুইটির উত্তর দাও—

(i) মালবোঝাই লরি খালি লরির মত দ্রুতবেগে চলিতে পারে না কেন?

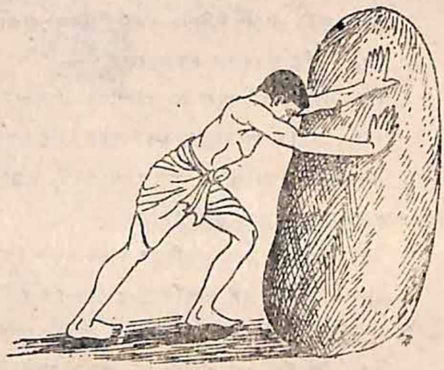
(ii) চলন্ত বাস হইতে নামিবার সময় কোন ব্যক্তি সামনের দিকে হুমড়ি খাইয়া পড়িতে পারে কেন?

---

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

# কার্য, ক্ষমতা ও শক্তি
## (Work, Power and Energy)

**5-1.** কার্য বলিতে কি বোঝায় ?—কার্য কথাটি সাধারণভাবে নানা অর্থে আমরা ব্যবহার করিয়া থাকি। কার্য দৈহিক, মানসিক, যান্ত্রিক নানা ধরনের হইতে পারে। এক ব্যক্তি একটি বিরাট পাথরকে সরাইবার জন্য ঠেলিতেছে [ চিত্র 1 ]; কিন্তু ঠেলিয়া সরাইতে পারিতেছে না। তবুও তাহার দৈহিক পরিশ্রম হইয়াছে। তুমি বই পড়িতেছ, শিক্ষক তোমাদের পড়াইতেছেন, চিত্রকর ছবি আঁকিতেছেন, একজন মাঝি নদীর স্রোতে



চিত্র নং 1

কোনওক্রমে তাহার নৌকাটিকে ধরিয়া রাখিতেছে। প্রতিক্ষেত্রেই সাধারণভাবে আমরা বলি প্রত্যেকে কাজ করিতেছে। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় একটি ক্ষেত্রেও কার্য হইয়াছে বলা হইবে না। আবার মনে কর তুমি একটি বস্তুতে বল প্রয়োগ করিয়া যেদিকে বল প্রয়োগ করিয়াছ সেইদিকে বস্তুটিকে সরাইতে পারিয়াছ। এখানে তোমার প্রযুক্ত বল দ্বারা বস্তুর উপর কার্য হইয়াছে—ইহা বলা বিজ্ঞানসম্মত হইবে। কার্য



চিত্র নং 2

কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইলেও বিজ্ঞানে কার্য একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যেমন ইংরাজী 'রান' (run) কথাটির অর্থ অভিধানে নানারকম পাওয়া যায়। কিন্তু তোমরা জান ক্রিকেট খেলায় রান কথাটি একটি বিশেষ অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

কোন কার্য করিতে খানিকটা বলের প্রয়োজন, বল যত প্রচণ্ডই হউক না কেন বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণ না হইলে কার্য হইবে না। সরণ যদি বলের

বিপরীত দিকে হয় তবে **বলের বিরুদ্ধে** কার্য করা হইয়াছে। আর বলের দিকে সরণ হইলে **বল কর্তৃক** কার্য করা হইয়াছে বলা হয়।

**5·2. কার্যের পরিমাপ :** কার্যের পরিমাপের জন্য কার্যের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া হয় :

**প্রযুক্ত বল ও বলের প্রয়োগবিন্দুর সরণের গুণফলকে কার্য বলে।**

অর্থাৎ | কার্য = বল × বলের দিকে প্রয়োগবিন্দুর স্থানচ্যুতি |

**কার্যের একক :** কার্যের সংজ্ঞা হইতে কার্যের একক হইবে বলের একক × সরণের একক।

এই অনুসারে সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের চরম একক হওয়া উচিত ডাইন সে. মি.। ইহার পরিবর্তে **সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের চরম একককে বলা হয় আর্গ** (গ্রীক Ergon শব্দ হইতে—যাহার অর্থ কাজ করা)। 1 ডাইন পরিমাণ বলপ্রয়োগ করিলে বলের অভিমুখে প্রয়োগবিন্দুর সরণ 1 সে. মি. হইলে 1 আর্গ কার্য হইবে।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের চরম একক **ফুট-পাউণ্ডাল**। 1 পাউণ্ডাল পরিমাণ বলপ্রয়োগ করিলে বলের অভিমুখে প্রয়োগবিন্দুর 1 ফুট সরণ হইলে 1 ফুট পাউণ্ডাল কার্য হইবে।

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক **গ্রাম সেন্টিমিটার।**

1 গ্রাম ভরের কোন বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে 1 সেন্টিমিটার (খাড়াভাবে) তুলিলে 1 গ্রাম সেন্টিমিটার কার্য হয়।

এফ. পি. এস্. পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক ফুট-পাউণ্ড।

1 পাউণ্ড ভরের কোন বস্তুকে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে 1 ফুট (খাড়াভাবে) তুলিলে 1 ফুট-পাউণ্ড কার্য হয়।

**1 গ্রাম সে. মি. = 980 আর্গ। 1 ফুট-পাউণ্ড = 32·2 ফুট-পাউণ্ডাল।**

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে কার্যের ব্যবহারিক একক জুল (জুল—বিজ্ঞানী Joule-এর নামানুযায়ী)। **1 জুল = $10^7$ আর্গ।** 1 ফুট-পাউণ্ড = 1·35 জুল।

**ক্ষমতা :** যখন কার্য করা হয় তখন আমাদের শুধু সমগ্র কার্যের পরিমাণ জানিলেই চলে না। অনেক সময় কার্য কি হারে করা হয় তাহাও জানা দরকার হয়। মনে কর, একটি মোটর পাম্প 1 মিনিটে 1000 লিটার জল 10 মিটার উপরে তুলিতে পারে; আবার একটি লোক 1 ঘন্টায় ঐ পরিমাণ

জল ঐ উচ্চতায় তুলিতে পারে। মোট কার্যের পরিমাণ উভয় ক্ষেত্রেই সমান, কিন্তু কার্য করিবার হার ভিন্ন। আমরা বলি পাম্পের কার্যের হার বেশী বা ইহার কার্য করিবার ক্ষমতা বেশী।

**কার্য করিবার হারকে ক্ষমতা বলে।**

$$\text{ক্ষমতা} = \frac{\text{মোট কার্য}}{\text{কার্যের সময়}}$$

**ক্ষমতার একক ঃ**

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার চরম একক আর্গ/সেকেণ্ড

সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার অভিকর্ষীয় একক গ্রাম সে. মি./সেকেণ্ড।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার চরম একক ফুট-পাউণ্ডাল/সেকেণ্ড।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার অভিকর্ষীয় একক ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড।

**ব্যবহারিক একক ঃ** সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক **ওয়াট**। 1 ওয়াট = 1 জুল/সেকেণ্ড = $10^7$ আর্গ/সেকেণ্ড।

এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক **হর্স পাওয়ার** বা অশ্ব-ক্ষমতা ( সংক্ষেপে H. P. )। যদি কোন ব্যক্তি বা যন্ত্র 550 পাউণ্ড-ভরের কোন বস্তুকে 1 সেকেণ্ডে অভিকর্ষ-বলের বিরুদ্ধে খাড়া 1 ফুট তুলিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি বা যন্ত্রের ক্ষমতা 1 হর্স-পাওয়ার অর্থাৎ

1 হর্স **পাওয়ার** = 550 **ফুট-পাউণ্ড/সেকেণ্ড** = 33000 ফুট-পাউণ্ড/মিনিট।

**মনে রাখিবে ঃ** 1 হর্স-পাওয়ার = 749 ওয়াট।

**শক্তি ঃ** যখন কোনও বস্তুর উপর কার্য করা হয় তখন বস্তুকে একটা কিছু দেওয়া হয়, যাহা উহাতে থাকে এবং পরবর্তীকালে উহাকে কার্য করিবার সামর্থ্য দেয়। যখন ঘড়িতে দম দেওয়া হয় ঘড়ির স্প্রিং-এ কার্য করিয়া উহাকে গুটান হয় ; এই গুটান অবস্থায় স্প্রিং এমন একটা কিছু পায় যাহাতে উহা কার্য করিতে পারে এবং ঘড়িটিকে সচল রাখে। একটি বড় পাথরখণ্ডকে উপরে তুলিতে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে উহার উপর কার্য করিতে হয়। তারপর উহাকে ছাড়িয়া দিলে নীচে মাটিতে পোঁতা একটি খুঁটির উপর পড়িয়া খুঁটিটিকে আরও মাটিতে ঢুকাইতে পারে। যখন একটি বন্দুক ছোঁড়া হয় বিস্ফোরণকারী গ্যাস

বুলেটের উপর কার্য করে যাহার ফলে বুলেটটি ছুটিয়া যায় এবং কোন বস্তুর উপর পড়িলে কার্য করিতে পারে। এখানে ঘড়ির স্প্রিং-এ, উপরে-তোলা পাথরখণ্ডে এবং বুলেটে কার্য করা হয়, তাহার ফলে উহারা এমন কিছু লাভ করে যাহাতে উহারা কার্য করিবার সামর্থ্য পায়। যাহা লাভ করায় বস্তু এই কার্য করিবার সামর্থ্য পায় তাহাই শক্তি। কার্য করিলে বস্তুর শক্তি কমিয়া যায়। বস্তুতে যতটা শক্তি থাকে ততটাই কার্য করিতে পারে, তাহার বেশী নহে।

কোন বস্তুর কার্য করিবার সামর্থ্য থাকিলেই উহার শক্তি আছে বলা হয়। নির্দিষ্ট অবস্থানে বা অবস্থাধীনে **বস্তু মোট যে পরিমাণ কার্য করিতে পারে তাহাই বস্তুর শক্তির পরিমাণ।**

শক্তি ও কার্য এক প্রকারের রাশি বলিয়া শক্তি ও কার্যের একক একই হইবে।

### 5-3. স্থিতি-শক্তি ও গতিশক্তি

**স্থিতিশক্তি ঃ** একটি পাথরখণ্ড উপরে তুলিলে অভিকর্ষের বিরুদ্ধে কার্য করিতে হয়। পাথরটি উপরে থাকা অবস্থায় এই কার্য ইহার মধ্যে শক্তি হিসাবে থাকে। কারণ ইহাকে ছাড়িয়া দিলে নীচে কোন বস্তুর উপর পড়িয়া কার্য করিতে পারে। আবার ঘড়িতে দম দিলে স্প্রিং গুটাইয়া যায় অর্থাৎ তাহার স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তন হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসার চেষ্টায় স্প্রিং তাহার সহিত সংলগ্ন কলকব্জাতে বল-প্রয়োগ করে এবং তাহাতে ঘড়ি চলে। এইখানে উপরে-তোলা পাথরখণ্ড তাহার **স্বাভাবিক অবস্থানের** পরিবর্তনের জন্য এবং ঘড়ির স্প্রিংটি উহার স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি পায় তাহাই স্থিতি-শক্তি। বস্তু স্থির অবস্থায় থাকিয়া উহার অবস্থান বা আকারের পরিবর্তনের জন্য যে শক্তি পায় তাহাকে **স্থিতিশক্তি** বলে। বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থান বা আকার হইতে উহার পরিবর্তিত অবস্থান বা আকারে নিয়া যাইতে উহার উপর যে কার্য করিতে হয় তাহাই উহার স্থিতিশক্তির পরিমাণ।

$m$-ভরবিশিষ্ট বস্তুর মাটির উপর $h$ উচ্চতায় স্থিতিশক্তির পরিমাণ $mgh$। এখানে $g$ অভিকর্ষ বলের জন্য ত্বরণ।

**গতিশক্তি ঃ** কোন গতিশীল বস্তু উহার গতির দরুন কার্য করিবার যে সামর্থ্য পায় তাহাকে **গতি-শক্তি** বলে।

বস্তুর গতির বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করিয়া বস্তুটিকে থামাইলে ঐ প্রযুক্ত বলের বিরুদ্ধে বস্তুটি যে পরিমাণ কার্য করিতে পারে তাহাই হইবে বস্তুর **গতিশক্তির পরিমাণ**।

একটি চলন্ত ট্রেন, রাইফেল হইতে ছোঁড়া বুলেট, প্রবহমান জল প্রত্যেকের মধ্যেই গতিশক্তি আছে।

5-4. **সরল যন্ত্র** ( Simple machines ) ঃ

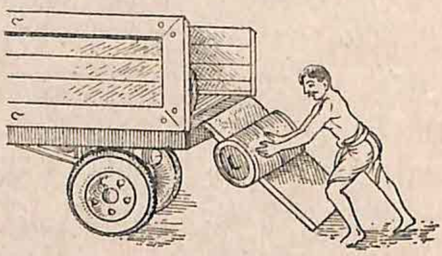
কার্য যত কঠিন হয় সেই কার্য করিবার জন্য পরিশ্রমও হয় তত বেশি। মানুষও সেইজন্য তাহার বুদ্ধি খাটাইয়া উপায় বাহির করে কিভাবে কম পরিশ্রমে কঠিন কার্য করা যাইতে পারে। কার্যকে সহজ করিবার চেষ্টার ফলশ্রুতি হিসাবে যন্ত্রের সৃষ্টি।

যন্ত্র বলিতে আমরা এমন ব্যবস্থাকেই বুঝি যাহা দ্বারা অল্প বল প্রয়োগ করিয়া বেশী বাধা অতিক্রম করা সম্ভব হয়। কোন যন্ত্রই নিজ হইতে শক্তি তৈরী করিতে পারে না। কার্য করিবার জন্য কোথাও হইতে শক্তি যোগাইতে হইবে এবং যন্ত্রের সাহায্যে সর্বাপেক্ষা বেশী যে কার্য পাওয়া যাইতে পারে তাহা কখনও যন্ত্রে যোগান শক্তি অপেক্ষা বেশী হইতে পারে না। যন্ত্রের সাহায্যে আমরা যে সুবিধা পাইতে পারি তাহাকে **যান্ত্রিক সুবিধা** ( mechanical advantage ) বলে।

যন্ত্রে যে বলের বিরুদ্ধে কার্য করা হয় সেই বলকে **রোধ** ( load ) বলিলে এবং প্রযুক্ত বলকে চেষ্টা ( effort ) বলিলে, **যান্ত্রিক সুবিধা** $=\frac{\text{রোধ}}{\text{চেষ্টা}}$

**আনত তল** ঃ কোন ভারী বস্তুকে খাড়া উচ্চস্থানে তুলিতে যত পরিশ্রম হয় উহাকে একটি ঢালু পথে উঠাইতে তত পরিশ্রম হয় না।

পাহাড়ে উঠিবার সময় সোজা খাড়াভাবে না উঠিয়া অল্প ঢালু রাস্তা দিয়া উঠিলে কম কষ্ট হয়।

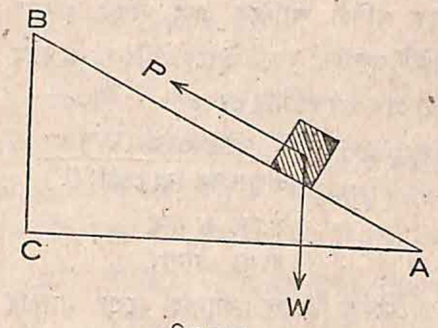


চিত্র নং ৪

লরিতে বা রেলের ওয়াগনে টিনের বড় বড় পিপা তুলিবার জন্য আনত তল ব্যবহার করা হয় [ চিত্র 3 ]। ইহাতে অপেক্ষাকৃত কম আয়াসে এই কার্য করা সম্ভব হয়।

কোন কাঠের তক্তা বা ঐ জাতীয় কোন সমতলকে অনুভূমিকভাবে না রাখিয়া অনুভূমিক তলের সহিত কোন কোণে আনত রাখিলে উহাকে **আনত তল** বলে।

W ওজনের ( চিত্র নং 4 ) একটি বস্তুকে AB আনত তলের উপর রাখা হইয়াছে। আনত তলটি AC অনুভূমিক তলের সহিত ∠BAC কোণে আনত আছে।



চিত্র নং 4

বস্তুটিকে সোজা উপর দিকে C হইতে B-তে তুলিতে যে-কার্য করিতে হয় তাহার পরিমাণ=বল × দূরত্ব= $W \times BC$.

কিন্তু বস্তুটিকে আনত তল বরাবর P বল দিয়া টানিয়া A হইতে B-তে নিয়া গেলে কার্য হইবে= $P \times AB$ ; ( স্পর্শতলে ঘর্ষণজনিত বাধা না থাকিলে ) বস্তুটিকে যে ভাবেই তোলা হউক না কেন এই দুই কার্যের পরিমাণ সমান হইবে।

অতএব $P \times AB = W \times BC$ বা $\frac{W}{P} = \frac{AB}{BC}$

স্পষ্টতঃই BC অপেক্ষা AB বড়। সুতরাং P-বল W-ভার অপেক্ষা অনেক কম। অর্থাৎ আনত তলের সাহায্যে কোন বস্তুকে উপরে তুলিতে যে-বল প্রয়োজন হয় তাহা বস্তুটিকে সোজাসুজি উপরে তুলিতে যে-বল প্রয়োজন হইত তাহা অপেক্ষা অনেক কম। ফলে আনত তলে কার্য করা সহজ হয়।

পার্বত্য-অঞ্চলের ক্রমশঃ উঁচু তৈরী রাস্তা, মই-এর ব্যবহার, স্ক্রু-ড্রাইভার, ছুরি, বাটালি ইত্যাদির ফলা—এই সব ক্ষেত্রে আনত তলের সুবিধার নীতিকে কাজে লাগান হয়।

**চক্র ও অক্ষদণ্ড** (Wheel and Axle)

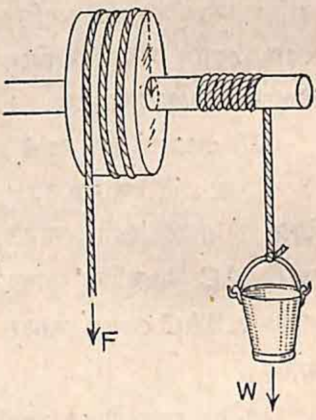
ইহাতে বেলনাকৃতি একটি দণ্ডের সঙ্গে একটি বড় ব্যাসার্ধের চক্র সমাক্ষ-ভাবে পরান থাকে যাহাতে উভয়ই একই অক্ষের উপর ঘুরিতে পারে [ চিত্র 5 ]। উভয়ের গায়ে একটি করিয়া দড়ি পরস্পরের বিপরীত পাকে জড়ান থাকে। যে ভারী বস্তুটিকে উপরে তুলিতে হইবে তাহাকে দণ্ডের সাথে জড়ান দড়ির প্রান্তে

আটকান হয়। যদি চক্রের সঙ্গে জড়ান দড়ির একপ্রান্ত টানা হয় উহার দড়ির পাক খুলিয়া আসিবে এবং দণ্ডের গায়ের দড়িটি জড়াইয়া বস্তুটি উপরে উঠিবে। এক্ষেত্রে ইহা প্রমাণ করা যায় যে

$$\text{যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{বস্তুর ওজন (W)}}{\text{প্রযুক্ত বল (বা চেষ্টা) (F)}}$$

$$= \frac{\text{চক্রের ব্যাসার্ধ}}{\text{দণ্ডের ব্যাসার্ধ}}$$

যেহেতু চক্রের ব্যাসার্ধ দণ্ডের ব্যাসার্ধ অপেক্ষা অনেক বড়, কম চেষ্টায় বেশী ওজনের বস্তুকে তোলা সম্ভব হইবে, অর্থাৎ যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যাইবে।



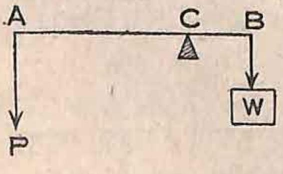

চিত্র নং 5

## লিভার ( Levers )

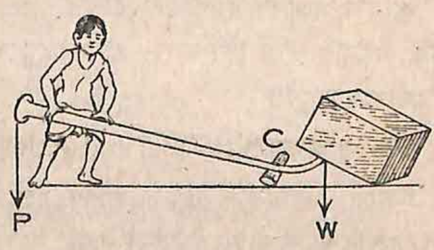
লিভার একটি শক্ত দণ্ড যাহা দৃঢ়সংলগ্ন কোন স্থির বিন্দুর দুই দিকে ঘুরিতে পারে। ঐ স্থির বিন্দুটিকে বলা হয় আলম্ব। দণ্ডের এক স্থানে অতিক্রমণীয় বাধা এবং অপর এক স্থানে **বল** প্রয়োগ করা হয়। আলম্ব হইতে বলের প্রয়োগবিন্দু পর্যন্ত লম্ব-দূরত্বকে **বল বাহু** এবং আলম্ব হইতে বাধা বা ভারের প্রয়োগ রেখা পর্যন্ত লম্ব-দূরত্বকে **ভার বাহু** বলে।

লিভারকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ঃ (i) প্রথম শ্রেণীর লিভার, (ii) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার ও (iii) তৃতীয় শ্রেণীর লিভার।

**প্রথম শ্রেণীর লিভারঃ** এই জাতীয় লিভারে ভার ও বলের অন্তর্বর্তী কোন স্থানে আলম্ব থাকে। চিত্র 6 (i)-এ AB লিভার এবং C আলম্ব।




চিত্র নং 6 (i)



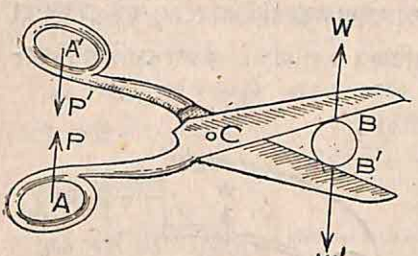

চিত্র নং 6 (ii)

এখানে সাধারণতঃ আলম্ব হইতে দূরবর্তী প্রান্ত A বিন্দুতে বল P প্রয়োগ করা

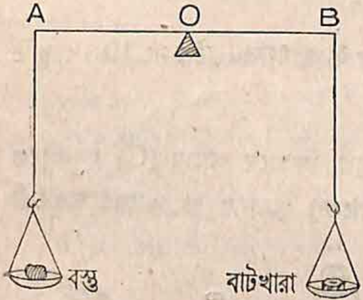
হয় এবং আলম্বের নিকটবর্তী প্রান্ত B বিন্দুতে ভার W থাকে। এই অবস্থায় দণ্ডটিকে অনুভূমিক রাখিতে পারিলে, $P \times AC = W \times BC$

$$\therefore \text{ লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা} = \frac{\text{ভার (W)}}{\text{বল (P)}} = \frac{\text{বল-বাহু (AC)}}{\text{ভার-বাহু (BC)}}$$

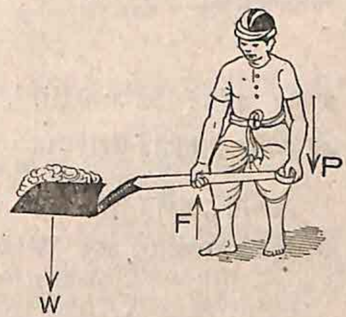
যেহেতু BC বাহু অপেক্ষা AC বাহু বড় এই শ্রেণীর লিভারে কম বল প্রয়োগ করিয়া বেশী ভার তোলা যায়। অর্থাৎ ইহাতে যান্ত্রিক সুবিধা আছে। শাবল, নলকূপের পাম্পের হাতল, কাঁচি, ঢেঁকি, বেলচা [চিত্র নং 8 (ii)] প্রভৃতি এই শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত। তুলাদণ্ড [চিত্র নং 8 (i)] প্রথম শ্রেণীর



চিত্র নং 7



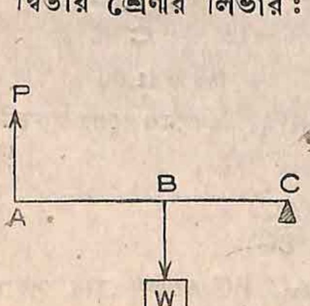
চিত্র নং 8 (i)



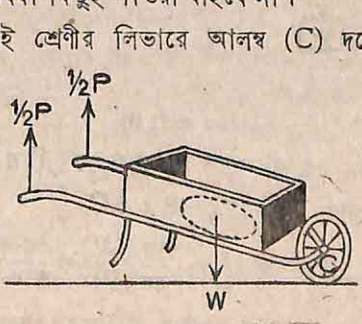
চিত্র নং 8 (ii)

লিভার হইলেও উহার ভার বাহু ও বল বাহুর দৈর্ঘ্য সমান ( OA = OB )। সুতরাং ইহাতে যান্ত্রিক সুবিধা বা অসুবিধা কিছুই পাওয়া যাইবে না।

**দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার :** এই শ্রেণীর লিভারে আলম্ব (C) দণ্ডের



চিত্র নং 9 (i)



চিত্র নং 9 (ii)

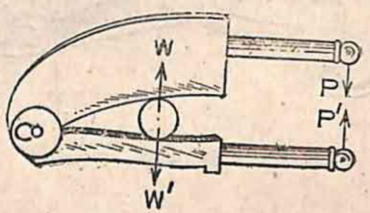
একপ্রান্তে থাকে এবং ভার (W) আলম্ব ও বল (P)-এর অন্তর্বর্তী কোন বিন্দুতে থাকে [ চিত্র 9 (i) ]। এখানেও দণ্ডটি অনুভূমিক থাকিলে

$$P \times AC = W \times BC$$

$$\text{যান্ত্রিক স্থবিধা} = \frac{\text{ভার (W)}}{\text{বল (P)}} = \frac{\text{বল-বাহু (AC)}}{\text{ভার-বাহু (BC)}}$$

যেহেতু AC বাহু BC বাহু অপেক্ষা সর্বদা বড় এই লিভারেও কম চেষ্টায় বা অল্প বলপ্রয়োগ করিয়া বেশী বাধা অতিক্রম করা যায়। ময়লা ফেলিবার এক-

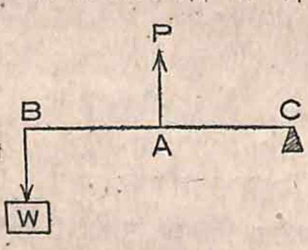


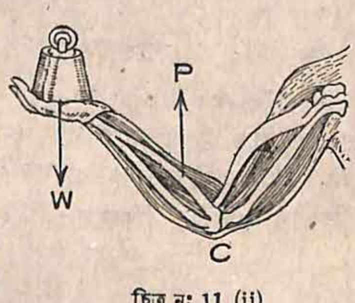

চিত্র নং 10

চাকার গাড়ি [ চিত্র নং 9 (ii) ], নৌকার দাঁড়, যাঁতি ( চিত্র নং 10 ) প্রভৃতি এই শ্রেণীর লিভারের উদাহরণ।

**তৃতীয় শ্রেণীর লিভার :** এই শ্রেণীর লিভারে আলম্ব (C) একপ্রান্তে থাকে এবং অন্যপ্রান্তে ভার W চাপান থাকে। আলম্ব ও ভারের অন্তর্বর্তী




চিত্র নং 11 (i)




চিত্র নং 11 (ii)

কোন এক স্থানে বল P প্রযুক্ত হয় [ চিত্র 11 (i) ]। এখানেও দণ্ডের অনুভূমিক অবস্থায়, $W \times BC = P \times AC$

$$\text{যান্ত্রিক স্থবিধা} = \frac{\text{ভার (W)}}{\text{বল (P)}} = \frac{\text{বল-বাহু (AC)}}{\text{ভার-বাহু (BC)}}$$

যেহেতু এই শ্রেণীর লিভারে সর্বদাই AC, BC অপেক্ষা ছোট, সেইহেতু

এই লিভারে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না। মানুষের বাহু [ চিত্র নং 11 (ii) ], চিম্‌টা, রুটি-কাটা ছুরি প্রভৃতি এই শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত।

## প্রশ্নাবলী

1. যন্ত্র কাহাকে বলে? যান্ত্রিক সুবিধা বলিতে কি বোঝ?

2. আনত তলে কিভাবে যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়, আনত তল ব্যবহারের নীতি হইতে তাহা বুঝাইয়া দাও।

3. লিভার কয় শ্রেণীর? প্রত্যেক শ্রেণীর লিভারের বৈশিষ্ট্য বুঝাইয়া দাও এবং প্রত্যেক শ্রেণীর দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও। সব শ্রেণীর লিভারেই কি যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়?

4. চক্র ও অক্ষদণ্ডের ব্যবহারে কিভাবে ভার তোলা হয়? উহাতে যান্ত্রিক সুবিধা আছে কি?

5. কার্য বলিতে কি বোঝ? বল দ্বারা কার্য ও বলের বিরুদ্ধে কার্য বলিতে কি বোঝ? প্রত্যেক ক্ষেত্রে দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

কার্য কিভাবে মাপা হয়? কার্যের সি. জি. এস্. ও এফ. পি. এস্. পদ্ধতির একক কি কি?

6. আর্গ ও ফুট-পাউণ্ডাল এককের সংজ্ঞা লিখ। জুল কাহার একক? আর্গ ও জুলের মধ্যে সম্পর্ক কি?

7. ক্ষমতা কাহাকে বলে? সি. জি. এস্. ও এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে ক্ষমতার ব্যবহারিক একক কি কি? উহাদের মধ্যে সম্পর্ক কি?

একটি মোটর পাম্প প্রতি মিনিটে 330 পাউণ্ড জল 50 ফুট উপরে তুলিতে পারে। পাম্পের ক্ষমতা কত হর্স-পাওয়ার?

8. শক্তি বলিতে কি বোঝ? স্থিতিশক্তি ও গতিশক্তির পার্থক্য উদাহরণ দিয়া বুঝাইয়া দাও।

9. যে উক্তিগুলি সত্য তাহাদের পার্শ্বে 'R' এবং যেগুলি ভুল তাহাদের পার্শ্বে 'W' বসাও:—

(i) চক্র ও অক্ষদণ্ডের নীতি হইতেছে কম কার্য করিয়া বেশী কার্য পাওয়া। —

(ii) সকল প্রকারের লিভারেই যান্ত্রিক সুবিধা আছে। —

(iii) মানুষের হাত তৃতীয় শ্রেণীর লিভার বিশেষ। —

10. নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলিতে কোন্ কোন্ শ্রেণীর লিভার কার্যকরী:—

(i) নৌকার দাঁড়, (ii) মানুষের বাহু, (iii) যাঁতি ও (iv) কাঁচি? [ S. F. '67 ]

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ

# তাপ-বিজ্ঞান
## ( Heat )

**6-1. তাপ কি ? তাপের স্বরূপ** ( Nature of Heat )

জলন্ত উনান বা চুল্লীর কাছে দাঁড়াইলে তোমাদের নিশ্চয় মনে হয় চুল্লী হইতে তাপ আসিতেছে যাহার ফলে তোমাদের গরম লাগে। উনানের কাছে বা উহার উপর কোন জিনিস রাখিলে জলন্ত কয়লা হইতে তাপ আসিয়া উহাদের গরম করিয়া দেয়। দুপুরের রৌদ্রে এক বালতি জল রাখিলে জল গরম হয়। সূর্য হইতে তাপ আসিয়া জলকে গরম করে। **তাপ হইল এমন কিছু যাহা পাইয়া কোন বস্তু গরম হয় এবং যাহা হারাইয়া কোন বস্তু শীতল হয়।**

একটি খুব গরম লোহার বল এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ফেলিলে জল গরম হইয়া থাকে এবং বলটি আগের তুলনায় ঠাণ্ডা হইয়া জলের সমান গরম হয়। এখানে গরম বলটি হইতে যাহা পাইয়া জল গরম হইল এবং গরম বলটি যাহা হারাইয়া আগের তুলনায় ঠাণ্ডা হইল তাহাই **তাপ**।

পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল 'ক্যালরিক' নামক একটি জিনিস প্রত্যেক বস্তুতেই থাকে। ইহা গরম বস্তুতে বেশী পরিমাণে থাকে ও শীতল বস্তুতে কম থাকে। এই ক্যালরিক এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে এবং অন্য বস্তুর মধ্য দিয়া অপর কোনও বস্তুতে যাইতে পারে। ইহার কোন ভর নাই ফলে ওজনও নাই। এই 'ক্যালরিক'ই তাপ। ইহা গ্রহণে বস্তু গরম হয় ও বর্জনে বস্তু শীতল হয় বলিয়া মনে করা হইত।

কিন্তু **তাপ আসলে এক প্রকার শক্তি**। নানাবিধ শক্তির রূপান্তরে তাপ পাওয়া যাইতে পারে। হাত দিয়া হাত ঘষিলে তাপ উৎপন্ন হয়। তামার তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠাইলে তার গরম হয় ও তাপ উৎপন্ন হয়। এই দুই ক্ষেত্রে যথাক্রমে যান্ত্রিক শক্তি ও বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে তাপ তৈরী হয়। এমন আরও বহু উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যেখানে দেখা যায় অন্য কোন শক্তি হইতে তাপ সৃষ্টি হয়। আবার কখনও কখনও তাপ হইতে অন্য শক্তি পাওয়া যাইতে পারে। এই কারণে তাপ এক প্রকারের **শক্তি**।

**6-2. তাপ ও তাপমাত্রা ঃ** মানুষের নানাবিধ বিষয় উপলব্ধি করিবার জন্য নানাবিধ ইন্দ্রিয় আছে। মানুষ কান দিয়া শব্দ শোনে। চক্ষু দিয়া

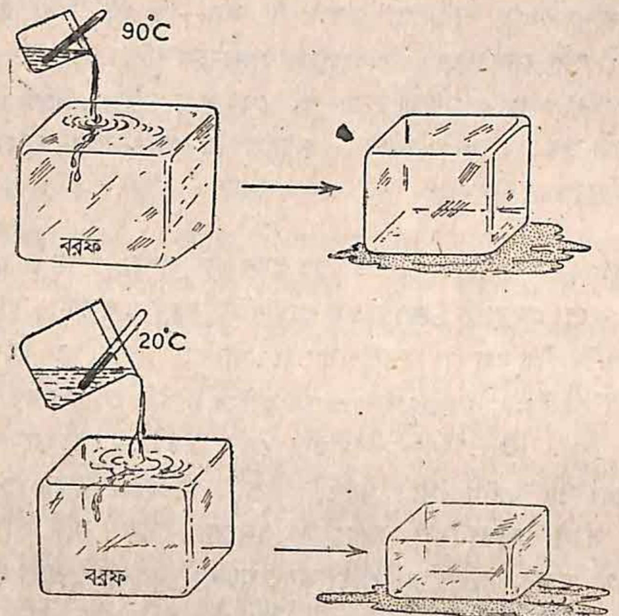
আলোক-শক্তির সাহায্যে কোনও বস্তু দেখে। তেমনি মানুষ তাহার স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির সাহায্যে বুঝিতে পারে কোন্ বস্তু গরম, কোন্ বস্তু ঠাণ্ডা। **তাপমাত্রা হইল কোন বস্তুর তাপীয় অবস্থার পরিমাপ।** বস্তু যত বেশী গরম হয় উহার তাপমাত্রা তত বেশী আর বস্তু যত ঠাণ্ডা হয় উহার তাপমাত্রা তত কম হইবে। সাধারণভাবে অনেকে বলিয়া থাকে, যে বস্তু গরম তাহাতে তাপ আছে এবং যাহা ঠাণ্ডা তাহাতে তাপ নাই। কিন্তু ইহা বলা ভুল। সব বস্তুতেই তাপ আছে। আবার বস্তু গরম হইলেই তাহাতে তাপ বেশী থাকিবে বলা যায় না।

আসলে বস্তুর তাপমাত্রা বলিতে বস্তুর এমন এক তাপীয় অবস্থা বোঝায় যাহা নির্ধারণ করে যে বস্তুটি ( অপর এক বস্তুর সহিত সরাসরি সংযোগে থাকিলে বা তাপের পরিবাহীর মধ্য দিয়া তাপীয় সংযোগে থাকিলে ) অন্য বস্তু হইতে তাপ গ্রহণ করিবে কিংবা উহাতে তাপ প্রদান করিবে। যদি কোন বস্তুর তাপমাত্রা বেশী হয় তাহা হইলে কম তাপমাত্রার কোন বস্তুর সহিত সংযোগে তাপ প্রথম বস্তু হইতে দ্বিতীয় বস্তুতে যাইবে। **তাপ পাইলে বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে, তাপ হারাইলে বস্তুর তাপমাত্রা কমে ; যদি না তাপ-প্রয়োগে বস্তুর অবস্থার পরিবর্তন ঘটে।** তাপকে কারণ বলিলে তাপমাত্রাকে উহার ফল বলা যায়। তাপ হইল শক্তি এবং তাপমাত্রা বস্তুতে সেই শক্তি হইতে তৈরী তাপীয় অবস্থা। কোনও তরলের পরিমাণের সহিত উহার তলের ( level ) যে পার্থক্য তাপের সহিত তাপমাত্রারও অনুরূপ পার্থক্য। উচ্চতল হইতে নিম্নতলে তরলের প্রবাহ হয় ; প্রবাহ তরলের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। সেইরূপে তাপ সঞ্চালনও তাপের পরিমাণের উপর নির্ভর করে না। উচ্চতর তাপমাত্রার বস্তু হইতেই নিম্নতর তাপমাত্রার বস্তুতে তাপ সঞ্চালিত হয়।

দুইটি বস্তুর তাপমাত্রা এক হইতে পারে কিন্তু তাহাদের তাপের পরিমাণ সমান না-ও হইতে পারে। এক কাপ ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা ও এক বালতি ফুটন্ত জলের তাপমাত্রা একই, কিন্তু কাপের জল অপেক্ষা বালতির জলে তাপের পরিমাণ অনেক বেশী।

কম তাপমাত্রার জলেও বেশী তাপমাত্রার জল অপেক্ষা বেশী তাপ থাকিতে পারে—ইহা নিম্নলিখিত পরীক্ষার দ্বারা বোঝা যাইতে পারে।

**পরীক্ষা ঃ** একটি বড় আয়তাকার বরফখণ্ডের উপর একটি বিকার হইতে 90°C তাপমাত্রার 100 সি. সি. গরম জল ঢাল [ চিত্র নং 1 ]। খানিকটা বরফ গলিবে। আবার সমান আকারের বরফখণ্ডের উপর একটি বড় বিকার হইতে




চিত্র নং 1

ঘরের (20°C) তাপমাত্রায় 600 সি. সি. জল ঢাল। দেখিবে, এক্ষেত্রে আগের তুলনায় বেশী বরফ গলিবে। যদিও 90°C তাপমাত্রার জল অনেক বেশী গরম তথাপি উহার ভর কম বলিয়া 20°C তাপমাত্রার জল অপেক্ষা উহাতে তাপ কম থাকে।

## 6-3. তাপের পরিমাণ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ?

এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, কোন বস্তুতে তাপের পরিমাণ কোন্ কোন্ বিষয়ের উপর নির্ভর করে ? কোন বস্তুর তাপের পরিমাণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে ঃ

(i) **বস্তুর ভর,**

(ii) **বস্তুর তাপমাত্রা,**

(iii) **বস্তুর উপাদানের প্রকৃতি** এবং

(iv) **বস্তুর অবস্থা** ( কঠিন, তরল না গ্যাসীয় )।

**পরীক্ষা** (i) ঃ সমান প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট দুইটি লোহার নিরেট চোঙ A ও B লও। B চোঙের ভর A-র ভর অপেক্ষা বেশী। চোঙ দুইটিকে আংশিক জলপূর্ণ বীকারের মধ্যে সূতার সাহায্যে ঝুলাইয়া ফুটন্ত জলের তাপমাত্রায় গরম কর। তারপর খুব তাড়াতাড়ি চোঙ দুইটিকে একটি মোমের প্লেটের উপর রাখ। দেখিবে যে, B-চোঙটি A-চোঙটি অপেক্ষা অধিক মোম গলাইয়া উহার ভিতরে প্রবেশ করিবে। বেশী মোম গলাইতে বেশী তাপের প্রয়োজন। এখানে অসম ভরের চোঙ দুইটি একই পদার্থে তৈরী এবং মোমের ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে একই তাপমাত্রায় ছিল। সুতরাং, মোমের ভিতর ইহারা বিভিন্ন পরিমাণে প্রবেশ করাতে প্রমাণিত হয় যে, **বস্তুর ভরের উপর উহার তাপের পরিমাণ নির্ভর করে।**

**পরীক্ষা** (ii) ঃ সমান ভরের দুইটি লোহার নিরেট চোঙ লও। একটিকে ফুটন্ত জলের তাপমাত্রায় এবং অপরটিকে এক চুল্লীর মধ্যে রাখিয়া ফুটন্ত জল অপেক্ষা উচ্চতর তাপমাত্রায় গরম কর। এখন চোঙ দুইটিকে একই সঙ্গে তাড়াতাড়ি মোমের প্লেটের উপর রাখ। দেখিবে যে, চোঙ দুইটি মোমের ভিতর বিভিন্ন পরিমাণ প্রবেশ করিবে। চুল্লীর তাপমাত্রায় উষ্ণ চোঙটি মোমের ভিতর বেশী যাইবে। ইহা প্রমাণ করে যে, **বস্তুর তাপ উহার তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে।**

**পরীক্ষা** (iii) ঃ আবার সমান ভরের একটি লোহার ও একটি সীসার চোঙকে পূর্বের ন্যায় ফুটন্ত জলের তাপমাত্রায় গরম কর এবং তাড়াতাড়ি মোমের প্লেটের উপর রাখ। দেখিবে যে, উহারা মোমের ভিতর বিভিন্ন পরিমাণ প্রবেশ করিবে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে, **বস্তুর তাপের পরিমাণ উহার উপাদানের উপর নির্ভর করে।**

পদার্থের অবস্থা বিভিন্ন হইলে একই তাপমাত্রায় সমান ভরের পদার্থের তাপ বিভিন্ন হয়। যেমন যে তাপমাত্রায় বরফ গলে সেই তাপমাত্রায় এক গ্রাম বরফের মধ্যে যত পরিমাণ তাপ থাকে এক গ্রাম জলের মধ্যে তাহা অপেক্ষা বেশী তাপ থাকে। আবার জল যে তাপমাত্রায় ফোটে সেই তাপমাত্রায় 1 গ্রাম জলে যত তাপ থাকিবে 1 গ্রাম স্টীমে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী তাপ থাকে।

**আপেক্ষিক তাপ ও তাপগ্রাহিতা**

উপরের পরীক্ষা (iii)-এ দেখিয়াছ যে, সমান ভরের সীসার ও লোহার চোঙ দুইটি সমান তাপমাত্রা হ্রাসের ( জলের স্ফুটনের তাপমাত্রা হইতে মোমের

গলনের তাপমাত্রায় পৌঁছাইলে ) দরুন বিভিন্ন পরিমাণ তাপ বর্জন করে, কারণ উহাদের বর্জিত তাপ দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণ মোম গলে।

আবার দুইটি পাত্র লইয়া উহার একটিতে জল এবং অপরটিতে উহার সমপরিমাণ তেল লও। পরে একই চুল্লীতে রাখিয়া সমান ভরের দুইটি লোহার বলকে একসঙ্গে গরম করিয়া একটিকে জলের পাত্রের মধ্যে এবং অপরটিকে তেলের পাত্রের মধ্যে ফেল। কিছুক্ষণ পরে থার্মোমিটারের সাহায্যে জল এবং তেলের তাপমাত্রা লক্ষ্য কর। দেখিবে যে, জলের তাপমাত্রা যত বাড়িল তেলের তাপমাত্রা তাহার প্রায় দ্বিগুণ বাড়িল। এখানে গরম বল দুইটি একই তাপ সরবরাহ করা সত্ত্বেও জল ও তেলের তাপমাত্রা-বৃদ্ধি ভিন্ন হইতেছে।

কাজেই বস্তুর তাপ গ্রহণ বা বর্জন কেবল বস্তুর তাপমাত্রাবৃদ্ধি বা হ্রাস বা উহার ভরের উপর নির্ভর করে না ; উহা বস্তুর উপাদানের এক বিশেষ ধর্মের উপরও নির্ভর করে। পদার্থের এই বিশেষ ধর্ম হইল **আপেক্ষিক তাপ** ( Specific Heat )।

কোন পদার্থের নির্দিষ্ট ভরের নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন তাহা উহার সমভর জলের সমান তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপের যতগুণ হইবে সেই সংখ্যাকে পদার্থের **আপেক্ষিক তাপ** বলে।

**তাপের একক** ( Units of Heat ) : 1 গ্রাম বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধি করিতে যত তাপ প্রয়োজন হয় তাহাকে **1 ক্যালরি** (calorie) বলে। ক্যালরি হইল সি. জি. এস্. পদ্ধতিতে তাপের একক।

আবার 1 পাউণ্ড বিশুদ্ধ জলের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী ফারেনহাইট বৃদ্ধি করিতে যত তাপ প্রয়োজন হয় সেই তাপকে **বৃটিশ থার্মাল একক** ( সংক্ষেপে B. Th. U. ) বলে। উহা এফ্. পি. এস্. পদ্ধতিতে তাপের একক।

আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞানুযায়ী কোন পদার্থের আপেক্ষিক তাপ 0·2 বলিতে বোঝায় যে 1 গ্রাম ভর ঐ পদার্থের তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বৃদ্ধির জন্য 0·2 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হইবে ; যেহেতু 1 গ্রাম জলের 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য 1 ক্যালরি তাপ প্রয়োজন হয়।

কোন বস্তুর ভর $m$ গ্রাম ও উহার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ $s$ হইলে ঐ বস্তুর তাপমাত্রা 1 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে $m \times s = ms$ ক্যালরি তাপের প্রয়োজন হয়।

$m$ পাউণ্ড ভরের কোন বস্তুর তাপমাত্রা 1°F বৃদ্ধি করিতে প্রয়োজনীয় তাপ হইবে $ms$ বৃটিশ থার্মাল একক।

কোন বস্তুর 1° তাপমাত্রাবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপকে বস্তুর **তাপগ্রাহিতা** ( Thermal Capacity ) বলে। সুতরাং

বস্তুর **তাপগ্রাহিতা = বস্তুর ভর × উহার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ।**

যদি কোনও বস্তুর তাপমাত্রা $t_1$ হয় এবং অন্য কোনও উষ্ণতর বস্তুর সংস্পর্শে আসিবার পর উহার তাপমাত্রা $t_2$ হয়, তাহা হইলে ( $t_2 - t_1$ ) তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য বস্তুর গৃহীত তাপ হইবে বস্তুর তাপগ্রাহিতা × $(t_2 - t_1)$। অর্থাৎ বস্তুর ভর $m$, উহার উপাদানের আপেক্ষিক তাপ $s$ এবং তাপমাত্রাবৃদ্ধি $(t_2 - t_1)$ হইলে,

বস্তুর গৃহীত তাপ $= ms\ (t_2 - t_1)$।

যে বস্তু তাপ হারাইবে উহার বর্জিত তাপের পরিমাণও হইবে এই বস্তুর তাপগ্রাহিতা × তাপমাত্রাহ্রাস।

উষ্ণতর এক বস্তু হইতে তাপ লইয়া অন্য কোন শীতলতর বস্তু গরম হইলে এবং তাপ অন্য কোনও ভাবে নষ্ট না হইলে,

**উষ্ণতর বস্তু কর্তৃক বর্জিত তাপ = শীতলতর বস্তু কর্তৃক গৃহীত তাপ।**

যতক্ষণ পর্যন্ত না দুই বস্তুর তাপমাত্রা সমান হয় এই তাপগ্রহণ ও বর্জন ততক্ষণ চলিতে থাকিবে।

**উদাহরণ ঃ** 500 গ্রাম জলকে 20°C হইতে 60°C তাপমাত্রায় গরম করিতে কত তাপ লাগিবে?

**উঃ।** প্রয়োজনীয় তাপ = জলের ভর × জলের আপেক্ষিক তাপ × তাপমাত্রা বৃদ্ধি = $500 \times 1 \times (60 - 20) = 500 \times 40 = 20{,}000$ ক্যালরি।

**উদাহরণ ঃ** একটি 200 গ্রাম ভরের অ্যালুমিনিয়ামের কেটলিতে 500 গ্রাম জলের 50°C তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য কত তাপ লাগিবে? [ অ্যালুমিনিয়ামের আপেক্ষিক তাপ = 0·2 ]।

**উঃ।** কেটলির তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ $= 200 \times 0{\cdot}2 \times 50 = 2000$ ক্যালরি। আবার, 500 গ্রাম জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ $= 500 \times 1 \times 50 = 25{,}000$ ক্যালরি। অতএব, মোট তাপের প্রয়োজন $2{,}000 + 25{,}000 = 27{,}000$ ক্যালরি।

6-4. **তাপ এক প্রকার শক্তি ঃ** কাউণ্ট রামফোর্ড লক্ষ্য করিয়াছিলেন কামানের নল ছিদ্র করিবার সময় কামান ও ছিদ্র করিবার যন্ত্র তুরপুণ উভয়ই প্রচুর গরম হইয়া পড়ে। এই উৎপন্ন তাপের সহিত তুরপুণের মাধ্যমে দেওয়া

## সপ্তম অধ্যায়ঃ আলোক
## ( Light )

**7-1 আলোক কি** (What is Light) ? আলোক বলিতে আমরা এমন এক বাহ্যিক প্রেরণা বুঝিয়া থাকি যাহা আমাদের চোখে কোন বস্তুকে দেখার অনুভূতি জাগায়। আমাদের চোখের পিছনে অক্ষিপট (retina) নামে এক পর্দা আছে। এই অক্ষিপটে প্রচুর স্নায়ুতন্ত্র আসিয়া শেষ হইয়াছে। অক্ষিপটে যখন আলোক আসিয়া পড়ে তখন এই স্নায়ুতন্ত্রগুলির মাধ্যমে উহা আমাদের মস্তিষ্কে দর্শন অনুভূতি জাগাইয়া দেয় এবং আমরা বস্তুসকল দেখিতে পাই। কোন বস্তু হইতে আলোক চোখে আসিলেই আমরা বস্তুকে দেখিতে পাই। আলোক নিজে কিন্তু অদৃশ্য।

তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদি শক্তিকে আলোকে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে।

বৈদ্যুতিক বাতিতে তড়িৎ-প্রবাহ পাঠাইলে বৈদ্যুতিক শক্তির অংশতঃ রূপান্তরে আলোক-শক্তির উদ্ভব হয়। আবার, ফটোগ্রাফির কাগজে আলোক রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটাইতে পারে। সুতরাং আলোক এক প্রকার শক্তি।

**7-2. আলোক প্রভব** ( Source of Light ) ঃ সূর্য, বাতি, মোমবাতি প্রভৃতি যাহা হইতে আলোকশক্তি নির্গত হয় তাহাদের **আলোক প্রভব** বলা হয়। সূর্য, মোমবাতি ইত্যাদি হইতে সরাসরি আলোক আসিয়া আমাদের চোখের অক্ষিপটে পড়িলে আমরা দেখিতে পাই বলিয়া ইহাদের **স্বপ্রভ** (self-luminous) বস্তু বা **প্রভব** বলে। বেশীর ভাগ বস্তুই কিন্তু অপ্রভ (non-luminous)। স্বপ্রভ বস্তু হইতে আলোক পাইয়া এই সকল বস্তু দৃশ্য হয়। চাঁদ নিজে অপ্রভ। সূর্যের আলোকে চাঁদ আলোকিত হয়।

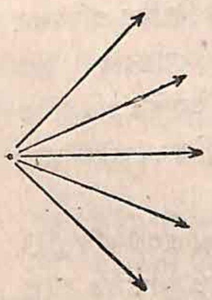
**বিন্দু প্রভব ও বিস্তৃত প্রভব** ( Point Source and Extended Source ) ঃ জ্যামিতিক বিন্দুর মত ক্ষুদ্র প্রভবকে বিন্দু প্রভব বলে। কিন্তু যাহার কিছু আকার আছে তাহাকে বিস্তৃত প্রভব বলে। নির্দিষ্ট আকারবিশিষ্ট **বিস্তৃত প্রভবকে** অসংখ্য বিন্দু প্রভবের সমষ্টি বলিয়া ধরা হয়।

যে মাধ্যমের ভিতর দিয়া আলোক চলাচল করিতে পারে তাহাকে **আলোক মাধ্যম** বলে।

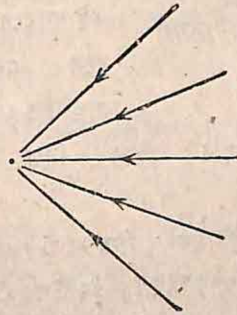
যদি মাধ্যমের যে কোন বিন্দুতে উহার ধর্ম একই রকম থাকে অর্থাৎ যে-কোন বিন্দু দিয়া আলোক একই বেগে যাইতে পারে তবে সেই মাধ্যমকে সমসত্ব ( homogeneous ) মাধ্যম বলে। কাচ, জল, বায়ু ইত্যাদি সমসত্ব মাধ্যমের উদাহরণ।

**স্বচ্ছ** (Transparent) মাধ্যম দিয়া আলোক সহজে চলাচল করিতে পারে এবং বস্তুকে স্পষ্ট দেখা যায়। কাচ স্বচ্ছ মাধ্যম। **অস্বচ্ছ** ( opaque ) মাধ্যম দিয়া আলোক যাইতে পারে না। **ঈষৎ-স্বচ্ছ** ( translucent ) মাধ্যমের মধ্য দিয়া আলোক আংশিকভাবে যাইতে পারে এবং বস্তুকে অস্পষ্ট দেখায়। ঘষা কাচ, তৈলাক্ত কাগজ ঈষৎ স্বচ্ছ মাধ্যম।

**আলোক রশ্মি ঃ** আলোক যে পথ ধরিয়া চলে তাহাকে আলোকরশ্মি বলে। সমসত্ব মাধ্যমে আলোক সরলরেখায় চলে বলিয়া আলোকের পথ এই জাতীয় মাধ্যমে সরলেখা দ্বারা বোঝান হয়।



চিত্র নং 1

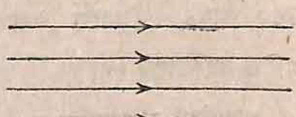


চিত্র নং 2

কতকগুলি আলোক-রশ্মি মিলিয়া একটি রশ্মি-গুচ্ছ হয়। যদি কোন রশ্মিগুচ্ছ এক বিন্দুপ্রভব হইতে বাহির হইয়া শঙ্কুর আকারে ছড়াইয়া পড়ে তবে তাহাকে **অপসারী** (divergent ) রশ্মিগুচ্ছ ( চিত্র নং 1 ) বলে।

যদি কোন রশ্মিগুচ্ছ কোন প্রভব হইতে আসিয়া কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তবে তাহাকে **অভিসারী** ( convergent ) রশ্মিগুচ্ছ ( চিত্র নং 2 ) বলে।

যদি কোন রশ্মিগুচ্ছের রশ্মিগুলি পরস্পর সমান্তরাল থাকে তবে তাহাকে **সমান্তরাল** (parallel) রশ্মিগুচ্ছ ( চিত্র নং 3 ) বলে।



চিত্র নং 3

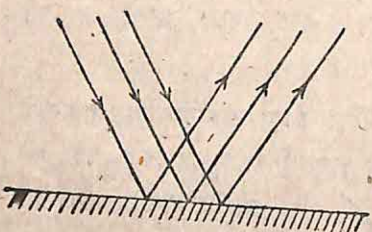
বহু দূরের কোন প্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ সমান্তরাল হয়।

## 7-3. আলোকের প্রতিফলন ( Reflection of Light ) :

আলোক সমসত্ব মাধ্যমে সরলরেখাক্রমে চলে। এইরূপ চলিতে চলিতে উহা যদি অন্য কোন মাধ্যমে আপতিত হয় তখন উহার কিছু অংশ আবার সরলরেখাক্রমে প্রথম মাধ্যমেই ফিরিয়া আসে। এই ঘটনাকে আলোকের **প্রতিফলন** বলে।

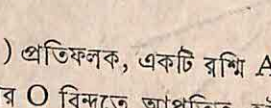
প্রতিফলন দুই রকমের : (a) নিয়মিত ( regular ) এবং (b) বিক্ষিপ্ত ( diffuse ) প্রতিফলন।

যে-তল হইতে আলোক প্রতিফলিত হয় উহাকে প্রতিফলক ( reflector ) বলে। প্রতিফলক তথা দুই মাধ্যমের বিভেদতল যদি মসৃণ হয়, তবে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটিয়া থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিফলিত রশ্মিগুচ্ছের সহিত আপতিত রশ্মিগুচ্ছের মিল থাকে। অর্থাৎ ঘটনাটি নির্দিষ্ট নিয়মের অধীন এবং এই কারণে ইহাকে নিয়মিত প্রতিফলন বলে। একগুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি আপতিত হইলে প্রতিফলিত রশ্মিগুলিও পরস্পর সমান্তরাল ( চিত্র নং 4 ) হইবে। নিম্নে এই প্রতিফলন বিশদভাবে আলোচনা করা হইল :



চিত্র নং 4

মনে কর, $M_1M_2$ একটি মসৃণ ( চিত্র নং 5 ) প্রতিফলক, একটি রশ্মি AO প্রথম মাধ্যম দিয়া গমন করিয়া $M_1M_2$-এর উপর O বিন্দুতে আপতিত হইয়া OB অভিমুখে প্রথম মাধ্যমে প্রতিফলিত হইয়াছে। এখানে AO **আপতিত রশ্মি,** OB **প্রতিফলিত রশ্মি** এবং O **আপতন বিন্দু**। O বিন্দুতে ON রেখা $M_1M_2$-এর উপর লম্ব। উহাকে **আপতনবিন্দুতে** অঙ্কিত **অভিলম্ব** বলা হয়।




চিত্র নং 5

আপতিত রশ্মি অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **আপতন কোণ** এবং প্রতিফলিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **প্রতিফলন কোণ** বলে। $\angle AON$ আপতন কোণ এবং $\angle BON$ প্রতিফলন কোণ।

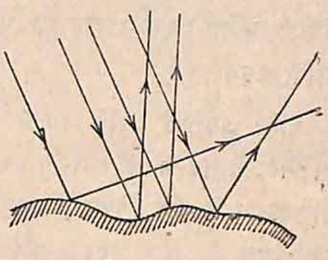
**নিয়মিত প্রতিফলনের সূত্র** (Laws of Reflection) ঃ প্রতিফলন দুইটি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী হইয়া থাকে।

(i) **আপতিত রশ্মি, প্রতিফলিত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে প্রতিফলক তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব একই তলে থাকে।**

(ii) **আপতন কোণ ও প্রতিফলন কোণ সর্বদা সমান হয়।**

5নং চিত্রে $\angle AON = \angle BON$ এবং $AO$, $OB$ ও $ON$ সকলেই একই তলে আছে। এই তলকে **আপতন তল** বলা হয়।

**বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন**—যদি দুই মাধ্যমের বিভেদতল তথা প্রতিফলক মসৃণ না হয় তবে বিভিন্ন বিন্দুতে অভিলম্ব পরস্পর সমান্তরাল হইবে না। ফলে যদিও প্রতিটি রশ্মির পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে নিয়মিত প্রতিফলন ঘটিবে কিন্তু প্রতিফলক তলের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রশ্মির আপতনের জন্য আপতন কোণ বিভিন্ন হইবে। এই কারণে রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলনের পর প্রতিফলক তলের আকৃতি অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে বিক্ষিপ্ত হইবে [চিত্র নং 6]। এই জাতীয় প্রতিফলনকে **বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন** বলে। দেওয়াল, কাগজ, সিনেমার পর্দা ইত্যাদি অমসৃণ তলে আলোকের বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন হয়।



চিত্র নং 6

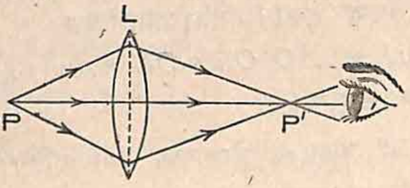
**প্রতিবিম্ব কাহাকে বলে ?**

কোন বস্তু হইতে আলোকরশ্মি সরাসরি আমাদের চোখে আসিয়া পড়িলে আমরা বস্তুটিকে তাহার নিজ অবস্থানেই দেখিতে পাই। কিন্তু বস্তু হইতে একগুচ্ছ রশ্মি আমাদের চোখে আসিয়া পড়ার আগে যদি তাহার প্রতিফলন বা প্রতিসরণ হয়, তাহা হইলে প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত রশ্মিগুচ্ছ যে বিন্দু হইতে আমাদের চোখে আসে বা আসে বলিয়া মনে হয় সেখানেই বস্তুটি আছে বলিয়া আমাদের মনে হইবে। এইজন্য প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত রশ্মিগুলির ছেদবিন্দু বা ঐ রশ্মিগুলিকে পিছনে বর্ধিত করিলে যে বিন্দুতে ছেদ করিতে পারে সেখানেই বস্তুটি আছে বলিয়া মনে হইবে এবং বস্তুটিকে তাহার নতুন অবস্থানে যেমন দেখিতে পাই তাহাই বস্তুর **প্রতিবিম্ব** (image)।

**যখন কোন বিন্দুপ্রভব হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত হইয়া অন্য কোন বিন্দুতে মিলিত হয় বা অন্য কোন বিন্দু**

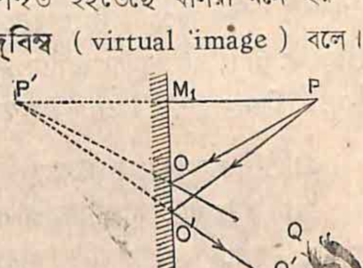
**হইতে অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, তখন ঐ দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিবিম্ব বলা হয়।**

যখন কোন বিন্দু হইতে আগত রশ্মিগুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর অন্য বিন্দুতে মিলিত হয় তখন দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর **সদ্‌বিম্ব** ( real image ) বলা হয়। 7নং চিত্রের P′ বিন্দু P বিন্দুর সদ্‌বিম্ব। এখানে P হইতে আগত রশ্মিগুলি লেন্‌স নামীয় প্রতিসারক বস্তুদ্বারা প্রতিসৃত হইয়া P′ বিন্দুতে মিলিত হয় এবং মনে হয় যেন রশ্মিগুলি P হইতে না আসিয়া P′ হইতে আসিতেছে।



চিত্র নং 7

যদি একগুচ্ছ রশ্মি কোন বিন্দুপ্রভব হইতে আসিয়া প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর অপর কোন বিন্দুতে মিলিত না হয়, কিন্তু প্রতিফলিত বা প্রতিসৃত রশ্মিগুলি পিছন দিকে বাড়াইলে অপর এক বিন্দুতে মিলিত হয় এবং ফলে ঐ বিন্দু হইতে রশ্মিগুলি অপসৃত হইতেছে বলিয়া মনে হয়—তখন দ্বিতীয় বিন্দুটিকে প্রথম বিন্দুর **অসদ্‌বিম্ব** ( virtual image ) বলে। অসদ্‌বিম্ব রশ্মিগুলির সত্যিকারের মিলনে সৃষ্টি হয় না বলিয়া উহাকে পর্দায় ফেলা যায় না। দর্পণে আমরা যে প্রতিবিম্ব দেখি তাহা অসদ্‌বিম্ব। 8নং চিত্রের P′ বিন্দু P বিন্দু হইতে আগত রশ্মিগুলির দর্পণদ্বারা প্রতিফলনের ফলে সৃষ্ট অসদ্‌বিম্ব। অর্থাৎ P′ হইল P বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব এবং দর্পণের দিকে তাকাইলে মনে হয় P বিন্দু যেন P′ স্থানে অবস্থান করিতেছে। রশ্মিগুলির আসলে দর্পণের পিছনে অস্তিত্বই নাই, তবে প্রতিফলনের ফলে P′ হইতে আসে বলিয়া মনে হয়।



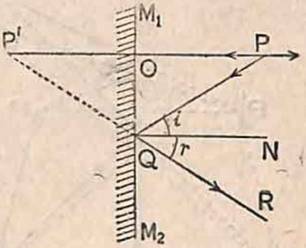
চিত্র নং 8

সদ্‌বিম্ব চোখে দেখা যায় পর্দায়ও ফেলা যায় কিন্তু অসদ্‌বিম্ব শুধুই চোখে দেখা যায় পর্দায় ফেলা যায় না।

**সমতল দর্পণে প্রতিবিম্ব ঃ**

একটি সমতল দর্পণ $M_1M_2$-এর সম্মুখে একটি বিন্দুপ্রভব P আছে

(9নং চিত্র)। P বিন্দুর প্রতিবিম্ব কোথায় হইবে তাহা বাহির করিতে হইলে P বিন্দু হইতে দর্পণের উপর আপতিত এক রশ্মিগুচ্ছ দর্পণের তলে প্রতিফলনের পর কোন্ বিন্দু হইতে আসে বলিয়া মনে হয় তাহা বাহির করিতে হইবে? P হইতে আগত PO ও PQ দুইটি রশ্মি প্রতিফলনের পর যথাক্রমে OP ও QR পথে ফিরিয়া আসে। PO দর্পণের উপর লম্ব বলিয়া OP রেখা O বিন্দুতে অভিলম্ব। তাহা হইলে PO রশ্মির আপতন কোণ শূন্য হইবে, ফলে উহা OP পথেই প্রতিফলিত হইবে। কিন্তু PQ রশ্মির জন্য QN অভিলম্ব এবং আপতন কোণ ∠PQN = প্রতিফলন কোণ ∠RQN।



চিত্র নং 9

প্রতিফলিত রশ্মিদ্বয় OP ও QR-কে পিছন দিকে বর্ধিত করিলে P′ বিন্দুতে মিলিত হয়। ফলে, P হইতে আগত PO ও PQ রশ্মিদুইটির প্রতিফলনের দরুন P′ বিন্দুতে P বিন্দুর অসদ্‌বিম্ব গঠিত হয়।

এখন, QN ও OP পরস্পর সমান্তরাল বলিয়া

$$\angle OPQ = \angle PQN \text{ এবং } \angle RQN = \angle OP'Q$$

$$\therefore \quad \angle OPQ = \angle OP'Q \quad [\because \quad \angle PQN = \angle RQN]$$

তাহা হইলে △OPQ ও △OP′Q ত্রিভুজদ্বয়ে

$\angle OPQ = \angle OP'Q$ ; $\angle P'OQ = \angle POQ$ [ যেহেতু PP′, $M_1M_2$এর উপর লম্ব ] এবং OQ সাধারণ বাহু।

অতএব, ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম হইবে এবং ফলে OP = OP′ হইবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে সমতল দর্পণে প্রতিফলনের ক্ষেত্রে—

(i) দর্পণ হইতে বস্তুর দূরত্ব বা **বস্তুদূরত্ব** = দর্পণ হইতে প্রতিবিম্বের দূরত্ব বা **বিম্বদূরত্ব**।

(ii) প্রতিবিম্ব ও বস্তুবিন্দু যোগ করিলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাহা দর্পণের উপর লম্ব হইবে।

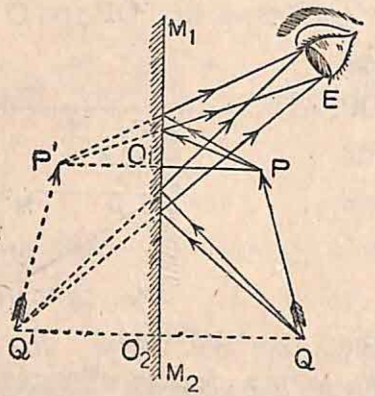
(iii) প্রতিবিম্ব অসদ্ হইবে এবং বিস্তৃত বস্তুর ক্ষেত্রে প্রমাণ করা যায়—

(iv) বস্তুর সাইজ = প্রতিবিম্বের সাইজ হইবে।

**বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্ব** ( Image of an extended object ) :

বিস্তৃত বস্তুর প্রতিবিম্বের গঠন 10নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। $M_1M_2$

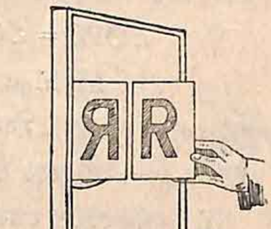
একটি সমতল দর্পণ। উহার সম্মুখে PQ এই বিস্তৃত বস্তুটি রাখা আছে। PQ বিস্তৃত বস্তুটিকে অসংখ্য বিন্দুর সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। $M_1M_2$-এর উপর P বিন্দু হইতে $PO_1$ লম্ব টান। তারপর $PO_1$ রেখাকে বর্ধিত করিয়া উহার উপর P′ বিন্দু এমনভাবে লও যাহাতে $PO_1 = O_1P'$ হয়। P′ বিন্দু P বিন্দুর প্রতিবিম্ব হইবে। অনুরূপে $QO_2Q'$ রেখা $M_1M_2$-এর উপর লম্ব টানিয়া Q′ বিন্দুকে এমন ভাবে ঐ রেখার উপর লও যাহাতে $QO_2 = O_2Q'$ হয়। Q′ বিন্দু Q বিন্দুর প্রতিবিম্ব হইবে। P এবং Q-র মধ্যবর্তী আর যে-কোন বিন্দুর প্রতিবিম্ব এইভাবে গঠিত হয় এবং এই প্রতিবিম্বগুলি সবই P′ ও Q′-এর মধ্যে থাকিবে। এইভাবে আমরা বিস্তৃত বস্তু PQ-এর প্রতিবিম্ব P′Q′ পাই।



চিত্র নং 10

**পার্শ্বীয় পরিবর্তন** ( Lateral Inversion )

তোমরা আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে যে তোমাদের বাম হাত ডান হাত ও ডান হাত বাম হাত বলিয়া মনে হয়। একটি কাগজে 'R' অক্ষর লিখিয়া উহা আয়নার সম্মুখে ধরিলে দেখিতে পাইবে উহার আকৃতি পাশের দিকে উল্টাইয়া [চিত্র নং 11] যাইবে। প্রতি-বিম্বের এইরূপ পরিবর্তনকে পার্শ্বীয় পরিবর্তন বলে। প্রতিসম বস্তুর প্রতিবিম্বে এইরূপ পরিবর্তন দেখা যাইবে না—যেমন 'S' অক্ষরটির প্রতিবিম্ব 'S' ই হইবে।



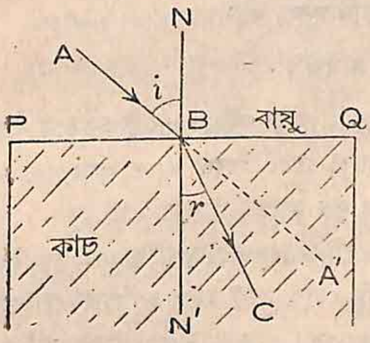
চিত্র নং 11

## 7-4. **আলোকের প্রতিসরণ** ( Refraction of light )

যখন কোন আলোকরশ্মি এক মাধ্যম দিয়া গমন করিয়া দ্বিতীয় এক মাধ্যমে আসিয়া পৌঁছায় তখন আলোকের এক অংশ দ্বিতীয় মাধ্যমটি স্বচ্ছ হইলে উহার ভিতর দিয়া যায় এবং দুই মাধ্যমের বিভেদতলে সাধারণত

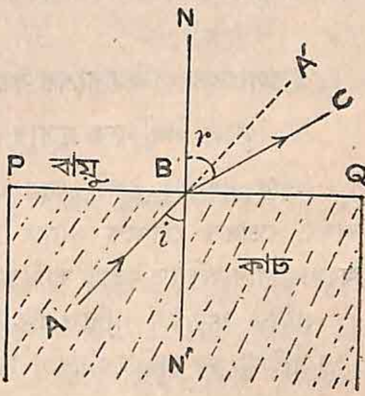
আলোকরশ্মির গতির অভিমুখের পরিবর্তন হয়। এইভাবে **এক মাধ্যম হইতে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করিবার সময় আলোকের গতির অভিমুখের পরিবর্তনকেই আলোকের প্রতিসরণ বলে।**

12 (i)নং ও 12 (ii)নং চিত্রে PQ হইল বায়ু ও কাচ এই দুই মাধ্যমের বিভেদতল। মনে কর, PQ-এর B বিন্দুতে কোনও এক আলোকরশ্মি AB তির্যকভাবে আপতিত হইল; B বিন্দুতে আলোকের প্রতিসরণ ঘটিবে। মনে কর, রশ্মিটি দিক পরিবর্তন করিয়া BC (BA′-এর পরিবর্তে) পথে গমন করিল। NBN′ বিভেদতল PQ-এর উপর B বিন্দুতে




বায়ু হইতে কাচে প্রতিসরণ

চিত্র নং 12 (i)




কাচ হইতে বায়ুতে প্রতিসরণ

চিত্র নং 12 (ii)

অঙ্কিত **অভিলম্ব**। AB **আপতিত রশ্মি** এবং BC **প্রতিসৃত রশ্মি**। আপতিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **আপতন কোণ** বলে এবং প্রতিসৃত রশ্মি আপতন বিন্দুতে অভিলম্বের সহিত যে কোণ উৎপন্ন করে তাহাকে **প্রতিসরণ কোণ** বলে। 12 (i) নং চিত্রে ∠ABN আপতন কোণ এবং ∠CBN′ প্রতিসরণ কোণ।

দেখা গিয়াছে যে,

(a) **লঘু মাধ্যম হইতে ঘন মাধ্যমে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ হইলে প্রতিসৃত রশ্মি বিভেদতলের উপর আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্বের দিকে হেলিয়া পড়ে** (অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা ছোট হয়)। সুতরাং, আলোকরশ্মি লঘু মাধ্যম বায়ু হইতে ঘন মাধ্যম কাচে প্রতিসৃত হইলে; $\angle i$ হইতে $\angle r$ ছোট হইবে

এবং 12(i) নং চিত্র হইতে ইহা বুঝিতে পারিবে। আর **ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ হইলে প্রতিসৃত-রশ্মি আপতন-বিন্দুতে অঙ্কিত অভিলম্ব হইতে দূরে বাঁকিয়া যায়** ( অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ আপতন কোণ অপেক্ষা বড় হয় )। 12(ii)নং চিত্রে আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম ( কাচ ) হইতে লঘু মাধ্যম বায়ুতে প্রতিসৃত হইয়াছে। প্রতিসৃত রশ্মি BC অভিলম্ব হইতে বাঁকিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছে। ফলে $\angle i$ অপেক্ষা $\angle r$ বড় হইবে।

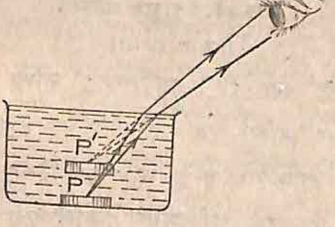
(b) আবার, আপতিত রশ্মি, প্রতিসৃত রশ্মি এবং আপতন বিন্দুতে দুই মাধ্যমের বিভেদ-তলের উপর অঙ্কিত অভিলম্ব এক সমতলে থাকে।

## আলোকের প্রতিসরণের কয়েকটি সহজ ঘটনা ঃ

### A. জলে নিমজ্জিত মুদ্রার প্রতিবিম্ব ঃ

অস্বচ্ছ পদার্থের তৈরী কোন এক পাত্র যেমন বাটিতে একটি চকচকে মুদ্রা রাখ। তোমার চোখকে পাত্রের কিনারা হইতে আস্তে আস্তে সরাইয়া এমন অবস্থায় রাখ যাহাতে মুদ্রাটি অতি অল্পের জন্য অদৃশ্য [ চিত্র নং 13 ] হয়।

বাটিতে এখন জল ঢালিতে থাক। দেখিবে, যে-মুদ্রাটি দৃষ্টির অগোচর ছিল কিছু পরিমাণ জল ঢালিবার পর তাহা তুমি চোখ একই স্থানে রাখিয়াই দেখিতে পাইতেছ। ইহার কারণ, যখন বাটিতে জল ছিল না মুদ্রা হইতে আলোক বাটির গায়ে বাধা পাইতেছিল, তোমার চোখে পৌঁছিতেছিল না। কিন্তু বাটিতে জল থাকিলে আলোকরশ্মি জল হইতে বায়ুতে প্রবেশ করিবার সময় প্রতিসৃত হইয়া অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়।



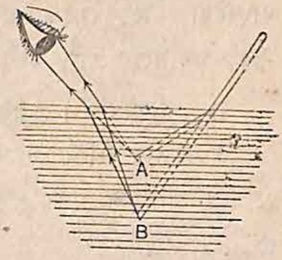

চিত্র নং 13

প্রতিসৃত রশ্মিগুলি তখন চোখে আসিয়া পৌঁছায়। আলোকরশ্মি মুদ্রার প্রকৃত অবস্থান P বিন্দু হইতে না আসিয়া উহার কিছু উপরের কোন বিন্দু P' হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। এই জন্যই যাহা আগে অদৃশ্য ছিল পরে জলের মধ্যে থাকিয়া তাহা দৃশ্য হয়।

### B. জলে নিমজ্জিত দণ্ডের বক্রতা ঃ

একটি সোজা দণ্ডকে আংশিকভাবে জলে ডুবাইয়া রাখিলে মনে হয়

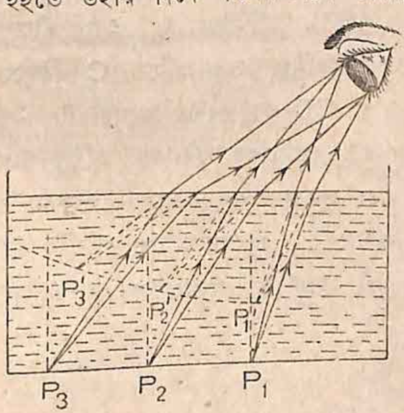
সোজা দণ্ডটি জলের ভিতর প্রবেশস্থলে যেন বাঁকিয়া [ চিত্র নং 14 ] গিয়াছে। দণ্ডটির নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দু হইতে আগত আলোকরশ্মি ঘন আলোক-মাধ্যম জল এবং অপেক্ষাকৃত লঘু মাধ্যম বায়ুর বিভেদ-তলে প্রতিসৃত হয় এবং প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। ফলে নিমজ্জিত অংশের প্রতিটি বিন্দুই উহার গভীরতা অনুযায়ী আনুপাতিকভাবে খানিকটা করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। যেমন, দণ্ডের B-বিন্দুটি A-বিন্দুতে আছে বলিয়া মনে হয়। এই কারণে দণ্ডের নিমজ্জিত অংশ ও বাহিরের অংশকে এক সরলরেখায় দেখা যায় না এবং মনে হয় দণ্ডটি যেন বাঁকিয়া আছে।



চিত্র নং 14

**C. সমান গভীরতার জলাশয় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম গভীর মনে হয়ঃ**

একটি জলপূর্ণ জলাধারের তলদেশ সমতল হইলেও কোন দর্শক একধার হইতে উহার দিকে তির্যকভাবে তাকাইলে দর্শকের কাছে তাঁহার নিকট হইতে দূরের দিকে জলাধারটির গভীরতা ক্রমশ কম বলিয়া মনে হয়। ফলে তলদেশটি আনত ও উপরের দিকে খানিকটা অবতল ( concave ) বলিয়া মনে হয়। 15নং চিত্রে জলাধারের তলদেশের $P_1$, $P_2$, $P_3$ বিন্দু সমূহ হইতে আগত আলোকরশ্মিগুলি ঘন মাধ্যম জল হইতে লঘু মাধ্যম বায়ুতে প্রতিসরণের জন্য অভিলম্ব হইতে দূরের দিকে বাঁকিয়া যায়; ফলে রশ্মিগুলি $P'_1$, $P'_2$, $P'_3$ বিন্দু হইতে আসে বলিয়া মনে হয়। $P_1$, $P_2$ ইত্যাদি বিন্দুগুলি চোখ হইতে যতদূরে থাকিবে, বিন্দুগুলি হইতে আগত রশ্মিগুলি তত বেশী তির্যকভাবে আসিবে এবং ফলে জল হইতে বায়ুতে প্রতিসরণের সময় সেই অনুযায়ী ক্রমশ বেশী বাঁকিয়া



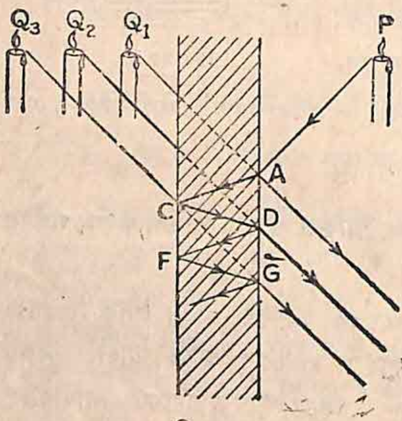
চিত্র নং 15

যাইবে। ইহার জন্যই দূরের দিকের গভীরতা ক্রমশ কম ও তলদেশটি আনত মনে হয়।

এই একই কারণে কেহ কোন জলাশয়ের মধ্যে দাঁড়াইলে সে যেখানে দাঁড়াইয়া আছে সেইস্থানেই গভীরতা সর্বাপেক্ষা বেশী বলিয়া তাঁহার মনে হয় ; যদিও জলাশয়ের প্রকৃত গভীরতা সর্বত্র সমান।

### D. পুরু দর্পণ কর্তৃক বহু প্রতিবিম্বের সৃষ্টি :

একটি পুরু দর্পণের সামনে একটি মোমবাতি রাখিলে এবং একটু তির্যকভাবে তাহার প্রতিবিম্ব লক্ষ্য করিলে একটি প্রতিবিম্বের স্থলে অনেকগুলি প্রতিবিম্ব দেখা যায়। ইহার কারণ P হইতে আগত আলোকরশ্মি দর্পণের উপর পৃষ্ঠে A বিন্দুতে আপতিত হইলে প্রতিফলনের দরুন $Q_1$ প্রতিবিম্ব [চিত্র নং 16] সৃষ্টি হয়। আলোকের সামান্য অংশ উপরপৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত হয়। এই জন্য $Q_1$ প্রতিবিম্ব অস্পষ্ট হয়। আলোকের বেশী অংশই কাচের ভিতর প্রতিসৃত হয় এবং নীচের পারদলিপ্ত তল হইতে C বিন্দুতে প্রতিফলিত হয়। এই প্রতিফলিত রশ্মি CD-এর বেশীর ভাগই D বিন্দু হইতে বায়ুতে প্রতিসৃত হয়। ফলে $Q_2$ প্রতিবিম্ব সৃষ্ট হয়। কিছু অংশ আবার D বিন্দুতে প্রতিফলিত হয় এবং পুনরায় অপর পৃষ্ঠে প্রতিফলন ও পরে প্রতিসরণের জন্য $Q_3$ প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। এইরূপে আরও প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হয়। তবে দুই তিনটি প্রতিবিম্বের পর উজ্জ্বলতা অত্যন্ত কমিয়া আসে। $Q_2$ প্রতিবিম্বই সর্বাপেক্ষা বেশী উজ্জ্বল।



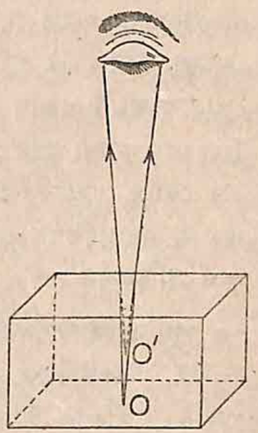
চিত্র নং 16

### E. বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরণ :

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের ঘনত্ব বিভিন্ন রকম। যত উপরে উঠা যায় বায়ুস্তরের ঘনত্ব তত কম হয়, এই কারণে সূর্য, চন্দ্র বা কোনও নক্ষত্র হইতে আগত আলোকরশ্মিকে ক্রমশঃই ঘন হইতে ঘনতর বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া আসিতে হয়। ঘনতর বায়ু আলোকের জন্যও ঘনতর। এইজন্য রশ্মি ক্রমশঃ অভিলম্বের দিকে হেলিয়া পড়ে এবং সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদির অবস্থান কোন

দর্শকের কাছে উহাদের প্রকৃত অবস্থান হইতে কিছুটা উপরে বলিয়া মনে হয়। ফলে সূর্য বা চন্দ্র উঠিবার একটু পূর্বে এবং অস্ত যাইবার একটু পরেও তাহাদিগকে আমরা দেখিতে পাই।

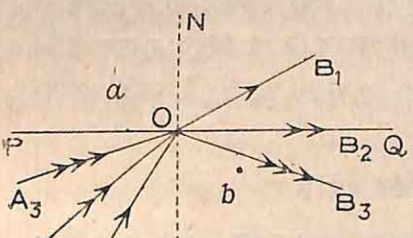
**F.** একটি কাচের ফলকের নীচে একটি কালির দাগ অংকিত কাগজ রাখিলে এবং কাচের ভিতর দিয়া দাগটির দিকে সোজাসুজি তাকাইলে দাগটি উহার প্রকৃত অবস্থান হইতে কিছুটা উপরে [ 17নং চিত্র ] আছে বলিয়া মনে হয়। O বিন্দুতে কালির দাগটি থাকিলে উহা হইতে আগত রশ্মিগুলি কাচ হইতে বায়ুতে আসিয়া অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। এই জন্যই দাগটি উহার প্রকৃত অবস্থান O-এর পরিবর্তে উহার উপরের কোন একবিন্দু O′-এ আছে বলিয়া মনে হয়।



চিত্র নং 17

## 7-5. সঙ্কট কোণ ও আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন :

আলোকরশ্মি ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত হইলে অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যায়। এখন ধরা যাউক '*a*' ও '*b*' চিহ্নিত দুই মাধ্যমের বিভেদতল PQ। '*a*' লঘু ও '*b*' অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যম। কোন রশ্মি $A_1O$ '*b*'-মাধ্যম দিয়া গমন করিয়া O বিন্দুতে PQ বিভেদতলে আপতিত হইল এবং $OB_1$ পথে [ 18নং চিত্র ] প্রতিসৃত হইল। আপতন কোণ বাড়িলে প্রতিসরণ কোণও বাড়ে। অপর একটি রশ্মি $A_2O$ অভিলম্বের সহিত আরও বড় কোণ করিয়া O-বিন্দুতে আপতিত হইল। উহা প্রতিসরণের পর $OB_2$ পথে বিভেদতল ঘেঁষিয়া গমন করিল। অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণের মান এক্ষেত্রে 90° এবং ইহা অপেক্ষা বড় প্রতিসরণ কোণ সম্ভব নহে। এখন কোন আলোকরশ্মি $A_3O$ যদি ঘন মাধ্যম '*b*' দিয়া গমন করিয়া আরও বড় কোণে বিভেদ তল PQ-তে আপতিত হয়, তবে সেই রশ্মির আর প্রতিসরণ সম্ভব হইবে না। আলোকের কোন অংশই এখানে



চিত্র নং 18

রশ্মি ক্রমশঃ ঘন হইতে লঘু বায়ুস্তরে প্রতিসৃত হইয়া অভিলম্ব হইতে দূরে সরিয়া যাইতে থাকে। এইভাবে এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন একটি বিশেষ স্তর হইতে রশ্মিটির পূর্ণ প্রতিফলন ঘটে। এইবার আলোরশ্মি ক্রমশঃ নীচের দিকে অপেক্ষাকৃত ঘন মাধ্যমের দিকে চলিতে শুরু করে এবং অবশেষে দর্শকের চোখে পৌঁছায়। ফলে উপরের [ চিত্র নং 20 ] দিক হইতে উহা যেন আসিতেছে বলিয়া দর্শকের মনে হইবে।

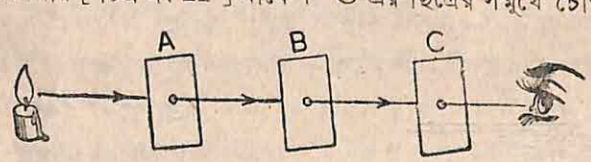
সুতরাং সমগ্র বস্তুটির একটি উল্টা প্রতিবিম্ব ঝুলানো অবস্থায় আছে বলিয়া দর্শকের মনে হয়।

## 7-6. আলোকের গতি ও বেগ ( Propagation and Velocity of light )

একটি ঘরের জানালার একটি ছোট ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলে বায়ুতে ভাসমান ধূলিকণাগুলি উহার দ্বারা আলোকিত হয় এবং তখন স্পষ্টই বোঝা যায় যে আলো সরলরেখায় চলে। এই রকমের নানা ঘটনা হইতে বলা যায় যে আলোক সরলরেখাক্রমে চলে।

একটি সহজ পরীক্ষার দ্বারা আলোকের ঋজুগতির সত্যতা প্রমাণ করা যাইতে পারে।

**পরীক্ষা :** A, B, C তিনটি শক্ত কাগজের বোর্ড। বোর্ড তিনটির প্রত্যেকের মধ্যস্থলে একটি করিয়া অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে। এখন বোর্ড তিনটিকে এমনভাবে সাজাও যাহাতে ছিদ্র তিনটি এবং একটি মোমবাতির শিখার মধ্যভাগ একই সরলরেখায় [ চিত্র নং 21 ] থাকে। C-এর ছিদ্রের সম্মুখে চোখ রাখিলে




চিত্র নং 21

দেখিবে যে ছিদ্র তিনটির মধ্য দিয়া মোমবাতির শিখা দেখা যাইতেছে। কিন্তু যে-কোন একটি বোর্ডকে উপর-নীচে অথবা এপাশ-ওপাশ সরাইলে শিখা আর দেখা যাইবে না। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে আলো সরলরেখায় চলে। কারণ যদি তাহা না হইত শিখা হইতে আলো স্থানচ্যুত বোর্ডের ছিদ্র দিয়া বাঁকিয়া আসিয়া চোখে পৌঁছাইতে পারিত এবং শিখা দেখা যাইত।

আলোর সম্মুখে কোন অস্বচ্ছ বস্তু ধরিলে দেওয়ালে বা পর্দায় তাহার ছায়া পড়ে। আলো বক্ররেখায় চলিতে পারিলে ছায়ার সৃষ্টি হইত না। সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ আলোর ঋজুগতির জন্যই হইয়া থাকে। অমাবস্যায় যখন চাঁদ পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে আসে তখন চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়িলে সূর্যগ্রহণ হয়। আবার পূর্ণিমায় যখন চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে পৃথিবী আসে তখন পৃথিবীর ছায়ার ভিতর চাঁদ প্রবেশ করিলে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্যগ্রহণের বেলায় চাঁদ অস্বচ্ছ বস্তু এবং চন্দ্রগ্রহণের ক্ষেত্রে পৃথিবী সূর্যের সম্মুখে অস্বচ্ছ বস্তুর কাজ করে।

জোতির্বিজ্ঞানী রোমার প্রথম আলোকের বেগ বাহির করেন। পরে ফিজু, ফুকো, মাইকেলসন, অ্যাণ্ডারসন, বার্গস্ট্রাণ্ড ও আরও অনেক বিজ্ঞানী আলোকের বেগ বিভিন্নভাবে বাহির করেন। শূন্যমাধ্যমে আলোকের বেগ **প্রতি সেকেণ্ডে 299,790 কিলোমিটার** বা **186,280** মাইল। সাধারণভাবে শূন্য মাধ্যমে আলোকের বেগ **প্রতি সেকেণ্ডে 3 লক্ষ কিলোমিটার** ধরা যাইতে পারে।

সূর্য হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছাইতে (প্রায়) সাড়ে আট মিনিট মাত্র সময় লাগে। নভোমণ্ডলে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাহা হইতে আলোক পৃথিবীতে আসিতে কয়েক বৎসর বা তাহারও অনেক বেশী সময় লাগে। রাত্রির আকাশে আমরা যে নক্ষত্ররাজি দেখিতে পাই তাহাদের কোন কোনটি বহু আগেই নভোমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ, উহাদের অবস্থান-দূরত্ব পৃথিবী হইতে এত বেশী যে সেখান হইতে পৃথিবীতে আলোক পৌঁছাইতে যে সময় লাগে তাহার পূর্বেই নক্ষত্রটি হয়ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে।

### 7-7. উত্তল লেন্স ও উহার ফোকাস ক্রিয়া ( Convex lens and its focussing )

**লেন্স কাহাকে বলে ?** দুইটি গোলীয় অথবা একটি গোলীয় ও একটি সমতল তল দ্বারা সীমাবদ্ধ কোনও স্বচ্ছ প্রতিসারক মাধ্যমকে লেন্স বলা হয়। সাধারণতঃ কাচ লেন্সের স্বচ্ছ মাধ্যমরূপে ব্যবহৃত হয়।

যে লেন্সের মধ্যস্থল মোটা ও প্রান্তের দিক সরু থাকে তাহাকে **উত্তল** বা **অভিসারী লেন্স** (Convex or Converging lens) বলা হয়। 22নং চিত্রে একটি উত্তল লেন্স দেখান হইল।

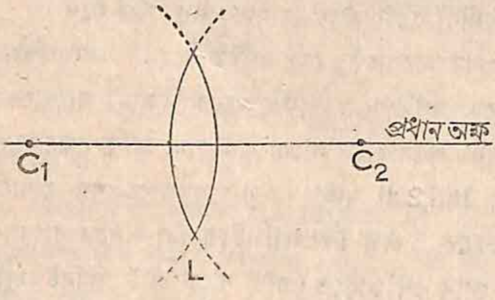


চিত্র নং 22

উত্তল লেন্স সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছকে এক বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। লেন্সের এই ধর্ম বহু প্রাচীন কাল হইতেই জানা ছিল এবং এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াই 'আতশী কাচে'র উদ্ভাবন হইয়াছিল।

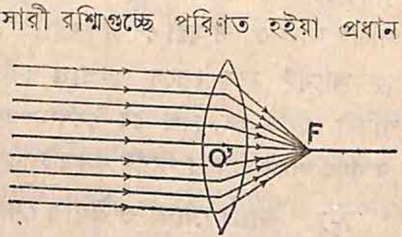
আধুনিক কালে চশমা, ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ, অণুবীক্ষণ ইত্যাদি যন্ত্রে লেন্সের বহুল প্রচলন দেখা যায়।

উত্তল লেন্সের দুইতল যে দুইটি গোলকের অংশবিশেষ হইবে তাহাদের কেন্দ্র দুইটিকে উহার **বক্রতাকেন্দ্র** ( centre of curvature ) বলে। লেন্সের বক্রতাকেন্দ্র দুইটি যোগ করিলে যে সরলরেখা পাওয়া যায় তাহাকে লেন্সের **প্রধান অক্ষ** ( principal axis ) বলে। 23নং চিত্রে $C_1$ ও $C_2$ উত্তল লেন্স L-এর দুই বক্রতাকেন্দ্র। $C_1$ ও $C_2$ সংযোগকারী সরলরেখা লেন্সের প্রধান অক্ষ।



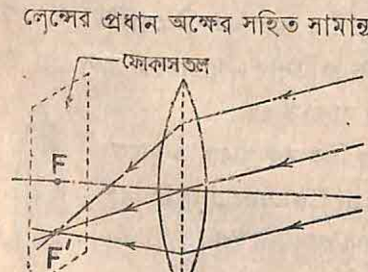
চিত্র নং 23

কোনও উত্তল লেন্সের প্রধান অক্ষের সমান্তরাল কোনও রশ্মিগুচ্ছ লেন্সের উপর আপতিত হইলে লেন্স কর্তৃক প্রতিসরণের ফলে রশ্মিগুচ্ছ একে একে লেন্সের মোটা অংশের দিকে বাঁকিয়া যায় এবং ফলে রশ্মিগুচ্ছ অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হইয়া প্রধান অক্ষের উপরস্থ কোন (চিত্র নং 24) বিন্দুতে মিলিত হয়। এই বিন্দুকে ঐ উত্তল লেন্সের **মুখ্য ফোকাস** ( principal focus ) বলা হয়। চিত্রে F বিন্দু লেন্সের ফোকাস।



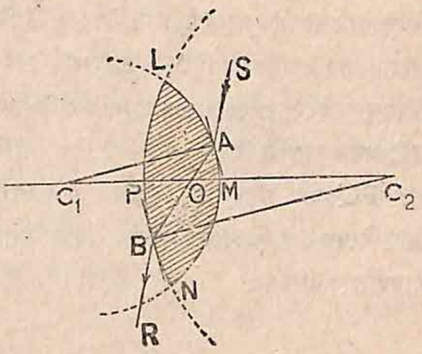
চিত্র নং 24

লেন্সের প্রধান অক্ষের সহিত সামান্য আনতভাবে সমান্তরাল রশ্মিগুচ্ছ উত্তল লেন্সের উপর আপতিত হইলেও উহা লেন্স দ্বারা প্রতিসৃত হইয়া অভিসারী রশ্মিগুচ্ছে পরিণত হইবে এবং এক বিন্দুতে মিলিত হইবে। তখন ঐ বিন্দুকে **গৌণ ফোকাস** (secondary focus) বলা হয়। F' ঐ উত্তল লেন্সের গৌণ ফোকাস। ইহা ফোকাসতলে অবস্থান করে এবং 25নং চিত্রে বিন্দু বিন্দু রেখা দ্বারা ফোকাসতল চিহ্নিত করা হইয়াছে।



চিত্র নং 25

যদি কোন আলোকরশ্মি লেন্সের একটি তলে আপতিত হইয়া প্রতিসরণের পর অপর তল দিয়া আপতিত রশ্মিপথের সমান্তরালে বাহির হয়, তাহা হইলে লেন্সের মধ্যে আলোকরশ্মির যে-গতিপথ তাহা প্রধান অক্ষকে একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে ছেদ করিয়া থাকে। ঐ নির্দিষ্ট বিন্দুকে লেন্সটির **আলোক-কেন্দ্র** (optical centre) বা সংক্ষেপে লেন্সের কেন্দ্র (centre of the lens) বলা হয়। সংলগ্ন চিত্রে 'O' হইল লেন্সের আলোককেন্দ্র। সরু লেন্সের ক্ষেত্রে উহার আলোককেন্দ্র উহার প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এইরূপ এক নির্দিষ্ট বিন্দু যাহার ভিতর দিয়া আলোকরশ্মি গমন করিলে উহার কোন চ্যুতি বা সরণ হয় না—উহা সোজা পথেই বাহির হইয়া যায়। লেন্সের উভয় তলই সমানভাবে বাঁকান থাকিলে উহার আলোককেন্দ্র উভয় তল হইতে সমান দূরে প্রধান অক্ষের উপর অবস্থিত এক বিন্দু হইবে।

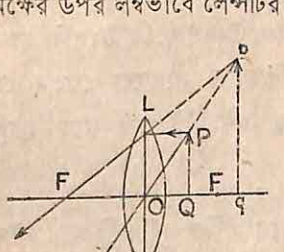


চিত্র নং 26

লেন্সের আলোককেন্দ্র O হইতে মুখ্য ফোকাস F-এর দূরত্বকে **ফোকাস-দূরত্ব** ( focal length ) বলে।

**বিবর্ধক কাচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার** ( Convex lens as magnifying glass ) ঃ

মনে কর, PQ একটি বস্তু এবং উহা একটি উত্তল লেন্স LOL′-এর প্রধান অক্ষের উপর লম্বভাবে লেন্সটির ফোকাস-দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত। PQ বস্তুটিকে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুবিন্দুর সমষ্টি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। উহার শীর্ষবিন্দু P হইতে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটি আলোকরশ্মি PL লেন্স দ্বারা প্রতিসরণের পর উহার মুখ্য ফোকাস F দিয়া যাইবে। আলোককেন্দ্রগামী অপর একটি রশ্মি PO লেন্সের ভিতর দিয়া সোজা পথে চলিয়া যাইবে। এখানে P বিন্দু হইতে নির্গত রশ্মি দুইটি প্রতিসরণের পর কোন

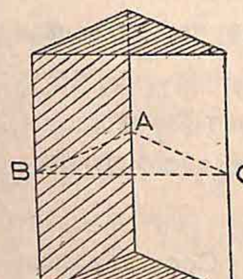


চিত্র নং 27

বিন্দুতে মিলিত হইতেছে না, কিন্তু পশ্চাতে বর্ধিত করিলে $p$ বিন্দুতে মিলিত হয়, অর্থাৎ রশ্মি দুইটি $p$ বিন্দু হইতে আসিতেছে বলিয়া মনে হইবে। সুতরাং $p$ বিন্দু হইবে P বিন্দুর অসদ্ প্রতিবিম্ব। Q বিন্দু হইতে আলোককেন্দ্রগামী রশ্মি প্রধান অক্ষ বরাবরই যাইবে। এইজন্য প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের উপরই থাকিবে। P বিন্দু হইতে লেন্সের প্রধান অক্ষের উপর $pq$ লম্ব টানিলে এই $pq$-এর মধ্যেই PQ বস্তুর অন্যান্য বিন্দুর প্রতিবিম্ব-বিন্দু থাকিবে এবং ফলে $pq$ হইবে সমগ্র বস্তু PQ-এর অসদ্ প্রতিবিম্ব। উহা স্পষ্টতঃই বস্তু অপেক্ষা আকারে বড় হয়, প্রতিবিম্বের এই বিবর্ধনের নীতির জন্য উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

## 7-8. **বিচ্ছুরণ ও বর্ণালি** (Dispersion and Spectrum)

**প্রিজম্**—কোনও কোণে আনত দুই সমতল পৃষ্ঠতল দ্বারা সীমিত স্বচ্ছ মাধ্যমের (সাধারণতঃ কাচের) ত্রিভুজাকৃতি ফলককে প্রিজম [ চিত্র নং 28 ] বলে। ABC প্রিজমের একটি ছেদ। ইহাকে প্রিজমের প্রধান ছেদ (principal section) বলে। পরস্পর আনত তল দুইটিকে প্রতিসারক পৃষ্ঠ বলে।



চিত্র নং 28

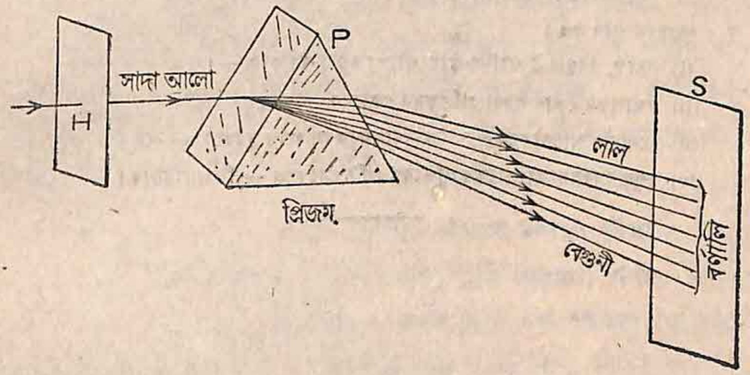
**বিচ্ছুরণ**—বহু প্রাচীনকালেও লোকেরা জানিত সূর্যের আলো স্বচ্ছ স্ফটিক কিংবা নানা ধরনের মুক্তা বা পাথরের ভিতর দিয়া গমন করিলে অতি উজ্জল রং-এর আলো বাহির হয়। তৎকালীন পণ্ডিত ব্যক্তিরা মনে করিতেন স্ফটিক বা পাথরের মধ্যেই এই সকল উজ্জল বর্ণের উৎপত্তি হয়। কিন্তু পরে স্যার আইজাক নিউটনই প্রথম প্রিজমের সাহায্যে দেখান যে এই রংগুলি সূর্যের সাদা আলোর মধ্যেই আছে এবং পিজমের কাজ হইল সাদা আলোকে মূল সাতটি বর্ণে বিভক্ত করা।

সাদা আলোক প্রিজমের উপর আপতিত হইলে বিভিন্ন বর্ণ প্রতিসৃত হইয়া অভিলম্ব হইতে বিভিন্ন পরিমাণ বাঁকিয়া যায়। বেগুনী বর্ণের আলোকরশ্মি অভিলম্ব হইতে সর্বাপেক্ষা বেশী এবং লাল রশ্মি সর্বাপেক্ষা কম বাঁকে। এইজন্য একটি প্রিজমে সাদা আলোর একটি সরু কিরণ ( narrow beam ) প্রবেশ

করিলে উহাতে উপস্থিত বিভিন্ন বর্ণের আলোকরশ্মি বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে সাদা আলোর উহার উপাদান রঙগুলিতে বিশ্লিষ্ট হইবার ঘটনাকে আলোকের **বিচ্ছুরণ** ( dispersion ) বলে। সূর্যের সাদা আলোতে সাতটি রং থাকে—বেগুণী (violet), গাঢ় নীল (indigo), আকাশী নীল (blue), সবুজ (green), হলুদ (yellow), কমলা (orange) এবং লাল (red)। আলোকের বিচ্ছুরণের জন্য বিভিন্ন বর্ণসমবায়ের যে পটি পর্দার উপর উৎপন্ন হয় তাহাকেই **বর্ণালি** (spectrum) বলে। এই বর্ণ কয়টির ক্রমিক অবস্থান ইংরাজীতে সংক্ষেপে 'VIBGYOR' দ্বারা নির্দেশ করা হয় এবং স্পষ্টতই বর্ণগুলির আদ্য অক্ষরসমূহের সমাবেশে ইহা উদ্ভূত।

**বর্ণালি প্রদর্শনের পরীক্ষা** (Demonstration of Production of Spectrum ) ঃ

একটি অন্ধকার ঘরে সূক্ষ্ম উর্ধ্বাধ (vertical) ছিদ্রের (H) ভিতর দিয়া প্রিজ্‌ম P-এর উপর সূর্যের আলো ফেল। ঘরের কোন ছিদ্র দিয়া সূর্যালোক




চিত্র নং 29

প্রবেশ করাও। যে পৃষ্ঠে আলো ফেলা হইয়াছে উহার অপর পৃষ্ঠে এবং কিছু দূরে একটি পর্দা S রাখ। প্রিজ্‌ম হইতে নির্গত হইয়া ঐ কিরণ যখন পর্দার উপর পড়ে তখন উহা বিভিন্ন রঙের রশ্মিতে বিভক্ত হইয়া একটি রঙীন পটি বা বর্ণালির সৃষ্টি করে। সুতরাং পর্দায় সাতটি রঙ দেখিতে পাইবে।

## প্রশ্নাবলী

1. আলোকের প্রতিফলন কাহাকে বলে? প্রতিফলনের নিয়ম কি কি? সদ্ ও অসদ্ প্রতিবিম্বের পার্থক্য চিত্র সহযোগে বুঝাইয়া দাও।

2. নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির ব্যাখ্যা দাও:
   (i) একটি দণ্ডকে কাত করিয়া জলে আংশিক ডুবাইলে উহা বাঁকা দেখায়।
   (ii) কোনও জলাশয়ের গভীরতা উহার প্রকৃত গভীরতা হইতে কম মনে হয়।
   (iii) সূর্য অস্ত যাইবার পরও উহাকে কিছুক্ষণ দেখা যায়।

3. আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলন কাহাকে বলে—চিত্র সহযোগে বুঝাইয়া দাও। একটি প্রাকৃতিক ঘটনা বর্ণনা কর যাহা আভ্যন্তরীণ পূর্ণ প্রতিফলনের জন্য ঘটিয়া থাকে।

4. উত্তল লেন্স কাহাকে বলে? উহার ফোকাস ও ফোকাস-দূরত্বের সংজ্ঞা লিখ। বিবর্ধক কাচ হিসাবে উত্তল লেন্সের ব্যবহার চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

5. আলোকের বিচ্ছুরণ কাহাকে বলে? বর্ণালি কি? সূর্যের সাদা আলোতে যে সাত রং-এর আলো আছে তাহা প্রদর্শন করিবার একটি সহজ পরীক্ষা বর্ণনা কর।

6. যে উক্তিটি ঠিক তাহার পাশে 'R' এবং যেটি ভুল তাহার পাশে 'W' বসাও:
   (i) আলোর গতিবেগ শব্দের গতিবেগ অপেক্ষা অনেক বেশী।—
   (ii) আলোকরশ্মি যখন ঘন মাধ্যম হইতে লঘু মাধ্যমে প্রতিসৃত হয়, তখন প্রতিসৃত রশ্মি অভিলম্বের দিকে বাঁকিয়া যায়। —

7. শূন্যস্থান পূরণ কর:
   (i) তাপ, বিদ্যুৎ ইত্যাদির ন্যায় আলোকও একপ্রকার —।
   (ii) আপতন কোণ সর্বদা প্রতিফলন কোণের — হয়।
   (iii) লেন্সের আলোককেন্দ্র হইতে মুখ্য ফোকাস পর্যন্ত দূরত্বকে — বলে।
   (iv) শূন্য মাধ্যমে আলোকের গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে — কিলোমিটার।

---

# রসায়ন

মানুষের অনুসন্ধিৎসা তাহাকে তাহার পারিপার্শ্বিক বস্তুরাশির ও বিভিন্ন ঘটনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে প্রেরণা যোগাইয়াছে। এই সকল পরীক্ষার ফলে মানুষ প্রকৃতি সম্পর্কে বহু তথ্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে। দিনে দিনে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়িয়া চলিয়াছে।

প্রকৃতি নিয়মের রাজত্ব। এখানে নিয়মের ব্যতিক্রম কখনও ঘটে না। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিলনে জল গঠিত হয়। এই ঘটনা কোন ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নহে। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন উপযুক্ত পরিবেশে মিলিত হইয়া জল গঠন করে—ইহা চিরন্তন সত্য এবং দেশ, কাল ও লোকভেদে শাশ্বত। যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। এই সমস্ত তথ্য আবার বিভিন্ন ধরনের। যেমন, টাইফয়েডের জীবাণু লোকদেহে প্রবেশ করিলে লোক ঐ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং ক্লোরোমাইসেটিন ঐ জীবাণু ধ্বংস করে। আলোচনার সুবিধার জন্য এই সকল বিভিন্ন ধারার তথ্যকে মানুষ বিভিন্ন শাখায় অর্থাৎ বিভিন্ন বিশেষ বিজ্ঞানে বিভক্ত করিয়া উহার ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়াছে।

বিজ্ঞানের এইরূপ একটি শাখার নামকরণ হইয়াছে রসায়ন বিজ্ঞান। ইহার ইংরাজী নাম 'Chemistry'। মিশরের নাম 'কিমি' (qemi) অর্থাৎ 'কালো জমির দেশ' হইতে 'কিমিয়া' (chemeia) শব্দটি উদ্ভূত এবং সম্ভবতঃ ইহা হইতে chemistry শব্দটির উৎপত্তি। বস্তুজগতে আমরা অগণিত, বিচিত্র পদার্থের সংস্পর্শে আসি। উদাহরণস্বরূপ জল, কাচ, বায়ু, বালু, চক্, লৌহ, গন্ধক ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। স্পষ্টই দেখা যায় যে ইহারা এক-একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ—ইহাদের একটির সহিত অপরটির কোন বাহিক সাদৃশ্যও নাই। পদার্থের ধর্ম (properties) বলিতে এইরূপ কতকগুলি গুণকে (qualities) বুঝায় যাহা দ্বারা একটি পদার্থকে অপর পদার্থ হইতে পার্থক্য (distinguish) করা যায়। যেমন, জল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন তরল পদার্থ, 0°C উষ্ণতায় কঠিনে পরিণত হয় এবং সাধারণ চাপে 100°C উষ্ণতায় ফুটিতে

আরম্ভ করে। এই ধর্ম আবার দুই রকমের—ভৌত এবং রাসায়নিক। পদার্থের প্রকৃতি বা গঠন সংযুতির পরিবর্তন না ঘটাইয়া যে-ধর্ম পরীক্ষা করা যায় তাহাকে বলে ভৌত-ধর্ম। উপরিউক্ত ধর্মগুলি জলের ভৌত ধর্ম। কিন্তু যে-ধর্ম পরীক্ষা করিতে পদার্থের প্রকৃতি বা সংযুতির পরিবর্তন ঘটাইতে হয় তাহাকে রাসায়নিক ধর্ম বলে। যেমন, ম্যাগনেসিয়ামের ফিতা যখন জ্বলিতে থাকে তখন সাদা ধোঁয়া নির্গত হয় এবং উহা শীতল পাত্রের গায়ে সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত সাদা কঠিনকে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড বলা হয়। ইহা হইতে বলা যায় যে ম্যাগনেসিয়াম একটি দাহ্য পদার্থ– জ্বলিবার এই ক্ষমতা হইল একটি রাসায়নিক ধর্ম। কারণ, সংশ্লিষ্ট পদার্থের সংযুতির পরিবর্তনের দ্বারা ইহা পরীক্ষা করা যায়। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও ম্যাগনেসিয়াম একই পদার্থ নহে। আবার যখন কাঠ বা কয়লা জ্বলে, লৌহে মরিচা ধরে তখন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় যাহা আদি পদার্থ হইতে একেবারে স্বতন্ত্র। এইরূপ যে-সমস্ত ঘটনায় পদার্থের মৌলিক (radical) পরিবর্তন সাধিত হইয়া আদি পদার্থ হইতে পৃথক্ পদার্থ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রাসায়নিক ঘটনা বলা হয় এবং যে-বিজ্ঞানে মূলত এই সমস্ত ঘটনা ও উহা নিয়ন্ত্রণকারী সূত্রসমূহ এবং এই ঘটনাসমূহের উপর চাপ, তাপ ইত্যাদির প্রভাব আলোচনা করা হয় তাহাকে বলা হয় **রসায়ন বিজ্ঞান**।

**রসায়নের উদ্দেশ্য হইল :** (i) পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা এই সকল বিচিত্র পদার্থের ধর্মের সহিত সম্যক্ পরিচিত হওয়া ; (ii) বস্তু বা পদার্থের উপাদানগুলি পৃথক্ করিয়া উহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা বা উহার গঠনমূলক সংযুতি নিরূপণ করা ; (iii) বাহ্যিক কারণ, যথা—চাপ, উষ্ণতা ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটিলে বা পদার্থসমূহের পারস্পরিক সংযোগে পদার্থের গঠনসংযুতির যদি কোন পরিবর্তন ঘটে তাহা জানা, (iv) সম্ভব হইলে পদার্থটি যে যে উপাদানে গঠিত অনুরূপ উপাদানগুলি লইয়া কৃত্রিম উপায়ে ঐ পদার্থ তৈয়ারী করা এবং (v) এমনকি প্রকৃতিতে নাই এইরূপ যৌগসমূহ তৈয়ারী করা।

---

# প্রথম অধ্যায়

## পদার্থ ও উপাদান
## ( Matter & Materials )

1-1. **পদার্থ :** বৈচিত্র্যে-ভরা আমাদের এই পৃথিবী কত না সুন্দর! আমরা প্রতিনিয়ত কত না বিচিত্র পদার্থের সংস্পর্শে আসি এবং উহার অস্তিত্ব এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করিয়া থাকি। কখনও চোখে দেখিয়া আবার কখনো বা স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ইহাদের অস্তিত্ব আমরা বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ, পদার্থ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যে-কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই যে আমরা সকল পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিব এমন কোন কথা নাই। যেমন, বায়ু আমরা দেখিতে পাই না, বায়ু বহিয়া গেলে উহার অস্তিত্ব আমরা বুঝিতে পারি। আবার যাহা কিছু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই পদার্থ নহে। যেমন, উষ্ণতা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, স্পর্শদ্বারা ইহা আমরা অনুভব করিতে পারি। কিন্তু উষ্ণতা পদার্থ নহে, বস্তুর এক তাপীয় অবস্থা এবং তাপ এক প্রকার শক্তি।

পদার্থ কিছু পরিমাণ স্থান জুড়িয়া থাকে এবং সাধারণতঃ ইহার কিছু-না-কিছু ওজন থাকে। তবে ওজন ইহার সহজাত (inherent) ধর্ম নহে। কারণ, নির্দিষ্ট একটি পদার্থখণ্ডের ওজন ভূপৃষ্ঠের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিলে ওজনেরও পরিবর্তন ঘটে; এমনকি বিশেষ অবস্থানে ঐ পদার্থখণ্ডের ওজন শূন্যও হইতে পারে। যেমন, পৃথিবীর কেন্দ্রে যদি কোন পদার্থখণ্ডকে রাখা যায়, তবে ঐ অবস্থানে উহার কোনও ওজন থাকিবে না।

শক্তির প্রভাবে পদার্থকে গতিশীল করা যাইতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনা হইতে সাধারণভাবে বলা যায় যে, যাহার ওজন আছে, যাহা কিছু স্থান জুড়িয়া থাকে, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং যাহাকে শক্তির প্রভাবে গতিশীল করা যায় তাহাই **পদার্থ**। ওজন ও আয়তনবিশিষ্ট যে কোন পদার্থ-খণ্ডকে **বস্তু** বলে। লোহার এক টুকরা নল একটি বস্তু এবং যে-লোহা যাহা দ্বারা ঐ নলটি তৈয়ারী তাহা পদার্থ।

রসায়ন বিজ্ঞানীর সংস্রব প্রধানতঃ এই পদার্থের সহিত, বস্তুর সহিত নহে। বালতি, নল কিংবা ছাউনির টিন যাহা প্রস্তুত করিতেই লোহা ব্যবহৃত হউক না কেন; বস্তুসমূহের উপাদান লোহা সম্পর্কেই তিনি কৌতূহলী। উপাদান

হিসাবে কাঠের সহিতই তাঁহার সম্পর্ক ; টেবিল কিংবা চেয়ার বা অন্য কোন বস্তু যাহাতেই ইহা থাকুক না কেন। বস্তুতঃ পদার্থের বৈশিষ্ট্যবাচক বস্তুনিরপেক্ষ গুণাবলী সম্পর্কে তিনি প্রধানতঃ আগ্রহী।

**1-2. পদার্থের অবস্থাভেদ** ( Different states of matter ): পদার্থসমূহ তিন প্রকার অবস্থায় থাকিতে পারে, যথা– (i) কঠিন, (ii) তরল ও (iii) গ্যাসীয় অবস্থা। উষ্ণতা এবং চাপের তারতম্য ঘটাইয়া পদার্থকে এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় পরিবর্তন ( পদার্থবিদ্যা পৃঃ 21 ) করা যাইতে পারে।

পদার্থ মাত্রই উহার অণুর সমষ্টি ; অণুগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট থাকে না, বস্তুতঃ উহাদের পরস্পরের মধ্যে ফাঁক ( space ) থাকে এবং এই ফাঁককে **আন্তঃ-আণবিক ব্যবধান** (intermolecular space) বলে। কোন গ্যাসের উপর চাপ প্রয়োগ করিলে বা উহার তাপমাত্রা হ্রাস করিলে উহার আয়তনের সংকোচন ঘটে। আবার বিপরীতক্রমে চাপ হ্রাস করিলে বা তাপমাত্রা বৃদ্ধি করিলে আয়তন বৃদ্ধি পায়। আন্তঃআণবিক ব্যবধান যে আছে ইহা তাহার নিদর্শন। তাপ প্রয়োগে প্রায় সকল কঠিন পদার্থেরই প্রসারণ হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পদার্থসমূহের মিশ্রণের ফলে মোট আয়তনের সংকোচন হয়। জলের সহিত খানিকটা চিনি মিশাইলে চিনি অদৃশ্য হইয়া যায়, মিশ্রণের স্বাদ হইতে উহাতে চিনির অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু চিনি মিশ্রিত করিবার দরুন জলের আয়তন তদনুরূপ বৃদ্ধি পায় না। এই ঘটনাসমূহ আন্তঃআণবিক ব্যবধানের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় অর্থাৎ আন্তঃআণবিক ব্যবধানের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া লইতে হয়।

প্রকৃতপক্ষে অণুগুলি গতিশীল এবং উহারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে। ইহা **আন্ত আণবিক আকর্ষণ-বল** (intermolecular force of attraction) নামে পরিচিত। বিভিন্ন পদার্থে এবং অবস্থাভেদে এই বলের পরিমাণ বিভিন্ন। গ্যাসীয় পদার্থে এই আকর্ষণ-বল খুবই কম ; আন্তঃআণবিক ব্যবধান খুব বেশী, অণুগুলি প্রায় স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করে। ইহা যতই অল্প হউক না কেন, যে-পাত্রে রাখা হইবে উহার সমস্ত স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে এবং সেই পাত্রের আকৃতি ধারণ করিবে। তরল পদার্থে পূর্বোক্ত আকর্ষণ-বল অপেক্ষাকৃত বেশী, ফলে নির্দিষ্ট এক পৃষ্ঠদেশ বা তলের ( surface ) দ্বারা উহার স্থান দখলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার নির্দিষ্ট আয়তন আছে। ইহা

সত্ত্বেও অণুসমূহের গতি কিছুটা অবাধ বা মুক্ত বলিয়া ইহাকে যে-পাত্রে রাখা হয় ইহা তাহার আকৃতি ধারণ করে। অতএব গ্যাসের নিজস্ব কোন আকৃতি বা নির্দিষ্ট আয়তন নাই ; কিন্তু তরল পদার্থের নির্দিষ্ট আয়তন আছে, কোন নিজস্ব আকৃতি নাই। কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে আকর্ষণ-বল সর্বাধিক প্রবল, আন্তঃ-আণবিক ব্যবধান সর্বাপেক্ষা কম। উপাদান কণিকাসমূহ অবিরাম স্পন্দিত হয় বটে, কিন্তু উহারা স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে অক্ষম। ফলে উপাদান কণিকার সজ্জায় শৃঙ্খলা থাকে অর্থাৎ বেশ সুব্যবস্থিত। অতএব, ইহার নির্দিষ্ট আকৃতি ও আয়তন থাকে।

চাপ এবং শৈত্যের আধিক্যে আণবিক ব্যবধান হ্রাস পায়। চাপ এবং শৈত্য হ্রাস পাইলে আণবিক ব্যবধান বৃদ্ধি পায়। চাপ ও উষ্ণতা নিয়ন্ত্রিত করিয়া পদার্থের অবস্থা পরিবর্তন করা যাইতে পারে। এই জন্য তাপ প্রয়োগে সাধারণতঃ কঠিন পদার্থ তরল এবং তরল পদার্থ গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; আবার ঠাণ্ডার প্রভাবে গ্যাসীয় পদার্থ তরল এবং তরল পদার্থ কঠিন অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

পদার্থের এই অবস্থা পরিবর্তন এবং সেই প্রসঙ্গে **গলনাঙ্ক** ও **স্ফুটনাঙ্ক** বলিতে কি বুঝায় তাহা পূর্বেই ( পদার্থবিদ্যা, পৃঃ 21-26 ) বলা হইয়াছে।

**1-3 ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তন (Physical and Chemical changes) :** পদার্থ কি সর্বদাই অপরিবর্তিত থাকে ? না, উহাদের পরিবর্তন স্বতঃই ঘটিয়া থাকে বা উহা ঘটান যায়।

একটি খোলা অগভীর পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া দিলে কি ঘটে ? এক টুকরা লোহাকে আর্দ্র বায়ুতে ফেলিয়া রাখিলে কি ঘটে ?

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই সকল প্রশ্নের উত্তর সহজেই দেওয়া যায়। খোলা পাত্রের জল ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত হয়। পরিত্যক্ত লোহায় মরিচা পড়ে। প্রতিক্ষেত্রেই পদার্থের পরিবর্তন সাধিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতিতেই এই ধরনের অসংখ্য পরিবর্তন প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন পরিবর্তন আপনা আপনিই ঘটিয়া থাকে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করিয়া পরিবর্তন ঘটান হয়। পদার্থের এই সব পরিবর্তন দুই ভাগে ভাগ করা যায়—ভৌত এবং রাসায়নিক।

**ভৌত পরিবর্তন :** যে পরিবর্তনে পদার্থের গঠনের অর্থাৎ উহার অনুগুলির গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু কেবল কতকগুলি বাহিক

গুণ যাহা সহজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যথা—অবস্থা, আকার, বর্ণ, দ্রাব্যতা, স্ফুটনাঙ্ক, গলনাঙ্ক, চৌম্বকত্ব প্রভৃতি বদলাইয়া যায় তাহাকে ভৌত পরিবর্তন বলে। ভৌত পরিবর্তন অস্থায়ী এবং পরিবর্তনের কারণ অপসারিত হইলে পদার্থ পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায়। তাহা ছাড়া, ভৌত পরিবর্তনে তাপের তারতম্য হইতেও পারে, না-ও হইতে পারে, কিন্তু ওজনের কোন তারতম্য হইবে না।

**দৃষ্টান্ত ঃ** জলে তাপ প্রয়োগ করিলে বাষ্প হয়। আবার বাষ্পকে শীতল করিলে জল হয় এবং জলকে আরও শীতল করিলে বরফ উৎপন্ন হয়। কোন ক্ষেত্রেই জলের অণুর গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না।

কর্পূর বাতাসে রাখিয়া দিলে ধীরে ধীরে উহা গ্যাসীয় অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ফলে উহা অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে কর্পূরের অণুর কোনও পরিবর্তন ঘটে না। চারিদিকের বায়ুমণ্ডল শীতল করিলেই কর্পূর আবার কঠিন অবস্থায় পাওয়া যায়।

প্লাটিনাম তারে তাপ প্রয়োগ করিলে তার প্রথমে লোহিততপ্ত (red hot), পরে শুভ্রতপ্ত (white hot) হয় এবং আলোক প্রদান করে। শীতল করিলে তার আবার মূল বর্ণ ফিরিয়া পায় এবং আলোক প্রদান করিবার ক্ষমতা হারায়।

খানিকটা সাধারণ লবণ জলের সহিত মিশ্রিত করিলে, লবণ অদৃশ্য হইয়া যায়। জলকে বাষ্পীভূত করিলে একই ওজনের লবণ পুনরায় ফিরিয়া পাওয়া যায়।

ঘন রসে একটি চিনির দানা রাখিয়া দিলে উহা আকারে বর্ধিত হয়। চিনি উহার সম্পৃক্ত দ্রবণ হইতে নিমজ্জিত ( চিনির ) দানার উপর কেলাসিত হয় বলিয়াই দানা আকারে বর্ধিত হয়। এক্ষেত্রে বর্ধিত কেলাসটি চিনিই। নূতন কোন পদার্থ নহে।

**রাসায়নিক পরিবর্তন ঃ** যে পরিবর্তনে পদার্থের সংযুতির অর্থাৎ অণু-গুলির গঠনের পরিবর্তন হইয়া নূতন পদার্থের অণু উৎপন্ন হয় তাহাকে রাসায়নিক পরিবর্তন বলে। এই পরিবর্তন স্থায়ী ; কারণ, ইহাতে যে নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহাকে সহজে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। তাহা ছাড়া এই পরিবর্তনে তাপের ও সাধারণতঃ ওজনের তারতম্য হইবেই।

**দৃষ্টান্ত ঃ** লৌহকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহার উপর একটি বাদামী বর্ণের আস্তরণ পড়ে। ইহাকে মরিচা বলে। মরিচার গঠন এবং ধর্ম লৌহ হইতে স্বতন্ত্র। অতএব এই পরিবর্তনে একটি নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে—লৌহের ওজন অপেক্ষা মরিচাধরা লৌহের ওজন বেশী।

গলিত খাদ্যলবণের ( সাধারণ লবণ ) ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে ক্লোরিন নামক একটি সবুজাভ হলুদ বর্ণের গ্যাস এবং সোডিয়াম নামক একটি ধাতু উৎপন্ন হয়। খাদ্যলবণের ধর্ম উৎপন্ন ক্লোরিন এবং সোডিয়াম হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

এক টুকরা ম্যাগনেসিয়ামের তারে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা জলিয়া ওঠে এবং একটি সাদা গুঁড়া পড়িয়া থাকে। উৎপন্ন গুঁড়ার ওজন ম্যাগনেসিয়ামের ওজন অপেক্ষা বেশী। এই সাদা গুঁড়া একটি নূতন পদার্থ; ইহার নাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড।

তুঁতের দ্রবণে একখণ্ড লৌহ ডুবাইলে লৌহের উপর তামার আবরণ পড়ে। ইহা একটি রাসায়নিক পরিবর্তন, কারণ লৌহ দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং লৌহের উপর তামার আস্তরণ পড়ে। তামা এবং তুঁতের ধর্ম পৃথক্। কোনও সহজ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঐ তামাকে পরিবর্তন করিয়া তুঁতে করা যায় না।

## ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের তুলনা

| ভৌত পরিবর্তন | রাসায়নিক পরিবর্তন |
|---|---|
| 1. ইহাতে কেবল পদার্থের বাহিক পরিবর্তন ঘটে, নূতন কোন পদার্থ গঠিত হয় না। | 1. ইহাতে পদার্থের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া নূতন পদার্থ সৃষ্টি হয়। |
| 2. এই পরিবর্তন অস্থায়ী, পরিবর্তনের কারণসমূহ অপসারিত হইলে, পদার্থ আবার পূর্বেকার অবস্থায় ফিরিয়া আসে। | 2. এই পরিবর্তন স্থায়ী। নূতন পদার্থকে সহজে আর পূর্বেকার অবস্থায় ফিরাইয়া আনা যায় না। |
| 3. ইহাতে তাপের তারতম্য ঘটিতেও পারে, আবার না-ও ঘটিতে পারে। | 3. ইহাতে তাপের তারতম্য ঘটিবেই—এক নয় তাপ উদ্ভূত হয়, আর নয় তাপ শোষিত হয়। |
| 4. এই পরিবর্তনে ওজনের কোন তারতম্য ঘটে না—অর্থাৎ ওজনের কোন হ্রাসবৃদ্ধি হয় না। | 4. এই পরিবর্তনে পদার্থসমূহের মোট ওজনের কোন তারতম্য ঘটে না বটে, কিন্তু বিভিন্ন পদার্থের পৃথক্ ওজনের সাধারণতঃ [ আইসোমারাইজেশনের ক্ষেত্রে ওজনের তারতম্য ঘটে না। ] পরিবর্তন ঘটে। |

**1-4. তাপশোষক ও তাপোৎপাদক বিক্রিয়া** (Endothermic and Exothermic reactions) : তোমরা জান যে রাসায়নিক পরিবর্তনে তাপের তারতম্য হয়—এক নয় তাপ শোষিত আর নয় তাপ উদ্ভূত হয়, যে পরিবর্তনে তাপ শোষিত হয় তাহাকে তাপশোষক বিক্রিয়া (endothermic reaction) বলে। কিন্তু যখন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তাপ উদ্ভূত হয় তখন সেই বিক্রিয়াকে তাপোৎপাদক বিক্রিয়া (exothermic reaction) বলে। উপাদান মৌলসমূহ হইতে যে যৌগসমূহ গঠনে তাপ শোষিত হয় সেই যৌগসমূহকে তাপশোষক, আর যে যৌগসমূহ গঠনে তাপ উদ্ভূত হয় উহাদিগকে তাপোৎপাদক যৌগ বলে। নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের মিলনে নাইট্রিক অক্সাইড গঠনের সময় তাপ শোষিত হয়। সুতরাং এই বিক্রিয়াটি তাপশোষক এবং নাইট্রিক অক্সাইড একটি তাপশোষক যৌগ। সেইরূপে উত্তপ্ত গন্ধক ( sulphur) যখন লোহিততপ্ত চারকোলের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একটি বর্ণহীন তরল কার্বন ডাই-সালফাইড গঠন করে তখন তাপ শোষিত হয়। সুতরাং এই বিক্রিয়াটিকে তাপশোষক বিক্রিয়া বলা হয় এবং উৎপন্ন পদার্থকে তাপশোষক যৌগ বলা হয়। কার্বন বাতাসে জলিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে তাপ উদ্ভূত হয়। সুতরাং, বিক্রিয়াটিকে বলা হয় তাপোৎপাদক বিক্রিয়া এবং উৎপন্ন পদার্থ, কার্বন ডাই-অক্সাইডকে বলা হয় তাপোৎপাদক যৌগ। সেইরূপে নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়ার উৎপাদন একটি তাপোৎপাদক বিক্রিয়া এবং অ্যামোনিয়া একটি তাপোৎপাদক যৌগ।

**1-5. বিক্রিয়া ঘটান এবং উহাকে প্রভাবিত করা** ( To initiate and to influence a reaction) : রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। নানা উপায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান হয় এবং প্রতিটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিবার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

শ্বেত ফস্‌ফরাস এবং আয়োডিন খুব সতর্কতার সহিত যদি পাশাপাশি এমনভাবে রাখা হয় যাহাতে একটি অপরটির সংস্পর্শে না আসে, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু পরস্পরের সংস্পর্শে আসামাত্রই জলিয়া ওঠে এবং ফস্‌ফরাস আয়োডাইড গঠিত হয়। এক্ষেত্রে **সংস্পর্শ** (contact) দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান হইয়াছে। টারটারিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম

বাই-কার্বনেট ভালভাবে মিশাইলেও শুষ্ক অবস্থায় কোন বিক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু এই মিশ্রণে একটু জল ঢালিলে উহাদের মধ্যে বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। **দ্রবণে** ( solution ) পদার্থসমূহ ঘনিষ্ঠতর সংস্পর্শে আসে বলিয়া অতি সহজেই রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া থাকে।

বিক্রিয়কগুলি যদি কেবল পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তবেই যে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিবে এমন কোন কথা নাই। কোন কোন ক্ষেত্রে **তাপ** ( heat ) প্রয়োগ না করিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটেই না; লোহা ও গন্ধকের গুঁড়া পরস্পরের সংস্পর্শে রাখিলে কোন বিক্রিয়া ঘটে না। কিন্তু ঐ মিশ্রণে তাপ প্রয়োগ করিলে, বিক্রিয়া ঘটে এবং ফেরাস সালফাইড গঠিত হয়।

বিক্রিয়ক পদার্থগুলির **স্পর্শতল** ( surface of contact ) কতটা তাহার উপর বিক্রিয়ার বেগ নির্ভর করে। কয়লা বায়ুতে জ্বালান যায়। কয়লার কার্বন উচ্চ উষ্ণতায় বায়ুর অক্সিজেনের সহিত প্রচণ্ডভাবে বিক্রিয়া করে। কয়লার একটি বড় ঢেলায় আগুন ধরাইতে সময় লাগে। কিন্তু ঐ ঢেলাকে গুঁড়া করিয়া সূক্ষ্ম চূর্ণ যদি চোঙের ভিতর দিয়া ফুৎকারে ছড়ান হয় তবে উহাকে প্রায় তরল জ্বালানির মত সহজেই বায়ুতে জ্বালান যায়। ইহার কারণ সূক্ষ্ম চূর্ণ এবং বায়ুর অক্সিজেনের স্পর্শতলের মোট পরিমাণ ঢেলার সহিত অক্সিজেনের স্পর্শতলের পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী। সুতরাং সংস্পর্শ বিক্রিয়া ঘটাইবার (initiate) একটি উপায় এবং বিক্রিয়ক পদার্থগুলির স্পর্শতলের পরিমাণ বিক্রিয়াকে প্রভাবিত ( influence ) করে। এই কারণেই কঠিন পদার্থসমূহকে অনেক সময়ই পিষিয়া গুঁড়া করিয়া লওয়া হয় যাহাতে বিক্রিয়ার বেগ বৃদ্ধি পায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে তাপ-প্রয়োগ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইবার একটি উপায়। তাপপ্রয়োগে সাধারণত উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতার বৃদ্ধি এবং হ্রাস যথাক্রমে তাপশোষক ও তাপোৎপাদক বিক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেনের সংযোগে অ্যামোনিয়া ($N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$) উৎপাদন একটি তাপোৎপাদক বিক্রিয়া। আবার নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন হইতে নাইট্রিক অক্সাইড সংশ্লেষণ ($N_2+O_2 \rightleftharpoons 2NO$) একটি তাপশোষক বিক্রিয়া। উষ্ণতা যত কম হয় অ্যামোনিয়ার পরিমাণ তত বেশী হয় এবং উষ্ণতা যত বৃদ্ধি করা যায় তত বেশী নাইট্রিক অক্সাইড পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে আর্ক প্রণালীতে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে এই নীতি কাজে লাগান হয়।

তবে, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে উষ্ণতার বৃদ্ধি প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই বিক্রিয়ার বেগ ( velocity ) দ্রুত বৃদ্ধি করে।

**চাপের** (pressure) সাহায্যে কখনও কখনও রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান হয়। ভুঁই পটকায় পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং গন্ধক বা আর্সেনিক সালফাইড থাকে। পটকা ছুঁড়িয়া মারিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে এবং ফলে বিস্ফোরণ হয়। প্রবল চাপে সীসা চূর্ণ এবং গন্ধক যুক্ত হইয়া লেড সালফাইডে পরিণত হয়; $Pb+S=PbS$, ইহা চাপের দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইবার দৃষ্টান্ত। যে-সকল বিক্রিয়ায় আয়তন হ্রাস পায়, চাপের বৃদ্ধি ঐ সকল বিক্রিয়ার পক্ষে সহায়ক। নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন হইতে অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের বিক্রিয়াটি স্মরণ কর; $N_2+3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$। এই বিক্রিয়ায় আয়তন কমিয়া যায়। সুতরাং চাপ যত বেশী হইবে তত বেশী অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হইবে এবং প্রকৃতপক্ষে সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদনে গ্যাস মিশ্রণের ( নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন ) চাপ 200 অ্যাটমস্ফিয়ার রাখা হয়।

রাসায়নিক বিক্রিয়ার হার ( rate ) বিক্রিয়কসমূহের **গাঢ়তার** ( concentration ) বা চাপের সহিত সমানুপাতিক। যেহেতু বিক্রিয়কসমূহ ক্রমশঃ ব্যয়িত হয় উহাদের গাঢ়তাও ( বা চাপ ) কমিতে থাকে। ফলে, সময় অতিবাহিত হইবার সাথে সাথে বিক্রিয়কসমূহ যেমন ব্যয়িত হইতে থাকে, বিক্রিয়াটিও তেমন ক্রমান্বয়ে মন্থরতর হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল **শব্দের** (sound) দ্বারা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান সম্ভব হয়। মারকারি ফালমিনেটের বিস্ফোরণের শব্দে অ্যাসিটিলীন বিযোজিত হইয়া কার্বন এবং হাইড্রোজেনে পরিণত হয়।

**তড়িৎ** ( electricity )-এর সাহায্যে অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটান সম্ভব। গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের ভিতর দিয়া তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে উহা বিযোজিত হয় এবং সোডিয়াম ও ক্লোরিন উৎপন্ন হয়।

কোন কোন ক্ষেত্রে **আলোর** ( light ) অনুপস্থিতিতে কোন বিক্রিয়াই হয় না। স্বাভাবিক উষ্ণতায় এবং একেবারে অন্ধকারে হাইড্রোজেন ও ক্লোরিনের সংযোগ ঘটে না। অল্প আলোতে আস্তে আস্তে কিন্তু সূর্যালোকে বিস্ফোরণের তীব্রতায় ইহারা সংযুক্ত হয়; $H_2+Cl_2=2HCl$।

শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিয়া অক্সিজেন প্রস্তুত করিতে হইলে উচ্চ তাপমাত্রায় উহাকে উত্তপ্ত করিতে হয়। কিন্তু পটাসিয়াম ক্লোরেটের

সহিত অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া লইলে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণতাতেই পটাসিয়াম ক্লোরেট বিযোজিত হয় এবং অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। সুতরাং পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিযোজন ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের ওজন এবং সংযুতির কোন পরিবর্তন হয় না—উহা ক্লোরেটের বিযোজন ত্বরান্বিত করে। এইরূপ অনেক বিক্রিয়া আছে যাহাতে কোন কোন পদার্থ সামান্য পরিমাণে থাকিলে বিক্রিয়ার বেগ প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ বেগের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। কিন্তু ইহাতে ঐ পদার্থ বা পদার্থসমূহের ওজনের বা সংযুতির (composition) কোন পরিবর্তন হয় না। এই ঘটনাকে **অনুঘটন** বা **প্রভাবন** (catalysis) বলে, আর যে-পদার্থ বিক্রিয়ার বেগকে প্রভাবিত করে তাহাকে ঐ বিক্রিয়ার **অনুঘটক** বা **প্রভাবক** (catalyst) বলে। উপরিউক্ত বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। প্রভাবক কোন বিক্রিয়া ঘটাইতে (initiate) পারে না, উহা কেবল বিক্রিয়ার বেগকে প্রভাবিত করে।

অতএব, দেখা যাইতেছে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিবার মূলে সংস্পর্শ, তাপ, চাপ, শব্দ, তড়িৎ এবং আলোক ইত্যাদি এক বা একাধিক কারণ থাকে। আর বিক্রিয়কগুলির অণুর প্রকৃতি ( nature ) ছাড়া যে সকল কারণ বিক্রিয়াকে প্রভাবিত ( influence ) করে সেইগুলি হইল উষ্ণতা, চাপ, বিকিরণ, প্রভাবকের উপস্থিতি, বিক্রিয়কগুলির গাঢ়তা এবং উহাদের স্পর্শতলের পরিমাণ।

### 1-6. পদার্থের সনাক্তকরণ (Identification of matter) :

পদার্থকে উহার ধর্মাবলীর সাহায্যে আমরা সনাক্ত করিতে বা চিনিতে পারি। স্বাভাবিক চাপ ও তাপমাত্রায় পদার্থ কঠিন বা তরল বা গ্যাসীয় হইতে পারে। সুতরাং প্রথমেই এই ভৌত অবস্থা অনুযায়ী বিচিত্র পদার্থরাজিকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করিতে পারি। কঠিন পদার্থ সোনার রঙ উজ্জ্বল হলুদ, তামা লাল, গন্ধক হলুদ, তুঁতে নীল, নিশাদল ( অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ) সাদা ইত্যাদি। সুতরাং **বর্ণ** পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে সহায়ক, সোনার বিশিষ্ট উজ্জ্বল আভা ইহাকে চিনিতে সাহায্য করে। তরল পদার্থ পারদ রূপার মত সাদা, ব্রোমিন গাঢ় লাল, জল বর্ণহীন। হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি বর্ণহীন গ্যাস, ক্লোরিন গ্যাস সবুজাভ হলুদ, বেগুনী রঙ দেখিয়া আয়োডিন বাষ্পকে চিনিতে অসুবিধা হয় না। চোখে দেখিয়া অক্সিজেন, অ্যামোনিয়া ও

হাইড্রোজেন সালফাইডের পার্থক্য বুঝা যায় না। কিন্তু অ্যামোনিয়ার ঝাঁঝাল গন্ধ বা হাইড্রোজেন সালফাইডের পচা ডিমের গন্ধ উহাদের অস্তিত্বের পরিচায়ক। অক্সিজেনের কোন গন্ধ নাই। নারিকেল তৈল, কেরোসিন, পেট্রোল বা স্পিরিট ইত্যাদির গন্ধ হইতে উহাদের আমরা চিনিতে পারি। সাদা কোন কঠিন পদার্থ কর্পূর না ন্যাপথলিন তাহা উহার গন্ধ লইয়া বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং **গন্ধের** বৈচিত্র্য পদার্থকে চিনিতে সাহায্য করে। সাদা কোন পদার্থ ময়দা না চিনি তাহা উহার স্বাদ হইতে উপলব্ধি করিতে কষ্ট হয় না। কঠিন কোন পদার্থ খাদ্যলবণ না চিনি তাহা উহার স্বাদ হইতে বলিতে পারা যায়। লবণের স্বাদ নোন্‌তা আর চিনি মিষ্ট। অতএব, **স্বাদের** বৈচিত্র্য পদার্থ সনাক্তকরণের পক্ষে সহায়ক। বর্ণহীন, গন্ধহীন কোন তরল পদার্থ জল কিংবা গ্লিসারিন তাহা উহার স্বাদ হইতে বুঝিতে পারা যায়; কারণ গ্লিসারিনের একটি অল্প মিষ্ট স্বাদ আছে। **স্পর্শ** দ্বারাও ইহাদের পার্থক্য অনুভূত হয়, গ্লিসারিন সিরাপের ন্যায় তরল। কতকগুলি পদার্থ **আঘাতে** চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হয়। আবার এইরূপ পদার্থ আছে যাহাদের পিটাইয়া পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। যেমন সোনা, রূপা ইত্যাদিকে পিটাইয়া অতি পাতলা পাত তৈয়ারী করা যায়। কোন কোন পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে চৌম্বক পদার্থ বলে। আর যে-সকল পদার্থ চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় না উহাদিগকে অ-চৌম্বক পদার্থ বলে। লোহা, কোবাল্ট, নিকেল প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। তামা ইত্যাদির এই ধর্ম নাই। সুতরাং **চুম্বকের** সাহায্যে লোহা, কোবাল্ট বা নিকেলের অস্তিত্ব বুঝিতে পারা যায়। পদার্থের **দ্রবণীয়তা** অনেক সময় পদার্থকে সনাক্ত করিতে সাহায্য করে। খাদ্যলবণ, তুঁতে, চিনি ইত্যাদি জলে দ্রবণীয়; গন্ধক জলে অদ্রাব্য কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে দ্রবণীয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেট জলে বা কার্বন ডাইসালফাইডে দ্রাব্য নহে, কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্পৃক্ত জলে উহা দ্রবীভূত হয়। ইথার জলে তেমন দ্রবণীয় নহে। কিন্তু কোহল জলের সহিত যে কোন অনুপাতে মিশিতে পারে। বাস্তবতার বিচারে হাইড্রোজেন জলে প্রায় অদ্রাব্য, নাইট্রোজেন অতি স্বল্প দ্রবণীয়; কিন্তু হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া জলে সবিশেষ দ্রবণীয়। বিশুদ্ধ কঠিন এবং তরল পদার্থের যথাক্রমে **গলনাঙ্ক** এবং **স্ফুটনাঙ্ক** নির্দিষ্ট। অনেক ক্ষেত্রে পদার্থের স্বরূপ নির্ণয়ের পক্ষে ইহা বিশেষ সহায়ক হইয়া থাকে। জৈব যৌগের

ক্ষেত্রে ইহা একেবারে আবশ্যিক ; গলনাঙ্ক কঠিন পদার্থের এবং স্ফুটনাঙ্ক তরল পদার্থের সনাক্তকরণে সহায়তা করে।

উপরিউক্ত ধর্মাবলী অর্থাৎ পদার্থের ভৌত অবস্থা—স্বাদ, বর্ণ, গন্ধ, দ্রাব্যতা ইত্যাদি পদার্থের ভৌত ধর্মাবলীর [ রসায়ন, পৃঃ (i) এবং (ii) ] অন্তর্ভুক্ত ; এইগুলি পরীক্ষা করিতে পদার্থের মৌলিক পরিবর্তন ঘটে না।

কিন্তু কেবল ভৌত ধর্মাবলীর সাহায্যে পদার্থকে সঠিক বা সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করা যায় না। সুনির্দিষ্টভাবে সনাক্ত করিতে হইলে ভৌত ধর্মাবলীর পরে উহার রাসায়নিক ধর্মাবলী পরীক্ষা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে পরীক্ষণীয় পদার্থের উপর তাপের প্রভাব এবং অন্যান্য কতকগুলি সুনির্দিষ্ট পদার্থের যেমন অ্যাসিডসমূহের ক্রিয়ার ফলাফল নিরীক্ষা করা হয় অন্যান্য এই পদার্থরাজি যাহাদের সাহায্যে রসায়নাগারে পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করা হয় তাহাদিগকে সাধারণভাবে **বিকারক (reagent)** বলে।

তাপের প্রভাবে বিভিন্ন পদার্থের সাধারণতঃ বিভিন্ন রকম পরিবর্তন ঘটে। কোন কোন পদার্থের কেবল অবস্থাগত পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন পদার্থের প্রকৃতি নির্ণয়ে সহায়তা করে। লাল মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করিলে, বর্ণহীন গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয় এবং চকচকে ধাতব মারকারি পাওয়া যায়। নির্গত গ্যাসে শিখাহীন জ্বলন্ত শলাকা ধরিলে, শলাকাটি উজ্জ্বল শিখাসহ জলিয়া উঠে। উত্তাপে মারকিউরিক অক্সাইড ধাতব মারকারি এবং অক্সিজেনে বিযোজিত হয়। ফেরাস সালফাইডের ছোট ছোট কিছু টুকরা লইয়া উহার সহিত লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইলে পচা ডিমের দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস নির্গত হয়। দুর্গন্ধযুক্ত এই গ্যাসের নাম হাইড্রোজেন সালফাইড। কিন্তু ফেরাস সালফাইডের পরিবর্তে ধাতব লোহা লইয়া উক্ত পরীক্ষা করিলে গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয়। নির্গত গ্যাসে শিখাহীন জ্বলন্ত শলাকা ধরিলে গ্যাসটিই দপ্ করিয়া জলিয়া উঠে ; নির্গত গ্যাসটি হাইড্রোজেন। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইয়া উত্তপ্ত করিলে সবুজাভ হলুদ বর্ণের গ্যাস নির্গত হয় এবং বিরঞ্জক চূর্ণের ( ব্লিচিং পাউডার ) সদৃশ গন্ধ পাওয়া যায় ; নির্গত গ্যাসটি ক্লোরিন। কিন্তু পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশাইলে স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই ক্লোরিন নির্গত হয় ; এক্ষেত্রে তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। খাদ্য লবণের জলীয়

দ্রবণের সহিত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মিশাইলে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে। অধঃক্ষিপ্ত এই পদার্থ সিলভার ক্লোরাইড। খাদ্যলবণের পরিবর্তে সোডিয়াম সালফেট লইয়া এই পরীক্ষা করিলে কোন অধঃক্ষেপ পড়ে না। পূর্বোক্ত ধর্মাবলী পরীক্ষা করিতে প্রতি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পদার্থ বা পদার্থসমূহের মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইতে হইয়াছে। প্রথম দৃষ্টান্তটির কথায় ফিরিয়া আসা যাউক ; মারকারি, অক্সিজেন আর মূল পদার্থ মারকিউরিক অক্সাইড একই জিনিস নহে। সুতরাং উল্লিখিত ধর্মাবলী সংশ্লিষ্ট পদার্থরাজিরর রাসায়নিক ধর্মের [ রসায়ন, পৃঃ (ii)] অন্তর্ভুক্ত। ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড কালো এবং জলে অদ্রাব্য ইহাই ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের পরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট নহে। উহার যথাযথ পরিচয় পাইতে হইলে উহার রাসায়নিক ধর্মাবলী যেমন গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সহিত ইহাকে উত্তপ্ত করিলে ক্লোরিন নামক গ্যাস নির্গত হয় ইত্যাদিও জানা প্রয়োজন। অতএব, ভৌত বা রাসায়নিক কোন এক রকমের ধর্মসমূহ দ্বারা একটি পদার্থের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করা যায় না। উভয় রকমের ধর্মাবলীর সামগ্রিক বিচারের দ্বারাই কেবল পদার্থের সুনিশ্চিত সনাক্তকরণ সম্ভব।

**1-7. বিশুদ্ধ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ** ( Classification of pure substances ): বিশুদ্ধ পদার্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—মৌলিক পদার্থ বা মৌল ( element ) এবং যৌগিক পদার্থ বা যৌগ ( compound )।

পৃথিবীর এত বিপুল ও বিচিত্র যে-বস্তুসম্ভার উহারা উপাদানগতভাবে মাত্র কিঞ্চিৎ অধিক একশত স্বতন্ত্র রকমের ( distinct species ) পদার্থ দ্বারা নানারূপে গঠিত। এই যে শতাধিক স্বতন্ত্র রকমের পদার্থ ইহাদিগকে **মৌলিক** ( element ) পদার্থ বলে। কোন রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা ইহাদিগকে পৃথক্ গুণবিশিষ্ট একাধিক সরলতর পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। অতএব, যে পদার্থকে কোন প্রকার রাসায়নিক বিশ্লেষণ দ্বারা পৃথক্ গুণবিশিষ্ট দুই বা ততোধিক পদার্থে বিশ্লিষ্ট করা যায় না, তাহাকে মৌলিক পদার্থ বলে। সুতরাং মৌলিক পদার্থগুলি একটিমাত্র উপাদান দ্বারা গঠিত। যথা—সোনা, রূপা, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি।

জলের সহিত কয়েক ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া উহার ভিতর তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে দেখা যায় যে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন নামক দুইটি গ্যাসে জল বিশ্লিষ্ট হয়। হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের ধর্ম পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং জলের ধর্মের সহিত উহাদের ধর্মের কোন মিল নাই।

জল একটি যৌগিক পদার্থ। অতএব, বলা যায় যে পদার্থ বিশ্লেষণের ফলে দুই বা ততোধিক সরলতর পদার্থ বা মৌলিক পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে **যৌগিক পদার্থ** বা **যৌগ** ( compound ) বলে। যৌগিক পদার্থের সংজ্ঞা অন্যভাবেও দেওয়া যাইতে পারে। যদি দুই বা ততোধিক মৌলিক পদার্থ কোন নির্দিষ্ট ওজনের অনুপাতে পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে নূতন গুণবিশিষ্ট পদার্থ উৎপন্ন করে তখন উহাকে রাসায়নিক সংযোগ বলে এবং নূতন পদার্থকে যৌগিক পদার্থ বলে। জল, লবণ ইত্যাদি যৌগিক পদার্থ।

আবার দেখ, পদার্থমাত্রই উহার অণুর সমষ্টি। হাইড্রোজেনের একটি অণুকে ভাঙ্গিতে পারিলে উহা হইতে দুইটি একই প্রকারের পরমাণু অর্থাৎ দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু পাওয়া যাইবে। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের একটি অণুকে ভাঙ্গিলে উহা হইতে দুইটি বিভিন্ন পরমাণু—একটি কার্বন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু পাওয়া যাইবে। এই আলোচনা হইতে বলা যায় : **মৌলিক পদার্থ** হইল এইরূপ পদার্থ যাহাতে একই প্রকারের পরমাণু আছে, আর যাহা একাধিক বিভিন্ন ধরনের পরমাণুর সমাবেশে গঠিত তাহা **যৌগিক পদার্থ**।

ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের বিচারে মৌলিক পদার্থগুলিকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। এক শ্রেণীকে বলা হয় **ধাতু** ( metal ) এবং অপর শ্রেণীকে বলা হয় **অ-ধাতু** ( non-metal )।

স্মরণাতীত কাল হইতেই মানুষ নানা প্রয়োজনে কতকগুলি পদার্থ ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। এই পদার্থগুলি বেশ মজবুত, কিন্তু ভঙ্গুর নহে ; ইহাদের পিটাইয়া পাত বা টানিয়া তার তৈয়ারী করা যায় বা গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া বিভিন্ন আকৃতির বস্তু তৈয়ারী করা যায়। সোনা এবং তামার ব্যবহারই সম্ভবত মানুষ প্রথম জানিয়াছিল। তামা এবং টিনের সংকর ব্রোঞ্জের ব্যবহার খ্রীষ্টের জন্মের অনেক পূর্ব হইতেই মানুষ জানিত। প্রাচীন রোমে সীসার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। তাঁহারা জল পরিবহনের পাইপে সীসা ব্যবহার করিতেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে লোহার যে প্রাচীন স্তম্ভগুলি আছে উহা প্রাচীন ভারতীয়রা যে লোহার ব্যবহার জানিতেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। প্রকৃতপক্ষে যে সকল দেশে প্রাচীন সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তথায় যে নানা রকমের পাত্র, মূর্তি বা খোদাই করার কাজের জন্য পাত বা চাদর প্রস্তুতিতে তামা, পিতল, ব্রোঞ্জ, টিন, রূপা, সোনা, লোহা ইত্যাদি ব্যবহৃত হইত তাহার যথেষ্ট নিদর্শন আছে। যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম থাকার ফলে এই পদার্থগুলি মানব

সভ্যতার অঙ্গ বা উহার উন্নতি বিধানে অপরিহার্য বলিয়া বোধ হইত, উহা হইল ধাতুর ধর্ম।

আজ পর্যন্ত যে শতাধিক স্বতন্ত্র রকমের পদার্থ জানা গিয়াছে উহাদের মধ্যে বেশীর ভাগই হইল ধাতু। যাহা হউক, এই শ্রেণীবিভাগ সুবিধাজনক হইলেও একেবারে নিখুঁত বিভাজন সম্ভব নহে। কারণ, এরকম কতকগুলি মৌলিক পদার্থ আছে যাহারা ধাতু এবং অ-ধাতু উভয়জাতীয় ধর্মই অল্প-বিস্তর প্রদর্শন করে। এই শ্রেণীর মৌলিক পদার্থগুলিকে **ধাতুকল্প** ( metalloid ) বলে। আর্সেনিক, অ্যান্টিমনি এই শ্রেণীর মৌলের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

## ধাতু ও অ-ধাতুর তুলনা

| ধাতু | অ-ধাতু |
|---|---|
| (i) ইহা কঠিন এবং ইহার ঔজ্জ্বল্য আছে—যাহাকে বলা হয় ধাতব ঔজ্জ্বল্য ( metallic lustre )।<br>যেমন—সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি কঠিন পদার্থ এবং ইহাদের ঔজ্জ্বল্য আছে।<br>ব্যতিক্রম :—পারদ ( mercury ) ধাতু হইলেও তরল। | (i) ইহা সাধারণতঃ তরল বা গ্যাসীয় এবং ইহা অনুজ্জ্বল।<br>যেমন—ব্রোমিন একটি তরল পদার্থ ; হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদি বর্ণহীন গ্যাস।<br>ব্যতিক্রম :—আয়োডিন, ফস্‌ফরাস, সালফার প্রভৃতি অ-ধাতু হইলেও কঠিন ; আয়োডিনের ধাতুর ন্যায় ঔজ্জ্বল্যও আছে। |
| (ii) ধাতু তাপ ও বিদ্যুতের উৎকৃষ্ট পরিবাহক।<br>যথা—তামা, রূপা, অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি তাপ ও বিদ্যুতের উত্তম পরিবাহক।<br>এই হিসাবে রূপা সর্বোৎকৃষ্ট এবং তামার স্থান তাহার পরেই।<br>বাড়ীতে বা রাস্তায় তড়িৎ-পরিবহনের জন্য যে তার খাটান হয় উহা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের তৈয়ারী। | (ii) অ-ধাতু সাধারণত তাপ ও বিদ্যুৎ-এর কুপরিবাহী।<br>এক টুকরা কাঠ-কয়লাকে আগুনের ভিতর ধরিয়া উত্তপ্ত করিয়া লাল (redness) করা যাইতে পারে। কিন্তু ধাতুর তৈয়ারী মুদ্রাকে ( coin ) আগুনে ধরিলে উহা কিছুক্ষণের মধ্যেই এত উত্তপ্ত হয় যে উহাকে ধরিয়া রাখা যায় না।<br>ব্যতিক্রম :—গ্রাফাইট যদিও অ-ধাতু তথাপি তাপ ও বিদ্যুতের সুপরিবাহক। |

| ধাতু | অ-ধাতু |
|---|---|
| (iii) ধাতু সাধারণতঃ ভারী। যেমন—লেড, মারকারি ইত্যাদি।<br>ব্যতিক্রম : সোডিয়াম, পটাসিয়াম ইত্যাদি ধাতু জল অপেক্ষা হালকা। | (iii) কঠিন অ-ধাতুসমূহ সাধারণতঃ হাল্‌কা।<br>ব্যতিক্রম :—আয়োডিন অ-ধাতু হইলেও কোন কোন ধাতু অপেক্ষা ভারী। |
| (iv) ধাতু প্রসারশীল (ductile) এবং নমনীয় (malleable) ; ইহাকে পিটাইয়া পাত এবং টানিয়া তার তৈয়ারী করা যায়।<br>ধাতুকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিলে বিশেষ একরকম শব্দের সৃষ্টি হয় যাহাকে ধাতব শব্দ বলা হয়।<br>ব্যতিক্রম :—অ্যাণ্টিমনি ও বিসমাথ ধাতু হইলেও ভঙ্গুর। | (iv) কঠিন অ-ধাতুসমূহ ভঙ্গুর (brittle) ; ইহারা কোন ধাতব শব্দ সৃষ্টি করিতে পারে না। আঘাতে ইহারা ভাঙ্গিয়া যায়। |
| (v) ধাতুগুলি অতি উচ্চ উষ্ণতায় গলে। | (v) অ-ধাতুর গলনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত কম।<br>ব্যতিক্রম :—কার্বন, সিলিকন প্রভৃতি অ-ধাতু হইলেও বেশী উষ্ণতায় গলে। |
| (vi) ধাতুসমূহ তড়িৎ-ধনাত্মক, তড়িৎ-বিশ্লেষণে ঋণাত্মক মেরু তথা ক্যাথোডে ধাতু জমা হয়। | (vi) অ-ধাতু তড়িৎ-ঋণাত্মক, ইহারা ধনাত্মক মেরু তথা অ্যানোডে মুক্ত হয়।<br>ব্যতিক্রম :—হাইড্রোজেন অ-ধাতু হইলেও তড়িৎ-ধনাত্মক এবং ক্যাথোডে মুক্ত হয়। |
| (vii) ধাতুর অক্সাইড সাধারণতঃ ক্ষারকীয় গুণবিশিষ্ট, অম্লের সহিত বিক্রিয়ায় লবণ গঠন করে। | (vii) অ-ধাতুর অক্সাইড সাধারণতঃ আম্লিক গুণবিশিষ্ট এবং জলে দ্রবণীয় হইলে জলের সহিত বিক্রিয়ায় অম্ল তথা অ্যাসিড গঠন করে। অ-ধাতব অক্সাইড কখনও ক্ষারকীয় প্রকৃতির হয় না। |

| ধাতু | অ-ধাতু |
|---|---|
| (viii) কোন কোন ধাতু অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করে ; ধাতুর লবণ গঠিত হয় এবং হাইড্রোজেন নির্গত হয়। যেমন, লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডে জিঙ্ক দ্রবীভূত হয়, জিঙ্ক সালফেট নামক লবণ গঠিত হয় এবং হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয়। | (viii) অ্যাসিডের প্রতি অ-ধাতুর আসক্তি কম। যদি বা অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়া করে লবণ গঠন করে না। |
| (ix) কয়েকটি মাত্র ধাতু হাইড্রোজেনের সহিত হাইড্রাইড নামক যৌগ গঠন করে, যেমন $NaH$, $CaH_2$ ইত্যাদি। এই হাইড্রাইডগুলি সুস্থির প্রকৃতির নহে। জল ইহাদের সহজেই বিযোজিত করে। | (ix) অ-ধাতুর হাইড্রাইডসমূহ সাধারণতঃ সুস্থির প্রকৃতির। যেমন, $NH_3$, $H_2O$ ইত্যাদি। |

পরিশেষে ইহা উল্লেখযোগ্য যে-কোন এক বা একাধিক ধর্মের বিচারে একটি মৌলিক পদার্থ ধাতু বা অ-ধাতু বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু ধর্মাবলীর সামগ্রিক বিচারে একটি মৌলিক পদার্থ কোন্ শ্রেণীভুক্ত তাহাই বিবেচ্য বিষয়।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে বিশুদ্ধ পদার্থের শ্রেণীবিন্যাস নিম্নের সারণীতে দেখান হইল :

**বিশুদ্ধ পদার্থ**
( স্বর্ণ, অক্সিজেন, আর্সেনিক, জল, অ্যাসিড )

- মৌলিক পদার্থ ( স্বর্ণ, অক্সিজেন, আর্সেনিক )
  - ধাতু ( স্বর্ণ )
  - ধাতুকল্প ( আর্সেনিক )
  - অ-ধাতু ( অক্সিজেন )
- যৌগিক পদার্থ ( জল, অ্যাসিড )

## প্রশ্নাবলী

1. পদার্থ বলিতে কি বুঝায়? উহার বিভিন্ন অবস্থা কি কি? উপযুক্ত উদাহরণ দাও।
2. ভৌত এবং রাসায়নিক পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য কি কি? উপযুক্ত উদাহরণসহ উত্তর লিখ।
3. ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মাবলীর সাহায্যে কিরূপে পদার্থের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় তাহা কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝাইয়া দাও।
4. ধাতুর সহিত অ-ধাতুর তুলনা কর।
5. রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইবার উপায় এবং যে-সকল কারণ বিক্রিয়াকে প্রভাবিত করে সে-সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।
6. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কোন্‌টি রাসায়নিক এবং কোন্‌টি ভৌত তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও :—
   (i) লোহকে বায়ুতে রাখিয়া দিলে উহার উপর বাদামী রঙের আস্তরণ পড়ে,
   (ii) প্লাটিনাম তারে তাপ প্রয়োগ করিলে উহা শ্বেততপ্ত হয় এবং আলোক বিকিরণ করে,
   (iii) কর্পূর বাতাসে রাখিয়া দিলে উহা ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়,
   (iv) তুঁতের দ্রবণে লোহ ডুবাইলে লোহের উপর তামার আবরণ পড়ে,
   (v) শুষ্ক চুনে জল ঢালিলে চুনের স্তূপ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম গুঁড়ায় পরিণত হয়।
7. পার্থক্য নির্দেশ করিয়া উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ :
   (i) মৌলিক পদার্থ ও যৌগিক পদার্থ, (ii) তাপশোষক বিক্রিয়া ও তাপোৎপাদক বিক্রিয়া।

## সংক্ষিপ্ত বিষয়মূলক পরীক্ষার ( objective type test ) প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

### A. Alternate response type

(i) *True or False type*

(a) প্রভাবক কোন বিক্রিয়া ঘটাইতে পারে না, উহা কেবল বিক্রিয়ার বেগকে প্রভাবিত করে। —

(b) অ-ধাতুর অক্সাইডসমূহ সাধারণত ক্ষারকীয়-প্রকৃতির হইয়া থাকে। —

(c) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক নয় তাপ শোষিত হয় আর নয় তাপ উদ্ভূত হয়। —

(ii) *Yes or No type*

(a) গ্যাসীয় পদার্থের কি নির্দিষ্ট আকার ( বা আকৃতি ) এবং আয়তন আছে? —

(b) এইরূপ কোন মৌল কি আছে যাহা ধাতু এবং অ-ধাতু উভয়েরই কিছু কিছু ধর্ম প্রদর্শন করে? —

## B. Recall type

(i) যে পদার্থ বিশ্লেষণে দুই বা ততোধিক সরলতর পদার্থ পাওয়া যায় তাহাকে — পদার্থ বলে।

(ii) যে-পরিবর্তনে পদার্থের সংযুতির কোন পরিবর্তন ঘটে না তাহাকে — পরিবর্তন বলে।

(iii) দ্রবণে পদার্থসমূহ — সংস্পর্শে আসে বলিয়া কখনও কখনও অতি সহজেই বিক্রিয়া ঘটে।

## C. Multiple choice type

(i) *Elimination type* [ **নির্দেশ :** অপ্রাসঙ্গিক অংশ বা অংশসমূহ কাটিয়া বাদ দাও। ]

(a) অ্যান্টিমনি হইল একটি **ধাতু / ধাতুকল্প / অ-ধাতু**।

(b) গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট **আকার / আয়তন / ওজন** আছে।

(ii) *Selection type* [ **নির্দেশ :** ডান দিকের শব্দগুলি হইতে উপযুক্ত শব্দ নির্বাচন করিয়া বাম দিকের বাক্যগুলির শূন্যস্থান পূর্ণ কর। ]

| | |
|---|---|
| (a) তরলের নির্দিষ্ট — এবং ওজন আছে।<br>(b) পরিচিত — মধ্যে জল, খাদ্যলবণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।<br>(c) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি কয়েকটি অতি পরিচিত —।<br>(d) ধাতু ও অ-ধাতু হিসাবে মৌলসমূহের নিখুঁত — সম্ভব নহে।<br>(e) যে-বিক্রিয়ায় তাপ উদ্ভূত হয় তাহাকে — বিক্রিয়া বলে। | তাপোৎপাদক, মৌল, আয়তন, শ্রেণীবিভাগ, যৌগসমূহের। |

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

## দ্রবণ ও দ্রাব্যতা

## ( Solution and Solubility )

জলের একটি চিত্তাকর্ষক ধর্ম হইল বহু পদার্থকে উহার দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতা। সমুদ্র হইল একটি জলীয় দ্রবণ, হাজার রকমের উপাদান যেমন ধাতু ও অ-ধাতুর আয়ন, জটিল অজৈব আয়ন এবং বিভিন্ন জৈব পদার্থ ইত্যাদি ইহাতে বিদ্যমান। এই দ্রবণেই প্রথম সজীব পদার্থের আবির্ভাব ঘটে এবং ইহা হইতে উহাদের দেহের বৃদ্ধি ও জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় আয়ন এবং অণুসমূহ উহারা আহরণ করিয়াছিল। বস্তুত জীবন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে দ্রবণসমূহের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।

**2-1. দ্রবণ ( Solution ) :** একটি পরীক্ষা-নলে খানিকটা জল লইয়া উহাতে অল্প পরিমাণ খাদ্যলবণ (বা চিনি) যোগ করিয়া পরীক্ষা-নলটি ভালভাবে ঝাঁকাইলে দেখা যায় যে খাদ্যলবণ ( বা চিনি ) অদৃশ্য হইয়া যায়।—স্বাদ হইতে জলে ইহাদের অস্তিত্ব বুঝা যায়। চিনি বা খাদ্যলবণের পরিবর্তে বালি লইয়া উপরোক্ত প্রক্রিয়াটি নিষ্পন্ন করিলে, দেখা যায় যে খানিকটা বালি জলের ভিতর ভাসমান অবস্থায় থাকে এবং খানিকটা পরীক্ষা-নলের তলদেশে জমা হয়। এক্ষেত্রে বলা হয় যে খাদ্যলবণ ( বা চিনি ) জলে দ্রবীভূত হইয়াছে এবং একটি **দ্রবণ** তৈয়ারী হইয়াছে, কিন্তু জলে বালি দ্রবীভূত হয় নাই। অর্থাৎ, খাদ্যলবণ বা চিনি জলে দ্রাব্য কিন্তু বালি অদ্রাব্য। প্রকৃতপক্ষে কোন পদার্থই একেবারে সম্পূর্ণরূপে অদ্রাব্য নহে। বালিও কিছু পরিমাণে জলে দ্রবীভূত হয়। কিন্তু এই পরিমাণ এত কম যে ইহাকে অদ্রাব্য বলা হয়। 100 গ্রাম জল যদি কোন পদার্থের 0·01 গ্রাম অপেক্ষা কম পরিমাণকে দ্রবীভূত করে, তবে সাধারণভাবে ঐ পদার্থকে অদ্রাব্য (insoluble) বলা হয়। পূর্বোক্ত দ্রবণের কথা মনে কর। এক্ষেত্রে জল এবং লবণ (বা চিনি) ওতঃপ্রোতভাবে মিশিয়া গিয়াছে এবং দ্রবণের যে কোন অংশে লবণ ( বা চিনি ) ও জলের অনুপাত এক, অর্থাৎ ইহা সমসত্ত্ব। যে পদার্থ দ্রবীভূত হয় তাহাকে বলা হয় **দ্রাব** ( solute ) এবং যে মাধ্যমে দ্রাব দ্রবীভূত হয় অর্থাৎ যে-পদার্থ দ্রবীভূত করে তাহাকে বলা হয় **দ্রাবক** ( solvent )। এক্ষেত্রে জল দ্রাবক এবং লবণ ( বা চিনি ) দ্রাব।

∴ দ্রাব+দ্রাবক=দ্রবণ।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে তোমাদের হয়ত দ্রবণ সম্পর্কে কিছুটা প্রাথমিক ধারণা জন্মিয়াছে। এখন দ্রবণের সঠিক সংজ্ঞা তোমরা সহজেই বুঝিতে পারিবে। দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণকে **দ্রবণ** বলে। অন্য কোনরূপ উল্লেখ না থাকিলে 'দ্রবণ' বলিতে সাধারণতঃ জলীয় দ্রবণকে বুঝান হইয়া থাকে, তবে জলই যে কেবল একমাত্র দ্রাবক এমন কোন কথা নাই। একটি পদার্থ জলে অদ্রাব্য হইলেও, অপর কোন তরল পদার্থে দ্রবীভূত হইতে পারে। জলে আয়োডিন খুব কম দ্রাব্য কিন্তু অ্যালকোহলে উহা অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রাব্য। জলে গন্ধক অদ্রাব্য কিন্তু কার্বন ডাই-সালফাইডে উহা দ্রবীভূত হয়। আবার দ্রবণটি যে সকল সময় তরল হইবে এমনও কোন কথা নাই। উহা ( দ্রবণ ) কঠিন বা গ্যাসীয়ও হইতে পারে। বায়ু হইল প্রধানত নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমসত্ত্ব মিশ্রণ। সুতরাং বায়ুকে **গ্যাসীয় দ্রবণ** ( gaseous solution ) বলা যাইতে পারে। প্যালাডিয়াম একটি ধাতু, সাধারণ উষ্ণতায় ইহা কঠিন ( solid ) এবং ইহা হাইড্রোজেন গ্যাসকে দ্রবীভূত করিতে পারে। গলিত স্বর্ণের ভিতর রৌপ্য যোগ করিলে ঐ রোপ্য স্বর্ণের ভিতর দ্রবীভূত হয় এবং উহাকে শীতল করিলে একটি **কঠিন দ্রবণ** (solid solution) উৎপন্ন হয়। ইথাইল অ্যালকোহল একটি তরল পদার্থ, ইহা জলের সহিত যে কোন অনুপাতে মিশ্রিত হইয়া জল ও কোহলের ( ইথাইল অ্যালকোহল ) একটি সমসত্ত্ব মিশ্রণ অর্থাৎ দ্রবণ গঠন করিতে পারে। এই সকল উদাহরণ হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছ যে 'দ্রবণ' বলিলেই যে 'তরলে কঠিনের দ্রবণ' বুঝাইবে তাহা নহে। এখন উপরোক্ত জল ও কোহলের সমসত্ত্ব মিশ্রণের (দ্রবণ) কথা স্মরণ কর। এক্ষেত্রে দ্রাবক কে ?—জল না কোহল ? প্রকৃতপক্ষে দ্রাবক এবং দ্রাবের মধ্যে কোন বাস্তব পার্থক্য নাই, শব্দ দুইটি সুবিধামত ব্যবহৃত হয়। দ্রবণে যে-উপাদান পদার্থটির পরিমাণ অধিকতর সাধারণতঃ তাহাকে **দ্রাবক** এবং অপর উপাদানকে **দ্রাব** বলা হয়। কিন্তু উপাদান পদার্থ দুইটির একটি যদি তরল পদার্থ হয় তাহা হইলে তরলটিকে দ্রাবক হিসাবে গণ্য করাই প্রচলিত রীতি এবং এখানে আলোচনা মূলত এই ধরনের দ্রবণের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখা হইয়াছে।

সামান্য পরিমাণ জলে অল্প অল্প করিয়া চিনি যোগ কর এবং নাড়িতে থাক। প্রথম প্রথম চিনি অতি দ্রুত দ্রবীভূত হইয়া যায় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে চিনি আর দ্রবীভূত হয় না, উহা পাত্রের তলদেশে জমিতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায় ঐ পরিমাণ জলের পক্ষে যতটা চিনি দ্রবীভূত করা সম্ভব ততটা দ্রবীভূত হইয়াছে।

এক্ষেত্রে বলা হয় পরীক্ষাকালীন উষ্ণতায় দ্রবণটি চিনি দ্বারা সম্পৃক্ত হইয়াছে ; জলের পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে আরও চিনি দ্রবীভূত হয়। আবার জল যোগ না করিয়া দ্রবণে তাপ প্রয়োগ করিলেও আরও খানিকটা চিনি দ্রবীভূত হয়, অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে যে-পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হয় উষ্ণতা বৃদ্ধির সহিত তাহার পরিমাণও সাধারণতঃ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্রবণের উষ্ণতা কমাইলে দেখা যায় যে, দ্রবণের উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণ হইতে দ্রবীভূত পদার্থ নির্দিষ্ট পরিমাণে পৃথক্ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে দ্রবণীয়তা হ্রাস পায়। সুতরাং কোন্ পদার্থ কতটা দ্রবীভূত হয় তাহা নিরূপণ করিতে হইলে দ্রাবকের পরিমাণ জানা যেমন প্রয়োজন পরীক্ষাকালীন উষ্ণতা জানাও সেইরূপ একেবারে অপরিহার্য। ইহাও পরীক্ষিত সত্য যে নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রাবকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বিভিন্ন পদার্থ সাধারণতঃ বিভিন্ন পরিমাণে দ্রবীভূত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে এমন কতকগুলি পদার্থ আছে যেমন খাদ্য-লবণ যাহা ঠাণ্ডা এবং গরম জলে প্রায় সমপরিমাণে দ্রাব্য ; অর্থাৎ ইহার দ্রাব্যতা উষ্ণতার উপর প্রায় নির্ভর করে না বলিলেই চলে। আবার এইরূপ কিছু পদার্থও আছে যাহা গরম জলে অপেক্ষাকৃত কম দ্রাব্য ; উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়। ক্যালসিয়াম সালফেটের দ্রাব্যতা 40°C উষ্ণতা পর্যন্ত ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং উষ্ণতা আরও বৃদ্ধির সাথে সাথে উহা হ্রাস পায়।

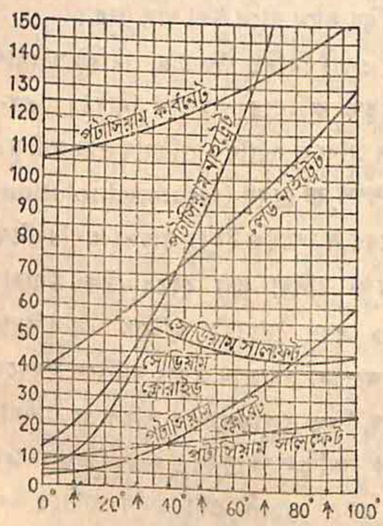
সুতরাং, ইহা বুঝিতে পারিতেছ যে একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, নির্দিষ্ট পরিমাণ কোন দ্রাবকের কোন পদার্থকে দ্রবীভূত করিবার ক্ষমতাও নির্দিষ্ট। এখন নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে সর্বাধিক পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হইয়া যে-দ্রবণ তৈয়ারী করে তাহাকে **সম্পৃক্ত দ্রবণ** (saturated solution) বলা হয় ; অতিরিক্ত ( অদ্রবীভূত ) দ্রাবের সংস্পর্শেও ইহার গাঢ়তা অপরিবর্তিত থাকিবে। এই দ্রবণ ততক্ষণই সম্পৃক্ত বলিয়া গণ্য হইবে যতক্ষণ উষ্ণতায় কোন পরিবর্তন হইবে না। সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈয়ারী করিতে যে-পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত করা প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা কম দ্রাব দ্রবণে থাকিলে দ্রবণকে **অসম্পৃক্ত** ( unsaturated ) বলা হয়, কিন্তু কোনওভাবে অধিকতর পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত অবস্থায় থাকিলে দ্রবণকে **অতিপৃক্ত দ্রবণ** ( supersaturated solution ) বলা হয়। অসম্পৃক্ত দ্রবণে আরও দ্রাব যোগ করিলে উহা দ্রবীভূত হয় এবং দ্রবণের গাঢ়তা বৃদ্ধি পায় ; দ্রাব ততক্ষণই দ্রবীভূত হইবে যে-পর্যন্ত না অসম্পৃক্ত দ্রবণটি সম্পৃক্ত দ্রবণে পরিণত হয়। অতএব কোন

দ্রাবকে দ্রাবের পরিমাণ একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পরিবর্তন করা যায়। দ্রাব কম পরিমাণে থাকিলে দ্রবণকে **লঘু ( dilute ) দ্রবণ**, আর অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণে থাকিলে উহাকে **গাঢ় ( concentrated ) দ্রবণ** বলে।

**2-2. দ্রাব্যতা ( Solubility ):** কোনও নির্দিষ্ট উষ্ণতায় সর্বাধিক যে-পরিমাণ পদার্থ 100 গ্রাম ওজনের দ্রাবকে দ্রবীভূত হইয়া একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈয়ারী করে সেই উষ্ণতায় গ্রামে ব্যক্ত ঐ পরিমাণ সূচককে ( ঐ দ্রাবকে ) উক্ত পদার্থের দ্রাব্যতা ( solubility ) বলা হয়। অর্থাৎ $t$°C তাপমাত্রায় $m$ গ্রাম দ্রাব যদি $y$ গ্রাম দ্রাবককে সম্পৃক্ত করে, তাহা হইলে ঐ দ্রাবের উক্ত দ্রাবকে $t$°C তাপমাত্রায় দ্রাব্যতা $= \frac{100m}{y}$

40°C উষ্ণতায় জলে লেড নাইট্রেটের দ্রাব্যতা 70,—ইহা হইতে বুঝা যায় যে 40°C উষ্ণতায় 70 গ্রাম লেড নাইট্রেট 100 গ্রাম জলে দ্রবীভূত হইয়া একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ উৎপন্ন করে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দ্রাবকের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটিলে দ্রাবের ( solute ) দ্রাব্যতারও পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। কারণ, একই পরিমাণ কোন নির্দিষ্ট দ্রাবকে বিভিন্ন উষ্ণতায় কোন এক পদার্থের সম্পৃক্ত দ্রবণ প্রস্তুত করিতে বিভিন্ন পরিমাণ পদার্থ দ্রবীভূত করিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় দ্রাবের এই পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকে। এইজন্য কোন পদার্থের দ্রাব্যতা প্রকাশ করিবার সময় উষ্ণতার উল্লেখ একেবারে অপরিহার্য।




দ্রাব্যতা-লেখ

উষ্ণতাকে ভুজ (abscissae), দ্রাবের দ্রাব্যতাকে কোটি (ordinates) ধরিয়া ছক কাগজে ( graph paper ) লৈখিক চিত্র ( graph ) অঙ্কন করিলে উৎপন্ন লৈখিক চিত্রকে **দ্রাব্যতা-লেখ** ( solubility curve ) বলা হয়। অতএব, যে লৈখিক-চিত্র উষ্ণতার সহিত পদার্থের দ্রাব্যতার পরিবর্তন নির্দেশ করে তাহাকে ঐ পদার্থের **দ্রাব্যতা-লেখ** বলে। সংলগ্ন চিত্রে ( জলে )

কয়েকটি লবণের দ্রাব্যতা-লেখ কিরূপ তাহা দেখান হইয়াছে। বিভিন্ন উষ্ণতা এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন দ্রাব্যতা হইতে বিভিন্ন বিন্দু নির্দেশ করিয়া ঐ বিন্দুগুলি যোগ করিয়া লেখ-চিত্র অঙ্কন করা হইয়াছে। স্পষ্টতই বিভিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা-লেখ বিভিন্ন রকমের। দ্রাব্যতা-লেখ হইতে—প্রথমত, একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোন দ্রাবের দ্রাব্যতা কত তাহা জানা যায়; দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন পদার্থের দ্রাব্যতা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক ধারণা জন্মে; তৃতীয়ত, কোন পদার্থের উচ্চতর উষ্ণতার সম্পৃক্ত দ্রবণ কোন নির্দিষ্ট উষ্ণতা পর্যন্ত শীতল করিলে দ্রবণ হইতে কতটা দ্রাব পৃথক হইয়া যায় তাহা হিসাব করা যায়; চতুর্থত, কোন দ্রবণে একাধিক দ্রাব থাকিলে দ্রবণকে বাষ্পীভূত করিবার সময় কোন্ পদার্থটি দ্রবণ হইতে প্রথমে পৃথক্ হইয়া ( deposit ) যাইবে তাহা জানা যায়।

## প্রশ্নাবলী

1. 'দ্রাবক', 'দ্রাব' এবং 'দ্রবণ' বলিতে কি বুঝ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।
2. সম্পৃক্ত, অতিপৃক্ত এবং অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলিতে কি বুঝায় তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
3. 'দ্রাব্যতা' বলিতে কি বুঝায়? কোন দ্রাবের দ্রাব্যতা বিবৃত করিতে উষ্ণতা উল্লেখ করা কি অপরিহার্য?
4. দ্রাব্যতার সংজ্ঞা লিখ। দ্রাব্যতা-লেখ বলিতে কি বুঝ? উহাদের উপযোগিতা বিবৃত কর।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের নমুনা

### 1. Alternate response type

*True or False type*

(i) দুই বা ততোধিক পদার্থের সমসত্ত্ব মিশ্রণকে দ্রবণ বলে। —

(ii) দ্রবণের সংযুতি অপরিবর্তনীয়। —

(iii) বায়ুকে একটি গ্যাসীয় দ্রবণ বলা যাইতে পারে। —

### 2. Completion type

নির্দিষ্ট — (a) কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ — (*a*)

দ্রাবকে — (b) পরিমাণ দ্রাব দ্রবীভূত হইয়া — (*b*)

যে দ্রবণ তৈয়ারী করে তাহাকে — (c) দ্রবণ — (*c*)

বলা হয়; অতিরিক্ত — (d) সংস্পর্শেও — (*d*)

ইহার — (e) কোন পরিবর্তন হইবে না। — (*e*)

### 3. Recall type

(i) প্রকৃতপক্ষে দ্রাবক এবং দ্রাবের মধ্যে কোন — পার্থক্য নাই। —

(ii) যে-লৈখিক চিত্র উষ্ণতার সহিত পদার্থের দ্রাব্যতার পরিবর্তন নির্দেশ করে তাহাকে ঐ পদার্থের — বলে। —

## তৃতীয় অধ্যায়ঃ চিহ্ন, সংকেত, যোজ্যতা ও সমীকরণ
## ( Symbols, Formulae, Valency and Equations )

**3-1. চিহ্ন ও সংকেত ( Symbols and Formulae ) :** যাহা দ্বারা মৌলিক পদার্থের নাম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয় তাহাকে **চিহ্ন** ( symbol ) বলে ; অর্থাৎ **মৌলিক পদার্থের নামের সংক্ষেপ বা সাংকেতিক পরিচয়কে চিহ্ন বলে।**

পদার্থের নাম ও উহার অন্তর্গত অণু-পরমাণুর সংখ্যা ভাষায় প্রকাশ করিয়া পদার্থের রাসায়নিক পরিচিতি প্রদান করা খুবই অসুবিধাজনক। সৌভাগ্যক্রমে 1814 খ্রীষ্টাব্দে বা উহারও কিছু পূর্বে ( সম্ভবতঃ 1811 খ্রীষ্টাব্দে ) সুইডিশ বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস একটি সহজ পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। প্রতীক বা চিহ্ন প্রকাশের এই পদ্ধতিই আজ প্রচলিত। এই পদ্ধতিতে মৌলিক পদার্থকে উহার ইংরাজী নামের প্রথম অক্ষরটি ( বড় হাতের ) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন—হাইড্রোজেন ( Hydrogen )—H, অক্সিজেন ( Oxygen )—O, নাইট্রোজেন ( Nitrogen )—N ইত্যাদি। যে-ক্ষেত্রে একাধিক মৌল একই আদ্যক্ষরবিশিষ্ট হয় সে-ক্ষেত্রে একটি মৌলকে ঐ আদ্যক্ষর দ্বারা এবং অপরাপর মৌলগুলিকে ঐ আদ্যক্ষর এবং অপর একটি অক্ষর দ্বারা ( আদ্যক্ষরটি বড় হাতের এবং অপর অক্ষরটি ছোট হাতের ) চিহ্নিত করা হয়। যেমন—বোরন ( Boron )—B, বেরিয়াম ( Barium )—Ba, ব্রোমিন ( Bromine )—Br ইত্যাদি।

কোন কোন মৌলিক পদার্থের ক্ষেত্রে এই প্রতীক বা চিহ্ন উহাদের লাটিন নাম হইতে দেওয়া হইয়াছে। যেমন—

| ইংরাজী নাম | লাটিন নাম | চিহ্ন | ইংরাজী নাম | লাটিন নাম | চিহ্ন |
|---|---|---|---|---|---|
| কপার | Cuprum | Cu | আয়রন | Ferrum | Fe |
| গোল্ড | Aurum | Au | পটাসিয়াম | Kalium | K |

কোন কোন ক্ষেত্রে আবার এই চিহ্ন মৌলিক পদার্থের জার্মান নাম হইতে আসিয়াছে ; টাংস্টেনের চিহ্ন "*W*" উহার জার্মান নাম wolfram হইতে উদ্ভূত।

যৌগিক বা মৌলিক যে-কোন প্রকার অণুকে উহার নামের পরিবর্তে চিহ্ন বা চিহ্ন ও সংখ্যার সমন্বয়ে প্রকাশ করা হয়। ইহাকে **সংকেত** (formula)

বলে। মৌলিক পদার্থের অণুতে এক বা একাধিক (একই প্রকারের) পরমাণু বর্তমান। যৌগিক পদার্থের অণু সর্বদাই একাধিক মৌলের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। মৌলিক পদার্থের অণু যদি একাধিক পরমাণুর সমন্বয়ে গঠিত হয় তাহা হইলে একটি অণুতে যতগুলি পরমাণু থাকে সেই সংখ্যাটি মৌলটির চিহ্নের ডান দিকে এবং একটু নীচে লিখিয়া ঐ মৌলটির সংকেত প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি। যেমন—হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ইত্যাদির প্রতি অণুতে দুইটি করিয়া পরমাণু বর্তমান এবং উহাদের সংকেত যথাক্রমে $H_2$ ও $N_2$। যদি কোন মৌলিক পদার্থের অণু এক পরমাণুক হয়, তবে চিহ্নটি উহার সংকেতও বটে। যেমন চিহ্ন C, Hg ইহারা যথাক্রমে কার্বন এবং মারকারির সংকেতও। যৌগিক পদার্থের ক্ষেত্রে গঠনকারী উপাদান পরমাণুগুলি পাশাপাশি লিখিয়া পরমাণু-সংখ্যা পরমাণু-প্রতীকের ডানদিকে এবং একটু নীচে বসাইয়া যৌগটির সংকেত প্রকাশ করা হইয়া থাকে। পরমাণুর সংখ্যা 1 হইলে উহা আর লিখিতে হয় না। কারণ চিহ্নটি নিজেই একটি মাত্র পরমাণুকে বুঝায়। জলের অণুতে আছে দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন-পরমাণু; সালফিউরিক অ্যাসিডের অণুতে আছে দুইটি হাইড্রোজেন-পরমাণু, একটি সালফার-পরমাণু এবং চারটি অক্সিজেন-পরমাণু। সুতরাং, জল এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের সংকেত যথাক্রমে $H_2O$ এবং $H_2SO_4$।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এক অণু হাইড্রোজেনে 2-টি হাইড্রোজেন-পরমাণু বর্তমান এবং ইহার সংকেত লেখা হয় $H_2$। কিন্তু 2H-লিখিলে তাহা দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে বুঝায়। সেইরূপে $6N_2$ দ্বারা 6-টি নাইট্রোজেন অণু কিন্তু 6N দ্বারা 6-টি নাইট্রোজেন পরমাণুকে বুঝান হইয়া থাকে। $10H_2O$-এর দ্বারা দশ অণু জল বুঝান হইয়া থাকে। সেইরূপে $2HNO_3$ দ্বারা প্রকাশ করা হয় নাইট্রিক অ্যাসিডের দুইটি অণুকে। অতএব, চিহ্ন এবং সংকেতের সম্মুখে অর্থাৎ বাঁমদিকে সংখ্যা বসাইয়া যথাক্রমে মোট পরমাণু ও অণুর সংখ্যা বুঝান হয়। যাহা হউক, সংকেত লিখিতে যোজ্যতা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

3-2. **যোজ্যতা (Valency):** একটি মৌলের পরমাণুর অপর মৌলের পরমাণুর সহিত যুক্ত হইবার যে ক্ষমতা তাহাকেই মৌলের যোজন ক্ষমতা বলা হয়। অতএব, **মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতাকে উহাদের যোজন ক্ষমতা বা যোজ্যতা বলা হয়।** কোন মৌলিক পদার্থের

একটি পরমাণু যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হয় অথবা যত সংখ্যক হাইড্রোজেন পরমাণুকে হাইড্রোজেনের একটি যৌগ হইতে প্রতিস্থাপিত করে সেই সংখ্যা দ্বারা ঐ মৌলটির যোজ্যতা প্রকাশ করা হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ($HCl$), জল ($H_2O$), অ্যামোনিয়া ($NH_3$) এবং মিথেন ($CH_4$) এই যৌগগুলি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে ক্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের এক একটি পরমাণু পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে যথাক্রমে 1, 2, 3 এবং 4-টি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়। অতএব ক্লোরিন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন এবং কার্বনের যোজ্যতা যথাক্রমে 1, 2, 3 এবং 4। আবার সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং অ্যালুমিনিয়ামের এক একটি পরমাণু পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হইতে যথাক্রমে 1, 2 এবং 3-টি হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করিয়া $NaCl$, $ZnCl_2$ এবং $AlCl_3$ যৌগ সৃষ্টি করিয়া থাকে। সুতরাং সোডিয়াম, জিঙ্ক এবং অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর যোজ্যতা যথাক্রমে 1, 2 এবং 3।

যে সমস্ত মৌল হাইড্রোজেনের সহিত সরাসরি যুক্ত হয় না এবং হাইড্রোজেনের কোন যৌগ হইতে উহাকে প্রতিস্থাপিত করিতে পারে না তাহাদের যোজ্যতা এরূপ কোন মৌল যাহার যোজ্যতা জানা আছে তাহার ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়। স্বর্ণ সরাসরি হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় না বা অ্যাসিড হইতে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করিতেও পারে না। কিন্তু উহা ক্লোরিনের সহিত যুক্ত হয় এবং আমরা জানি যে ক্লোরিনের যোজ্যতা 1। তিনটি ক্লোরিন পরমাণুর সহিত স্বর্ণের একটি পরমাণু যুক্ত হইয়া অরিক ক্লোরাইড ($AuCl_3$) গঠন করে। সুতরাং, স্বর্ণের যোজ্যতা 3। বেশীর ভাগ মৌলের সহিতই অক্সিজেন সরাসরি যুক্ত হয়। সুতরাং অক্সিজেনের ভিত্তিতে অন্যান্য মৌলের যোজ্যতা নিরূপণ করা সুবিধাজনক। অক্সিজেনের যোজ্যতা 2। সুতরাং কোন মৌলের একটি পরমাণুর সহিত যতগুলি অক্সিজেন পরমাণু যুক্ত হয় সেই সংখ্যার দ্বিগুণ হইবে ঐ মৌলটির যোজ্যতা। একটি অক্সিজেন পরমাণু একটি ম্যাগনেসিয়াম পরমাণুর সহিত যুক্ত হইয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ($MgO$) গঠন করে। সুতরাং ম্যাগনেসিয়ামের যোজ্যতা 2। ইহা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে যোজ্যতা কখনও ভগ্নাংশ হইতে পারে না ; ইহা সর্বদাই পূর্ণ সংখ্যা হইয়া থাকে। কতকগুলি মৌলের একাধিক যোজ্যতা আছে। যেমন, নাইট্রিক অক্সাইডে ($NO$) এবং অ্যামোনিয়াতে ($NH_3$) নাইট্রোজেনের যোজ্যতা যথাক্রমে 2 এবং 3।

**মূলক ( Radicals ) :** কোন কোন যৌগে বিভিন্ন মৌলের পরমাণু জোটবদ্ধভাবে থাকিয়া একটি পরমাণুর ন্যায় আচরণ করে এবং ঐ পরমাণুপুঞ্জ সমষ্টিগতভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে এবং ইহাতে পরমাণুপুঞ্জের আদৌ কোন পরিবর্তন ঘটে না। এইরূপ পরমাণুপুঞ্জকে **মূলক** বা **যৌগমূলক** বলা হয়। কার্বনেট ( $CO_3$ ), হাইড্রক্সিল ( OH ), নাইট্রেট ($NO_3$), ফস্‌ফেট ( $PO_4$ ) ইত্যাদি হইল কয়েকটি যৌগমূলকের উদাহরণ। যোজ্যতা সম্পর্কিত পূর্বোক্ত ধারণা যৌগমূলকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন, নাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত $HNO_3$, $NO_3$ মূলক একযোজী, কারণ উহা একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর সহিত যুক্ত হয়।

কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলের এবং যৌগমূলকের যোজ্যতা পরিশিষ্টে সারণীর আকারে দেওয়া হইয়াছে।

**সংকেত লিখিবার নিয়ম :** একটি মৌল A-এর সহিত অপর একটি মৌল B যুক্ত হইয়া একটি যৌগ গঠন করিলে ঐ যৌগে A এবং B-র পরমাণু-সংখ্যা উহাদের যোজ্যতার বিপরীত অনুপাতে ( সাধারণত লঘিষ্ঠ আকার ) হইবে।

**প্রয়োগ :** কোন যৌগের সংকেত লিখিতে হইলে,

(i) উপাদান মৌলগুলি অর্থাৎ যৌগ গঠনকারী মৌলগুলির চিহ্ন পাশাপাশি বসাও। ধাতু অথবা অপেক্ষাকৃত অধিক ধনাত্মক মৌল বা মূলকের চিহ্ন প্রথমে অর্থাৎ বামদিকে এবং অ-ধাতু অথবা অপেক্ষাকৃত কম ধনাত্মক মৌলের চিহ্ন ডানদিকে বসাও। (ii) মৌলগুলির যোজ্যতা উহাদের নিজ নিজ চিহ্নের ডানদিকের মাথায় সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ কর। (iii) অতঃপর একটির যোজ্যতা-সংখ্যা অপর চিহ্নটির নীচে এবং ডানদিকে বসাও। অর্থাৎ একটির যোজ্যতা-সংখ্যা দ্বারা অপর মৌলটির পরমাণু-সংখ্যা নির্দেশ কর। এইভাবে যোজ্যতা নির্দেশক সংখ্যাদ্বয়কে ক্রুশের আকারে আড়াআড়িভাবে স্থানান্তরিত কর। এক্ষেত্রে কোন সংখ্যা 1 হইলে উহা লিখিবে না। মনে রাখিও, মূলকের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। নিম্নের উদাহরণগুলি হইতে এই নিয়মের প্রয়োগ-পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে পারিবে।

| যৌগের নাম | যোজ্যতা-সহ চিহ্ন | সংকেত |
|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | $Ca^2Cl^1$ | $CaCl_2$ |
| ফেরিক অক্সাইড | $Fe^3O^2$ | $Fe_2O_3$ |
| কপার ফস্‌ফেট | $Cu^2PO_4{}^3$ | $Cu_3(PO_4)_2$ |

যোজ্যতা-সংখ্যাগুলি যদি কোন সাধারণ গুণনীয়ক ( common factor ) দ্বারা বিভাজ্য হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে প্রথমে ঐ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা ভাগ করিয়া লঘিষ্ঠ আকারের অনুপাতে পরিণত কর এবং পরে উপরোক্ত নিয়ম প্রয়োগ করিয়া সংকেতটি লিখ। যেমন,

| যৌগের নাম | যোজ্যতা-সহ চিহ্ন | অনুপাত (লঘিষ্ঠ আকারে) | সংকেত |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম সালফেট | $Ca^2SO_4{}^2$ | $Ca^1SO_4{}^1$ | $CaSO_4$ |
| অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট | $Al^3PO_4{}^3$ | $Al^1PO_4{}^1$ | $AlPO_4$ |
| কার্বন ডাই-অক্সাইড | $C^4O^2$ | $C^2O^1$ | $CO_2$ |

3-3. **সমীকরণ** (Equation) : রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এক বা একাধিক পদার্থের পরিবর্তনে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয়। যে বা যে-সকল পদার্থ রাসায়নিক বিক্রিয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং যে বা যে-সকল নূতন পদার্থ সেই বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় তাহাদের সকলকেই স্ব স্ব চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ করা যায়। একটি সমান (=) চিহ্নের বামদিকে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থ বা পদার্থগুলি এবং ডানদিকে এই ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন পদার্থ বা পদার্থগুলি লিখিয়া রাসায়নিক বিক্রিয়া প্রকাশ করাই রীতি। যদি একাধিক পদার্থ উৎপন্ন হয় একাধিক পদার্থের মিলনে বা ক্রিয়ায় তবে বিভিন্ন পদার্থের সংকেত যোগ ( + ) চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত করিতে হয়। সমান চিহ্নের উভয় পার্শ্বে প্রতিটি মৌলের একই সংখ্যক পরমাণু থাকিবে। এইভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া সমীকরণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। সমীকরণের বামদিকের পদার্থগুলির সংকেতের মধ্যবর্তী যোগ ( + ) চিহ্নগুলির অর্থ "ক্রিয়া করে"; ডানদিকের যোগ (+) চিহ্নগুলির অর্থ "এবং"। সমান চিহ্নদ্বারা বুঝান হয় "উৎপন্ন করে"। সুতরাং সাংকেতিক ভাষায় রাসায়নিক বিক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত প্রকাশের নামই সমীকরণ।

দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জিঙ্ক সালফেট এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। পরিবর্তনটির সমীকরণ নিম্নরূপ :

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$$

**সমীকরণের তাৎপর্য :** সমীকরণের আদিক ( qualitative ) ও মাত্রিক ( quantitative ) দুইটি দিক আছে। সমীকরণ হইতে জানা যায়—

(i) কোন্ পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনে বা কোন্ কোন্ পদার্থের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কি বা কি কি পদার্থ উৎপন্ন হয়।

(ii) কত ওজনের কোন্ পদার্থ কত ওজনের কোন্ পদার্থ উৎপন্ন করিবে। যেমন, পূর্বোক্ত বিক্রিয়া অনুযায়ী দস্তার এক পরমাণু ও সালফিউরিক অ্যাসিডের এক অণু—এক অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু জিঙ্ক সালফেট উৎপন্ন করে।

সুতরাং, এক্ষেত্রে বলা যায় 65'38 ভাগ ওজনের দস্তার সহিত $\{(2\times1+32+4\times16)=\}$ 98 ভাগ ওজনের সালফিউরিক অ্যাসিড রাসায়নিক বিক্রিয়ায় $\{(65\ 38+32+4\times16)=\}$ 161'38 ভাগ ওজন জিঙ্ক সালফেট এবং 2 ভাগ ওজন হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে।

পরিশেষে, (iii) কোন বিক্রিয়ক বা বিক্রিয়াজাত পদার্থ যদি গ্যাসীয় হয়, তবে উহাদের আয়তনও সমীকরণ হইতে জানা যায়। আবার, যদি গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে এবং উৎপন্ন পদার্থও যদি গ্যাসীয় হয়, তাহা হইলে সমীকরণ হইতে বিক্রিয়ক এবং উৎপন্ন পদার্থগুলির আয়তনের সম্পর্ক জানা যায়। যথা $H_2+Cl_2=2HCl$ এই বিক্রিয়া হইতে জানা যায় যে ( একই উষ্ণতা ও চাপে ) 1-আয়তন হাইড্রোজেন 1-আয়তন ক্লোরিনের সহিত বিক্রিয়া করে এবং ইহার ফলে 2-আয়তন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

### রাসায়নিক সমীকরণ লিখিবার নিয়ম

**নীতি :** রাসায়নিক সমীকরণ একটি প্রকৃত রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রকাশ করে। সুতরাং, সমীকরণ লিখিতে হইলে বিক্রিয়ক ( reactants ) এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির ( অর্থাৎ উৎপন্ন পদার্থগুলির ) নাম জানা অবশ্য প্রয়োজন। ভরের নিত্যতাসূত্র ( law of conservation of mass ) বলে যে 'পদার্থ সৃষ্টিও করা যায় না বা ধ্বংসও করা যায় না'। অতএব সমীকরণের সমান চিহ্নের (=) উভয় পার্শ্বের সামঞ্জস্য বিধান করা ( balance ) প্রয়োজন, অর্থাৎ সমীকরণের সমান চিহ্নের উভয় পার্শ্বে প্রতিটি মৌলের পরমাণু-সংখ্যা অবশ্যই এক রাখিতে হইবে।

সমীকরণে সকল পদার্থকেই অণুর ( molecule ) সংকেতে প্রকাশ করিতে হয়। তবে Na, Hg ইত্যাদির ন্যায় এক পরমাণুক (monatomic) মৌলিগুলিকে উহাদের চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। মুক্ত অবস্থায় কঠিন মৌলগুলি, যথা—Fe, Al, Sn ইত্যাদি ধাতু এবং B, C, S ইত্যাদি অ-ধাতুকে উহাদের চিহ্নের দ্বারা প্রকাশ করাই প্রচলিত রীতি। কারণ, কঠিন কোন মৌলের অণুতে

যে পরমাণু থাকে তাহার সংখ্যা কখনও কখনও পরিবর্তনশীল বা অনির্দিষ্ট। [ হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, ক্লোরিন ইত্যাদি মৌলিক গ্যাসসমূহের আণবিক সংকেত যথাক্রমে $H_2$, $O_2$, $Cl_2$ ইত্যাদি। ]

**পদ্ধতি :** (i) প্রথমে অর্থাৎ বামদিকে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থ বা পদার্থগুলির তথা বিক্রিয়কগুলির নাম লিখিয়া একটি তীর চিহ্ন (→) দাও এবং উহার ডানদিকে উৎপন্ন পদার্থ বা পদার্থগুলির নাম লিখ। বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থ একাধিক হইলে উহাদিগকে যোগ (+) চিহ্ন দ্বারা সংযুক্ত কর। সেইরূপে উৎপন্ন পদার্থও একাধিক হইলে উহাদের নামগুলির মধ্যে অনুরূপভাবে যোগ চিহ্ন দাও। (ii) মৌলগুলিকে চিহ্নের দ্বারা এবং যৌগগুলিকে আণবিক সংকেত দ্বারা নির্দেশ কর। (iii) এখন সামঞ্জস্য বিধান কর যাহাতে তীর চিহ্নের উভয় পার্শ্বে প্রতিটি মৌলের পরমাণুসংখ্যা যেন একই থাকে। (iv) পরিশেষে সকল পদার্থকে পূর্বের নির্দেশ অনুসারে অণুরূপে (as molecules) প্রকাশ কর এবং তীর চিহ্নের পরিবর্তে একটি সমান চিহ্ন (=) বসাও।

**প্রয়োগ :** উপরোক্ত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া কি ভাবে সমীকরণ লিখিতে হয় তাহা নিম্নের দুইটি রাসায়নিক বিক্রিয়াতে দেখান হইল।

(a) হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের মিলনে জল উৎপন্ন হয়।

হাইড্রোজেন + অক্সিজেন → জল ... ... (i)

$$H + O \rightarrow H_2O \quad \ldots \quad \ldots \quad \text{(ii)}$$
$$2H + O \rightarrow H_2O \quad \ldots \quad \ldots \quad \text{(iii)}$$
$$2H_2 + O_2 = 2H_2O \quad \ldots \quad \ldots \quad \text{(iv)}$$

(b) পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিলে উহা পটাসিয়াম ক্লোরাইডে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।

পটাসিয়াম ক্লোরেট → পটাসিয়াম ক্লোরাইড + অক্সিজেন ... (i)

$$KClO_3 \rightarrow KCl + O \quad \ldots \quad \text{(ii)}$$
$$KClO_3 \rightarrow KCl + 3O \quad \ldots \quad \text{(iii)}$$
$$2KClO_3 = 2KCl + 3O_2 \quad \ldots \quad \text{(iv)}$$

সুতরাং, মোট কথা হইল বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থসমূহের সঠিক সংকেতের (কোন কোন ক্ষেত্রে চিহ্ন এবং সংকেত অভিন্ন) পূর্বে প্রয়োজনানুযায়ী উপযুক্ত গুণকসমূহ ( যথাসম্ভব ছোট ) বসাইয়া সমতা বিধান করা এবং সরল বিক্রিয়াগুলির ক্ষেত্রে উপরোক্ত উপায়ে এই সমন্বয় সাধন করা সুবিধাজনক।

## প্রশ্নাবলী

1. উদাহরণসহ সংজ্ঞা লিখ : চিহ্ন, সংকেত, যোজ্যতা।

2. 'সংকেত' বলিতে কি বুঝ ? নিম্নলিখিত যৌগসমূহের সংকেত লিখ :

কিউপ্রিক সালফেট, কিউপ্রাস ক্লোরাইড, মারকিউরিক সালফেট, ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রক্সাইড, পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড, ফেরিক হাইড্রক্সাইড, ক্যালসিয়াম কার্বনেট, ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম বাইকার্বনেট, অ্যালুমিনিয়াম ফস্‌ফেট, ক্যালসিয়াম ফস্‌ফেট, পটাসিয়াম ফস্‌ফেট, অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, মারকিউরাস ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম সালফেট।

3. রাসায়নিক সমীকরণ কাহাকে বলে ? সমীকরণের তাৎপর্য বিবৃত কর। সমীকরণের উভয় পার্শ্বের সমতা বিধান করা হয় কেন ?—ব্যাখ্যা কর।

4. সঠিক রাসায়নিক সমীকরণ লিখিবার পদ্ধতি একটি সহজ উদাহরণের সাহায্যে বর্ণনা কর।

5. $N_2+3H_2=2NH_3$ এই সমীকরণটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া রাসায়নিক সমীকরণ কি কি নির্দেশ করে তাহা বিশদভাবে বিবৃত কর।

6. সামঞ্জস্য বিধান কর :—

(i) $Pb(NO_3)_2 \rightarrow PbO+NO_2+O_2$, (ii) $HgCl_2+SnCl_2 \rightarrow Hg_2Cl_2+SnCl_4$
(iii) $Fe_2O_3+Al \rightarrow Fe+Al_2O_3$, (iv) $MnO_2+HCl \rightarrow MnCl_2+H_2O+Cl_2$
(v) $Ca_3(PO_4)_2+SiO_2 \rightarrow CaSiO_3+P_2O_5$

7. চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে প্রকাশ কর এবং তৎপরে সমান (=) চিহ্নের উভয় পার্শ্বে সামঞ্জস্য বিধান কর :—

(i) ম্যাগনেসিয়াম+সালফিউরিক অ্যাসিড=ম্যাগনেসিয়াম সালফেট+হাইড্রোজেন, (ii) সালফার ডাই-অক্সাইড+অক্সিজেন=সালফার ট্রাই-অক্সাইড, (iii) লৌহ+ষ্টীম=ফেরোসো-ফেরিক অক্সাইড+হাইড্রোজেন, (iv) ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড+নাইট্রিক অ্যাসিড=ক্যালসিয়াম নাইট্রেট+জল, (v) ম্যাগনেসিয়াম+নাইট্রোজেন=ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রাইড, (vi) পটাসিয়াম নাইট্রেট=পটাসিয়াম নাইট্রাইট+অক্সিজেন।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

### A. Alternate response type :

(i). *True or False type* :

(a) মৌলিক পদার্থের নামের সাংকেতিক পরিচয়কে চিহ্ন বলে। —
(b) কোন মৌলের একাধিক যোজ্যতা থাকিতে পারে না। —

(ii). *Yes or No type* :

(a) মৌলের যোজ্যতা কি ভগ্নাংশ হইতে পারে ? —
(b) রাসায়নিক সমীকরণে সমান চিহ্নের উভয় পার্শ্বে প্রতিটি মৌলেরই কি একই সংখ্যক পরমাণু থাকিবে ? —

### B. Recall type :

(i) মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক সংযোগের ক্ষমতাকে উহার — বলে। —
(ii) যৌগিক পদার্থের অণু — মৌলের পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। —

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

## তড়িৎ-বিশ্লেষণ
(Electrolysis)

**4-1. তড়িৎ-বিশ্লেষ্য ও তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (Electrolytes and electrolysis): তোমরা হয়তো জান যে, সকল পদার্থই তড়িৎ পরিবহন করিতে পারে না। যেমন অভ্র, রবার, কাঠ ইত্যাদি তড়িৎ পরিবহনে অক্ষম। আবার সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি তড়িৎ-সুপরিবাহী। সুতরাং, তড়িৎপ্রবাহের প্রতি আচরণের ভিত্তিতে পদার্থসমূহকে আমরা মোটামুটি **পরিবাহী** (conductor) এবং **অপরিবাহী** (non-conductor)—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করিতে পারি। প্রথম শ্রেণীর বস্তুর ভিতর দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু উহাদের নিজেদের ভিতর দিয়া তড়িৎকে প্রবাহিত হইতে দেয় না। পরিবাহী আবার দুই শ্রেণীর হইয়া থাকে।

কোন কোন পরিবাহী এইরূপ যে উহার ভিতর তড়িৎপ্রবাহ চলিলে পরিবাহীর কোন স্থায়ী বা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না। যেমন, বৈদ্যুতিক বাতির সরু তার; তড়িৎপ্রবাহের ফলে পরিবাহীর একটি বাহিক পরিবর্তন ঘটে মাত্র। তারটির মধ্য দিয়া তড়িৎপ্রবাহ চালনা করিলে উহা ক্রমশ উত্তপ্ত হইতে থাকে; অত্যধিক উত্তপ্ত হইয়া ভাস্বর হয় এবং আলোক প্রদান করে। প্রবাহ বন্ধ হইলে উহা আবার শীতল হইয়া পূর্বাবস্থায় ফিরিয়া আসে।

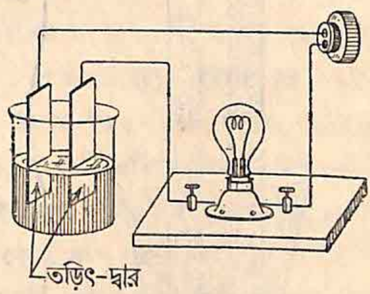
দ্বিতীয় প্রকারের তড়িৎ পরিবাহীসমূহকে **তড়িৎ-বিশ্লেষ্য** (electrolyte) বলে; ইহারা গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় তড়িৎ-পরিবাহী এবং তড়িৎ-পরিবহনকালেই বিযোজিত (decomposition) হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে। বহু লবণ, তীব্র ক্ষার ও তীব্র অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ উত্তম তড়িৎ-বিশ্লেষ্য। কিন্তু কোন অবস্থাতেই চিনি, ইথাইল অ্যালকোহল, গ্লিসারিন ইত্যাদি তড়িৎ-বিশ্লেষণক্ষম অর্থাৎ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য নহে। তড়িৎপ্রবাহের সাহায্যে কোন গলিত বা দ্রবীভূত পদার্থের রাসায়নিক বিযোজন-প্রক্রিয়াকে **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** (electrolysis) বলে।

সুতরাং, **তড়িৎ-পরিবহন + রাসায়নিক বিযোজন = তড়িৎ-বিশ্লেষণ**

তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয় যে-পাত্রে উহাকে **তড়িৎ-বিশ্লেষক কোষ** (electrolytic cell) বা **ভোল্টামিটার** (voltameter) বলে। আর

যে-দণ্ড, তার বা পাতের মাধ্যমে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের ভিতরে তড়িৎ-উৎস হইতে তড়িৎপ্রবাহ চালনা করা হয়, তাহাদিগকে বলা হয় **তড়িৎ-দ্বার** বা **ইলেকট্রোড** (electrodes)। ধনাত্মক (positive) মেরুর সহিত যুক্ত দণ্ডকে (তার বা পাত) **অ্যানোড** (anode) এবং ঋণাত্মক (negative) মেরুর সহিত যুক্ত দণ্ডকে (তার বা পাত) **ক্যাথোড** (cathode) নামে অভিহিত করা হয়।

তড়িৎ-প্রবাহের প্রতি পদার্থরাজির আচরণের যে তারতম্যের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা নিম্নবর্ণিত পরীক্ষার সাহায্যে সহজেই দেখান যাইতে পারে। গ্রাফাইট বা কোন ধাতুর (নিকেল বা প্লাটিনাম অধিকতর বাঞ্ছনীয়) দুইটি তড়িৎ-দ্বার চিত্রে প্রদর্শিত মতে দুইটি তারের মাধ্যমে তড়িৎ উৎসের সহিত যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-দ্বার দুইটির মুক্ত প্রান্ত বিকারস্থিত বিশুষ্ক খাদ্য-লবণের ভিতর প্রবেশ করাইয়া সুইচ টিপিয়া দিলে বাতি জলে না। খাদ্য-লবণের পরিবর্তে অতি বিশুদ্ধ জল লইয়া পরীক্ষা করিলেও একই ফলাফল পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বিশুদ্ধ এই জলে স্বল্প পরিমাণে পূর্বোক্ত



তড়িৎ-প্রবাহের প্রতি পদার্থরাজির আচরণের তারতম্য

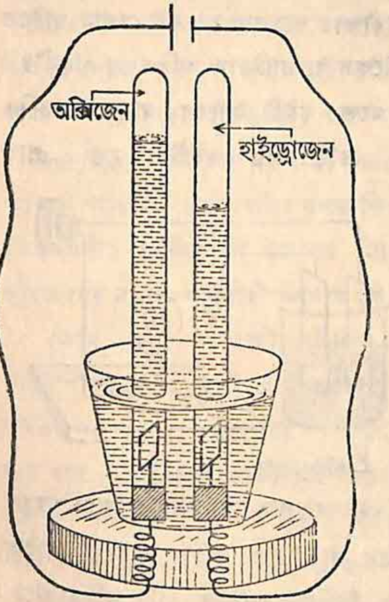
লবণ বা কষ্টিক সোডা দ্রবীভূত করিলে বা উহার সহিত হাইড্রোক্লোরিক, সালফিউরিক ইত্যাদি কোন অ্যাসিড মিশ্রিত করিলে বাতি জলিয়া উঠে। অতএব, বিশুষ্ক খাদ্যলবণ, অতি বিশুদ্ধ জল তড়িৎ-পরিবহনে অক্ষম। কিন্তু তার, তড়িৎ-দ্বার ইত্যাদি বস্তুসমূহ যে উপাদান বা উপাদানসমূহ দ্বারা গঠিত অর্থাৎ ঐ পদার্থ বা পদার্থরাজি এবং লবণের জলীয় দ্রবণ, অ্যাসিডমিশ্রিত জল ইত্যাদির ভিতর দিয়া তড়িৎ চলাচল করিতে পারে। আবার এই একই পরীক্ষার সাহায্যে বিভিন্ন দ্রবণের তড়িৎ-পরিবাহিতা সম্পর্কে মোটামুটি একটি আনুমানিক ধারণাও করা যাইতে পারে; বাল্‌বের ঔজ্জ্বল্য ইহা নির্দেশ করে।

যাহা হউক, তড়িৎ-পরিবহনকালে তার ইত্যাদি পরিবাহী বস্তুসমূহের কোন স্থায়ী বা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না; পক্ষান্তরে লবণের জলীয় দ্রবণ, অ্যাসিড-মিশ্রিত জল ইত্যাদি তড়িৎ-পরিবহনকালেই বিযোজিত হয়। যেমন, অতি অল্প পরিমাণ লবণ জলে দ্রবীভূত করিয়া বা জলের সহিত অতি সামান্য পরিমাণে

অ্যাসিড বা ক্ষার মিশ্রিত করিয়া প্লাটিনাম তড়িৎ-দ্বারের সাহায্যে ঐ জলে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এই ঘটনাকে জলের **তড়িৎ-বিশ্লেষণ** বলে।

$$2H_2O \longrightarrow 2H_2 + O_2$$

**পরীক্ষা ঃ জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ ঃ** একটি কাচের বাটির নিচের দিকে দুইটি প্লাটিনাম পাত খাড়াভাবে এইরূপ বসান থাকে যে দুইটি নল পাশাপাশি উহার উপরে উপুড় করিয়া রাখা যায়। কাচের বাটিতে বিশুদ্ধ জল ঢালিয়া প্লাটিনামের পাত দুইটি সম্পূর্ণরূপে ডুবাইয়া রাখা হয়। এই জলকে তড়িৎ-পরিবাহী করিবার জন্য উহার সহিত একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত করা হয়। দুইটি নল অ্যাসিডমিশ্রিত এই জলে পূর্ণ করিয়া প্লাটিনামের পাতের উপর উপুড় করিয়া বসান হয়। প্লাটিনামের পাতদুইটি ব্যাটারীর পজেটিভ ও নেগেটিভ প্রান্তে জুড়িয়া দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিচালনা করা হয়। জলকে অপসারিত করিয়া উপুড়-করা নল দুইটিতে গ্যাস জমিতে থাকে। ক্যাথোডে সঞ্চিত গ্যাসের মধ্যে একটি শিখাহীন জলন্ত শলাকা প্রবেশ করাইলে, শলাকাটি নিভিয়া যায় কিন্তু গ্যাসটি ঈষৎ নীলাভ শিখায় জলিয়া ওঠে। সুতরাং উহা হাইড্রোজেন। অ্যানোডে সঞ্চিত গ্যাসের মধ্যে শিখাহীন জলন্ত শলাকা প্রবেশ করাইলে শলাকাটি উজ্জ্বলভাবে জলিতে থাকে কিন্তু গ্যাসটি জলে না। সুতরাং উহা অক্সিজেন। আবার, নলদুইটি যদি অংশাঙ্কিত হয় তবে দেখা যায় যে এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের আয়তনের অনুপাত সর্বদাই 2 : 1। অতএব বলা যায় যে জলে আয়তন হিসাবে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন 2 : 1 অনুপাতে আছে।



জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ

জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা একটু পরেই আলোচনা করা হইবে।

**আয়নায়ন (Ionisation) :** বিশুদ্ধ জল বাস্তবতার বিচারে তড়িৎ-পরিবাহী নহে। আবার তরল হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, বিশুদ্ধ শুষ্ক খাদ্যলবণ বা শুষ্ক কষ্টিক সোডা তড়িৎ-পরিবাহী নহে। কিন্তু ইহাদের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম। স্পষ্টতই অ্যাসিড, লবণ এবং ক্ষার জলে দ্রবীভূত করিলে নিগূঢ় এক বিশেষ পরিবর্তন ঘটে যাহার ফলে উৎপন্ন দ্রবণ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম হইয়া থাকে।

সুইডিশ বিজ্ঞানী আরহেনিয়াস 1887 খ্রীষ্টাব্দে ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য একটি মতবাদ প্রবর্তন করেন যাহা **'তড়িৎ-বিয়োজন বাদ'** নামে খ্যাত হইয়াছে। জলীয় দ্রবণে বা অন্য কোন আয়নীকরণ দ্রাবকে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের অণুগুলির অল্পাধিক অংশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া আধানযুক্ত দুই বা ততোধিক কণায় পরিণত হয়। আহিত ( charged ) এই কণাকে **আয়ন** ( ions ) বলে। এই প্রক্রিয়াটি উভমুখী ; অপরিবর্তিত অণুগুলি এবং উৎপন্ন আয়নসমূহ সাম্যাবস্থায় ( equilibrium ) থাকে। প্রত্যেক পদার্থ হইতে দুই রকমের ( ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ) আয়ন উৎপন্ন হয়। এই ধরনের স্বতঃস্ফূর্ত বিয়োজনকে **আয়নায়ন** ( ionisation ) বা **তড়িৎ-বিয়োজন** ( electrolytic dissociation ) বলে। মুক্ত আয়নসমূহই দ্রবণে তড়িৎ-পরিবহন করিয়া থাকে ; অবিয়োজিত অণুসমূহ তড়িৎ-পরিবহনে কোন অংশ গ্রহণ করে না।

অনার্দ্র হাইড্রোজেন ক্লোরাইডে HCl অণু থাকে, কিন্তু উহাকে জলে দ্রবীভূত করিলে উহা হাইড্রোজেন আয়ন এবং ক্লোরাইড আয়নে বিয়োজিত হয়। এই তড়িৎ-বিয়োজন নিম্নরূপে প্রকাশ করা হয় :

$HCl \rightleftharpoons H^+ + Cl^-$ [ প্রক্রিয়াটি উভমুখী বলিয়া = চিহ্নের পরিবর্তে দুইটি অর্ধতীর $\rightleftharpoons$ ব্যবহৃত হইয়াছে ]। সুতরাং, তড়িৎ-প্রবাহ এই বিয়োজন ঘটায় না। তড়িৎ-প্রবাহের একমাত্র ফল হইল ইহা আয়নসমূহকে তড়িৎদ্বারের দিকে চালিত করে।

গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে সম-প্রবাহ চালনা করিলে এই $H^+$ আয়ন এবং ক্লোরাইড ($Cl^-$) আয়ন যথাক্রমে ক্যাথোডে এবং অ্যানোডে গমন করে ; তথায় প্রশমিত হইয়া নিরপেক্ষ পরমাণুতে পরিণত হয় এবং পরিশেষে গ্যাসীয় (আণবিক) হাইড্রোজেন ($H + H \rightarrow H_2$) এবং গ্যাসীয় (আণবিক) ক্লোরিন ($Cl + Cl \rightarrow Cl_2$) রূপে নির্গত হয়। কিন্তু লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দ্রবণে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন নির্গত

হয় বটে, অ্যানোডে ভিন্ন রকমের পরিবর্তন ঘটে। ক্লোরাইড আয়ন এবং জলের $OH^-$ আয়নের মধ্যে কেবল $OH^-$ আয়নই প্রশমিত হইয়া নিরপেক্ষ হাইড্রক্সিল মূলকে OH পরিণত হয়। হাইড্রক্সিল মূলকগুলি নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করিয়া জল এবং অক্সিজেন গঠন করে; $4(OH) \rightarrow 2H_2O + O_2$। অর্থাৎ এক্ষেত্রে মোট ফল হইল জল তড়িৎ-বিশ্লেষিত হয়, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন এবং অ্যানোডে অক্সিজেন নির্গত হয়। সেইরূপে সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা অম্লীকৃত জলের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। জল তড়িৎ কুপরিবাহী বলিয়া ইহার সহিত অ্যাসিড ইত্যাদি মিশ্রিত করা হয়। তড়িৎ-বিয়োজনের দরুন সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলে $H^+$, $OH^-$ এবং সালফেট $SO_4^=$ আয়নগুলি বিদ্যমান : $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$, $H_2SO_4 \rightleftharpoons 2H^+ + SO_4^=$।

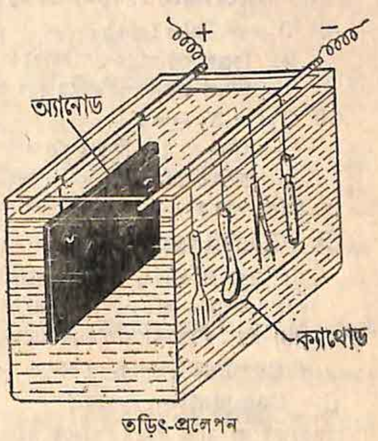
এইবার প্লাটিনাম তড়িৎদ্বারের সাহায্যে 'জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ' পরীক্ষাটি স্মরণ কর। তড়িৎ-প্রবাহের ফলে হাইড্রোজেন আয়ন পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হাইড্রোজেন অণুতে পরিণতি লাভ করে এবং শেষপর্যন্ত গ্যাসীয় হাইড্রোজেনরূপে ক্যাথোডে নির্গত হয়। আর $OH^-$ এবং $SO_4^=$ আয়নসমূহের মধ্যে কেবল প্রথমোক্ত আয়নই পূর্বের ন্যায় নিরপেক্ষ হাইড্রক্সিল মূলকে পরিণত হয়। হাইড্রক্সিল মূলকগুলি নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করিয়া জল ও অক্সিজেন গঠন করে এবং গ্যাসরূপে অক্সিজেন অ্যানোডে সংগৃহীত হয়।

**4-2. তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ** (applications) : এখানে আমরা তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কয়েকটি ব্যবহারিক প্রয়োগের কথা সংক্ষেপে বলিব। তুঁতের দ্রবণে ( $CuSO_4$ ) অল্প একটু সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করিয়া উহার ভিতর দুইটি তামার পাতের ( তড়িৎ-দ্বার ) সাহায্যে ব্যাটারি হইতে তড়িৎ-প্রবাহ চালনা করিলে, অ্যানোড হইতে তামা দ্রবীভূত হইতে থাকে ও ক্যাথোডে বিশুদ্ধ তামার একটি আস্তরণ পড়ে। অতএব, তড়িৎ-বিশ্লেষণের সাহায্যে কোন কোন জিনিসের উপর উপযুক্ত ব্যবস্থার মাধ্যমে সোনা, রূপা, নিকেল, তামা ইত্যাদি ধাতুর সুন্দর, সুসম্বদ্ধ ও স্থায়ী প্রলেপ দেওয়া যাইতে পারে। এই প্রক্রিয়াকে **তড়িৎ-প্রলেপন** (electroplating) বলে। যে-জিনিসের উপর প্রলেপ দিতে হইবে ঐ জিনিসের গাত্র হইতে প্রথমেই কষ্টিক সোডার দ্রবণের সাহায্যে তৈল, চর্বি ইত্যাদি জাতীয় পদার্থ অপসারিত করা হয়। অতঃপর লঘু হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক অ্যাসিডের সাহায্যে ঐ বস্তু হইতে অক্সাইডের আবরণ দূর করা হয় এবং জল

দিয়া উহাকে ভাল করিয়া ধুইয়া পরে পালিশ করিয়া মসৃণ করা হয়। পরিষ্কৃত ও মসৃণ জিনিসটিকে ক্যাথোড হিসাবে এবং যে-ধাতুর প্রলেপ দিতে হইবে উহাকে অ্যানোড হিসাবে ব্যবহার করিতে হয়। আর অ্যানোডরূপে ব্যবহৃত ধাতুর একটি উপযুক্ত লবণের দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হিসাবে লওয়া হয়। যেমন, রূপার প্রলেপ দেওয়ার জন্য যথারীতি পরিষ্কৃত ও মসৃণ বস্তুটিকে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করিয়া পটাসিয়াম আর্জেণ্টোসায়ানাইডের দ্রবণ তড়িৎ-বিশ্লেষিত করা হয় ; বিশুদ্ধ রূপার পাত এখানে অ্যানোডরূপে ব্যবহৃত হয়।

এই প্রলেপ দেওয়ার উদ্দেশ্য দুইটি—প্রথমত ক্ষয়নিবারণ এবং দ্বিতীয়ত সৌন্দর্য-বৃদ্ধিকরণ। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি উদ্দেশ্যে এবং কোথায়ও বা এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যেই প্রলেপ দেওয়া হয়। সাধারণত লৌহ বা পিতলের বস্তুতে নিকেল, ক্রোমিয়াম, সোনা ইত্যাদির প্রলেপ দেওয়া হয়। এইভাবে লৌহ, পিতল ইত্যাদিকে ক্ষয়ের ( corrosion ) হাত হইতে রক্ষা করা বা উহাদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়া উহাদের বাণিজ্যিক মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে। নিকেলের প্রলেপ অপেক্ষাকৃত সহজেই অ্যাসিড দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং শহরের বায়ুতে ইহা শীঘ্র মলিন হইয়া যায়। এই কারণে অনেক ক্ষেত্রে নিকেলের পরিবর্তে ক্রোমিয়াম ব্যবহৃত হয়।

ধাতুনির্মিত বহু রকমের সাজ-সরঞ্জামে ( fittings ) ক্রোমিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয়। ভোজনকালে ব্যবহৃত সরঞ্জাম ছুরি, কাঁটা, চামচ ইত্যাদিতে প্রয়োজনানুযায়ী রূপা বা সোনার প্রলেপও দেওয়া হয়।



তড়িৎ-প্রলেপন

তড়িৎ-লেপন প্রক্রিয়ার অনুরূপ এক প্রক্রিয়া **ইলেকট্রোটাইপিং** ( electrotyping ) নামে খ্যাত। ইহা তড়িৎ-মুদ্রাক্ষর electrotype) প্রস্তুতিতে, মূর্তি বা চারুশিল্পের অন্য কোন নিদর্শনের পুনরুৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। যে-মুদ্রাক্ষর বা মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে উহার ছাঁচ মোম, প্লাস্টার ইত্যাদি আকার বা আকৃতি প্রদানক্ষম কোন উপযোগী পদার্থের দ্বারা তৈয়ারী করা হয়। ছাঁচের উপর গ্রাফাইট চূর্ণের আবরণ দিয়া উহার উপরিভাগ তড়িৎ-পরিবাহী করা হয়। ইহাকে ক্যাথোড হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আর যে-ধাতুর অক্ষর বা মূর্তি তৈয়ারী করিতে

হইবে উহার অ্যানোড ব্যবহার করিয়া ঐ ধাতুরই কোন উপযুক্ত লবণের দ্রবণ যথাযথ পরিবেশে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। যেমন, তামার অক্ষর ফলক তৈয়ারী করিতে বিশুদ্ধ তামার অ্যানোড ব্যবহার করা হয় এবং তড়িৎ-বিশ্লেষ্যরূপে কপার সালফেটের সালফিউরিক অ্যাসিডযুক্ত জলীয় দ্রবণ লওয়া হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে ছাঁচের উপর তামার অবক্ষেপ ( **deposit** ) পড়ে। ধাতুনির্মিত অক্ষর বা মূর্তিকে অতঃপর খোলা তথা ছাঁচ হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়। যেমন, মোমকে গলাইয়া মোমের কাঠামো অপসারিত করা হয় বা মূর্তির প্লাস্টার নির্মিত খোলা ছাড়াইয়া উহাকে আবরণচ্যুত করা হয়।

## প্রশ্নাবলী

1. সংজ্ঞা লিখ :

তড়িৎ-পরিবাহী, তড়িৎ-বিশ্লেষ্য, তড়িৎ-বিশ্লেষণ, অ্যানোড, ক্যাথোড এবং আয়ন।

2. বিশুদ্ধ জল তড়িৎ-পরিবাহী নহে। আবার তরল হাইড্রোজেন ক্লোরাইডও তড়িৎ-পরিবাহী নহে। কিন্তু ঐ হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম কেন?—ব্যাখ্যা কর।

3. 'আয়নায়ন' বলিতে কি বুঝ? তড়িৎ-বিশ্লেষণের সহিত ইহার সম্পর্ক সংক্ষেপে আলোচনা কর।

4. অ্যাসিডমিশ্রিত জলের তড়িৎ-বিশ্লেষণ বর্ণনা কর। তড়িৎ-বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে যাহা জান সবিস্তারে বর্ণনা কর।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

### A. Alternate response type

(*i*) *True or False type* :

(a) বিশুদ্ধ জল তড়িৎ-সুপরিবাহী। —

(b) বিশুদ্ধ খাদ্যলবণের জলীয় দ্রবণ তড়িৎ-পরিবহনে সক্ষম। —

(*ii*) *Yes or No type* :

(a) তড়িৎ-প্রবাহের ক্রিয়ায় কি তড়িৎ-বিশ্লেষ্য হইতে আয়ন উৎপন্ন হয়? —

(b) তড়িৎ-বিশ্লেষ্য কি তড়িৎ-পরিবহনকালেই বিযোজিত হইয়া নূতন পদার্থ উৎপন্ন করে? —

### B. Recall type :

(i) দ্রবণে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের অপরিবর্তিত অণুগুলি এবং উৎপন্ন আয়নসমূহ — থাকে। —

(ii) যে-পাত্রে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয় উহাকে — বলে। —

(iii) দ্রাবকের প্রভাবে তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের ( অল্পাধিক অংশ ) স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাঙ্গিয়া আয়নে পরিণত হওয়াকে — বলে। —

### C. Completion type :

যে মুদ্রাক্ষর বা মূর্তি প্রস্তুত করিতে হইবে উহার ছাঁচের উপর — (a) চূর্ণের আবরণ দিয়া উহাকে — (b) করা হয়। ইহাকে —(c) হিসাবে এবং যে ধাতুর অক্ষর বা মূর্তি তৈয়ারী করিতে হইবে উহার অ্যানোড ব্যবহার করিয়া ঐ ধাতুরই কোন উপযুক্ত —(d) দ্রবণ যথাযথ পরিবেশে —(e) করা হয়। ফলে ছাঁচের উপর ধাতুর — (f) পড়ে।

—(a), —(b)
—(c)
—(d), —(e)
—(f)

পঞ্চম অধ্যায় ঃ

## অ্যাসিড, ক্ষারক ও লবণ (Acids, Bases and Salts)

অ্যাসিড, ক্ষারক এবং লবণ এই শব্দকয়টি শ্রেণীবাচক—এক একটি দ্বারা এক একটি শ্রেণীর যৌগকে বুঝান হইয়া থাকে। ইহাদের কোন একটির ধর্ম অপর দুইটির কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করা যায় না।

**5-1. অ্যাসিড ঃ** 'অ্যাসিড' ( acid ) কথাটির উৎপত্তি হইয়াছে একটি ল্যাটিন শব্দ হইতে যাহার অর্থ হইতেছে টক্ ( sour )। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি অতি পরিচিত অ্যাসিডসমূহের কয়েকটি দৃষ্টান্ত। নানারকমের কাঁচা ফল যেমন লেবু, তেঁতুল ইত্যাদি যে টক লাগে তাহা এইসকল ফলে বিভিন্ন অ্যাসিড, যথা, সাইট্রিক, টারটারিক ইত্যাদির উপস্থিতির জন্য। এখন স্বভাবতই তোমরা প্রশ্ন করিতে পার কি কারণে জৈব বা অজৈব উপরোক্ত সকল পদার্থকে একই নামে অর্থাৎ 'অ্যাসিড' বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার কারণ—উপরোক্ত সকল পদার্থের কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে যাহার জন্য উহাদিগকে একই শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ, সকল অ্যাসিডেরই কতকগুলি সাধারণ ধর্ম আছে ঃ

(i) প্রায় সকল অ্যাসিড কম বা বেশী অম্লস্বাদযুক্ত।

(ii) ইহারা সাধারণত জলে দ্রাব্য এবং ইহাদের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

(iii) ইহারা নীল লিটমাসকে ( litmus) লাল করে।

**পরীক্ষা ঃ** কয়েকটি পরীক্ষা-নলে খানিকটা করিয়া জল লও এবং উহাদের এক একটির ভিতর অল্প করিয়া যথাক্রমে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড, ভিনিগার এবং সাইট্রিক অ্যাসিড যোগ কর। অতঃপর পরীক্ষা-নলগুলি ভালভাবে ঝাঁকাইয়া উৎপন্ন মিশ্রণে এক-একটি নীল লিটমাস কাগজ ডুবাও—নীল লিটমাস লাল হইয়া যাইবে।

(iv) অ্যাসিডে দুইটি অংশ থাকে—এক অংশে একটি বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে এবং অপর অংশে একটি বা একাধিক অ-ধাতুর পরমাণু বা অ-ধাতুর পরমাণু-যুটি থাকে। এই দ্বিতীয় অংশই বিভিন্ন অ্যাসিডে বিশেষ ধর্ম আরোপ করে ; সুতরাং ইহাকে অম্লাংশ বা আম্লিক মূলক ( acid-radical) বলে। সকল অ্যাসিডের প্রথম অংশ হাইড্রোজেন পরমাণু দ্বারা গঠিত।

(v) অ্যাসিড হইতে কোন বিশেষ ধাতু বা তজ্জাতীয় যুটির দ্বারা হাইড্রোজেন পরমাণু প্রতিস্থাপিত ( replace ) করা যায়। ফলে, ধাতুর বা

তজ্জাতীয় পরমাণু-যুটির সহিত অম্লাংশ সংযুক্ত হইয়া নূতন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। ইহাদিগকে লবণ ( salt ) বলে।

**পরীক্ষা :** হাইড্রোজেন প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি দেখ।

(vi) অ্যাসিডগুলির আর একটি সাধারণ ধর্ম হইল যে ইহারা কতকগুলি বিভিন্ন ধাতুকে দ্রবীভূত করিয়া ঐ ধাতুসমূহের লবণ গঠন করে।

(vii) কোন অ্যাসিড ক্ষারকের সংস্পর্শে আসিলে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়া লবণজাতীয় পদার্থ ও জল উৎপন্ন হয়। ইহাই অ্যাসিডের সর্বপ্রধান ধর্ম এবং এই ধর্মসম্পর্কিত পরীক্ষা পরে ক্ষার-প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হইবে।

উপরোক্ত গুণাবলীর সাহায্যে একশ্রেণীর যৌগকে প্রথমে 'অ্যাসিড' বলিয়া চিহ্নিত করা হইয়াছে অর্থাৎ যে সকল পদার্থে ঐ ধর্মগুলি বর্তমান তাহাদিগকে 'অ্যাসিড' বলা হইয়াছে। সংক্ষেপে প্রাথমিক স্তরের একটি ধারণা করিবার জন্য অ্যাসিডের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়—**অ্যাসিড হইল এইরূপ যৌগিক পদার্থ যাহাতে এক বা একাধিক প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে। এই হাইড্রোজেন আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে ধাতুদ্বারা বা ধাতুর ন্যায় আচরণ করে এইরূপ পরমাণু-যুটি তথা মূলকদ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিস্থাপিত করা যায়।**

জিঙ্ক লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করে। হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত হয় এবং দ্রবণে জিঙ্ক সালফেট থাকে। সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন এক্ষেত্রে জিঙ্ক দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপিত হইয়াছে : $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$।

লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে কপার দ্বারা হাইড্রোজেন প্রত্যক্ষভাবে প্রতিস্থাপিত করা যায় না। কিন্তু পরোক্ষভাবে এই প্রতিস্থাপন সম্ভব। কপার অক্সাইডের উপর অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কপার সালফেট এবং জল উৎপন্ন হয়।

$$CuO + H_2SO_4 = CuSO_4 + H_2O$$

পরোক্ষভাবে হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত হইলেও মোট ফল একই এই অর্থে যে কপার সালফেট এবং সালফিউরিক অ্যাসিড এই দুইটি পদার্থের পারস্পরিক সম্পর্ক বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন কপার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হওয়াতে কপার সালফেট উৎপন্ন হইয়াছে। সেইরূপে অ্যামোনিয়াম হাইড্রোজেন সালফেট $NH_4HSO_4$ এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট $(NH_4)_2SO_4$ এই দুইটি যৌগ লক্ষ্য কর। ইহা মনে করা যাইতে পারে যে

সালফিউরিক অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রথমক্ষেত্রে আংশিকভাবে এবং দ্বিতীয়-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে অ্যামোনিয়াম মূলকদ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে।

**5-2. ক্ষারক ঃ** অ্যাসিডের ঠিক বিপরীত ধর্মী এবং অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় যে-সকল যৌগিক পদার্থ লবণ এবং জল গঠন করে তাহাদিগকে **ক্ষারক** (base) বলে। সোডিয়াম অক্সাইড ($Na_2O$), ক্যালসিয়াম অক্সাইড ($CaO$), জিঙ্ক অক্সাইড ($ZnO$), কষ্টিক সোডা ($NaOH$) প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ক্ষারকেরও দুইটি অংশ থাকে। ইহার প্রথমাংশে ধাতুর পরমাণু থাকে এবং এই প্রথম অংশের বিভিন্নতাই (অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতুর উপস্থিতি) ক্ষারকে বিশিষ্ট ধর্ম আরোপ করে। ইহাকে **ক্ষারকীয় মূলক** (basic radical) বলে। আর দ্বিতীয় অংশে অক্সিজেন পরমাণু অথবা হাইড্রোজেন অক্সিজেন-যুটি এককথায় হাইড্রক্সিল-যুটি বা মূলক—একটি বা একাধিক থাকে।

ক্ষারকের প্রধান ধর্ম হইতেছে যে ইহারা অ্যাসিডের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে ; **ক্ষারক+অ্যাসিড=লবণ+জল**

$$CaO + 2HCl = CaCl_2 + H_2O$$

| CaO | 2HCl | CaCl₂ | H₂O |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম অক্সাইড | হাড্রোক্লোরিক অ্যাসিড | ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড | জল |

এই রাসায়নিক ক্রিয়াকে **প্রশমন** ( neutralisation ) বলে। প্রশমন ক্রিয়ায় অ্যাসিডের অম্লত্ব এবং ক্ষারকের ক্ষারকত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

অতএব দেখিতে পাইতেছ যে, ধাতুর অক্সাইড এবং হাইড্রক্সাইডে এই ধর্ম বর্তমান। তবে অ্যামোনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি পদার্থ ধাতুর অক্সাইড বা হাইড্রক্সাইড নহে এবং যদিও অ্যাসিডের সহিত রাসায়নিক ক্রিয়া করিয়া লবণ উৎপন্ন করে কিন্তু জল উৎপন্ন করে না, তথাপি ইহারা ক্ষারক বলিয়া গণ্য হয়।

জলে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইডগুলিকে **ক্ষার** (alkali) বলে ; যথা—সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NaOH$), পটাসিয়াম হাইড্রক্সাইড $KOH$), অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড ($NH_4OH$) প্রভৃতি পদার্থ জলে দ্রাব্য। ইহারা ক্ষারজাতীয় পদার্থের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে ক্ষারমাত্রই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নহে।

ক্ষারের কতকগুলি বিশিষ্ট ধর্ম আছে : (i) ক্ষারের স্বাদ কষা।

(ii) ইহাদের স্পর্শ করিলে পিচ্ছিল বলিয়া বোধ হয় এবং ইহাদের সংস্পর্শে লাল লিটমাস নীল হয়।

**পরীক্ষা :** দুইটি পরীক্ষা-নল লইয়া উহাদের একটিতে কিছু কষ্টিক সোডা এবং অপরটিতে কষ্টিক পটাস লও। এখন পরীক্ষা-নলে খানিকটা জল ঢালিয়া ভালভাবে ঝাঁকাও এবং পরীক্ষা-নলস্থিত প্রতিটি মিশ্রণে এক একটি লাল লিটমাস কাগজ ডুবাও। লাল কাগজ নীল হইয়া যাইবে।

অতএব, দেখিতে পাইতেছ অ্যাসিডে নীল লিটমাস লাল এবং ক্ষারে লাল লিটমাস নীল হয়।

(iii) ক্ষারের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-পরিবাহক। (iv) ক্ষার ব্যাপক অর্থে ক্ষারক এবং ফলে উহার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করে, অর্থাৎ অ্যাসিডের সহিত ক্রিয়া করিয়া লবণ ও জল উৎপন্ন করে। এই প্রশমনক্রিয়ায় অ্যাসিডের অম্লত্ব ও ক্ষারের ক্ষারত্ব নষ্ট হইয়া যায়।

$$NaOH + HCl = NaCl + H_2O$$

| NaOH | HCl | NaCl | $H_2O$ |
|---|---|---|---|
| সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড | হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড | সোডিয়াম ক্লোরাইড | জল |

**পরীক্ষা :** একটি বিকারে অল্প একটু কষ্টিক সোডা লইয়া উহাতে কিছু জল ঢাল এবং ভালভাবে নাড়িয়া দ্রবীভূত কর। ঐ দ্রবণে দুই-এক ফোঁটা লাল লিটমাস যোগ কর, মিশ্রণ সুন্দর নীল হইবে। মিশ্রণে অল্প অল্প করিয়া যে-কোন অ্যাসিডের (হাইড্রোক্লোরিক বা সালফিউরিক) লঘু দ্রবণ-ঢালিতে থাক এবং প্রতিবার ঢালিবার পর ভালভাবে নাড়িয়া দাও। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে মিশ্রণের নীল রঙ দূরীভূত হইয়া উহা লাল হইয়াছে।

**5-3. লবণ :** লবণ বলিতে খাদ্যের সহিত যে পদার্থটিকে আমরা প্রত্যহ গ্রহণ করি, সাধারণত তাহাই বুঝিয়া থাকি। কিন্তু রসায়নে আরও ব্যাপক অর্থে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই শব্দটিও শ্রেণীবাচক। তোমরা অ্যাসিড ও ক্ষারকের আলোচনা প্রসঙ্গে জানিয়াছ যে, কোন ধাতু বা ধাতুর ন্যায় প্রকৃতিসম্পন্ন কোন পরমাণু-যুটি অ্যাসিডের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপিত করিয়া যে-যৌগ গঠন করে তাহাকে **লবণ** ( salt ) বলে। যেমন, পটাসিয়াম ক্লোরাইড (KCl) একটি লবণ, কারণ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ( HCl ) হাইড্রোজেন যেন পটাসিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

প্রত্যেক লবণের অণুতে দুইটি অংশ আছে। প্রথম অংশে থাকে ক্ষারকীয় মূলক অর্থাৎ কোন ধাতু বা ধাতুর প্রকৃতিসম্পন্ন কোন যুটি এবং দ্বিতীয় অংশে থাকে অম্লাংশ অর্থাৎ প্রধানত কোন অ-ধাতুর পরমাণু বা তাহাদের যুটি। গলিত লবণ এবং লবণের জলীয় দ্রবণ বিদ্যুৎ-পরিবাহী।

## প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :

অ্যাসিড, ক্ষারক, ক্ষার, লবণ এবং প্রশমন ক্রিয়া।

2. 'অ্যাসিড' এবং 'ক্ষারক' বলিতে কি বুঝ? 'ক্ষারক' এবং 'ক্ষারের' মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি? উদাহরণ সহ উত্তর লিখ।

3. 'অ্যাসিড' এবং 'ক্ষারের' বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে লিখ।

4. 'ক্ষার মাত্রেই ক্ষারক কিন্তু সকল ক্ষারক ক্ষার নহে'—আলোচনা কর। একটি উদাহরণের সাহায্যে 'প্রশমন ক্রিয়া' বলিতে কি বুঝ তাহা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা কর।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

### A. Alternate response type :

*Yes or No type* :

(i) অ্যামোনিয়া কি একটি ক্ষারক? —

(ii) অ্যাসিডে কি প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু থাকে? —

(iii) সকল ক্ষারকই কি অ্যাসিডের সহিত বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন করে? —

(iv) ক্ষার মাত্রেই কি ক্ষারক? —

### B. Recall type :

(i) অ্যাসিডের সংস্পর্শে নীল লিটমাস — হয়। —

(ii) জলে দ্রবণীয় হাইড্রক্সাইডগুলিকে — বলে। —

(iii) — ক্রিয়ায় অ্যাসিডের অম্লত্ব এবং ক্ষারকের ক্ষারকত্ব নষ্ট হইয়া যায়। —

### C. Completion type :

অ্যাসিড হইতে কোন বিশেষ ধাতু বা তজ্জাতীয়—(a) দ্বারা — (b) —(a), —(b)

পরমাণু —(c) করা যায়। ফলে, ধাতুর পরমাণু বা তজ্জাতীয় —(d) —(c), —(d)

সহিত অম্লাংশের সংযোগে নূতন যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি হয়। নূতন

এই যৌগকে —(e) বলে। — (e)

## ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ জারণ ও বিজারণ (Oxidation and reduction)

রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী যাহা বিশেষ-ভাবে চর্চা বা অনুশীলন করা প্রয়োজন তাহা হইল 'জারণ-বিজারণ' বিক্রিয়া।

**6-1. জারণ ও বিজারণ :** বায়ু বা অক্সিজেনে কার্বন জলিলে কার্বনের অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় কার্বনের সহিত অক্সিজেন যুক্ত হয়। কপার অক্সাইডকে হাইড্রোজেন প্রবাহে উত্তপ্ত করিলে ধাতব কপার উৎপন্ন হয়। এখানে কপার অক্সাইড হইতে অক্সিজেন অপসারিত হয়। প্রারম্ভে বা বহু বৎসর পূর্বে অক্সিজেনের সহিত এই সংযোগের নাম **জারণ** ( oxidation ) এবং ইহার ঠিক বিপরীত প্রক্রিয়ার অর্থাৎ অক্সিজেন অপসারণের নাম **বিজারণ** ( reduction ) দেওয়া হইয়াছিল। এই সংজ্ঞানুসারে বলা যায় কার্বন জারিত হইয়া উহার অক্সাইডে এবং কপার অক্সাইড বিজারিত হইয়া কপারে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং,

**জারণ**=অক্সিজেন-সংযোগ, **বিজারণ**=অক্সিজেন-অপসারণ।

আবার রাসায়নিক ধর্মের বিচারে হাইড্রোজেন ঠিক অক্সিজেনের বিপরীত। এই বিপরীত চরিত্রের জন্যই হাইড্রোজেনের এবং অক্সিজেনের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ প্রবল। সুতরাং সংজ্ঞা দুইটির অর্থের পরিধি আর একটু প্রসারিত করিয়া 'হাইড্রোজেন-অপসারণ' এবং 'হাইড্রোজেন-সংযোগ' ইহার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। যেহেতু হাইড্রোজেন-সংযোগের ফল অক্সিজেন-সংযোগের ঠিক বিপরীত,

**জারণ**=হাইড্রোজেন-অপসারণ ; **বিজারণ**=হাইড্রোজেন-সংযোগ।

রসায়ন বিজ্ঞানীরা পরে বুঝিতে পারেন যে অক্সিজেনের আচরণ প্রকৃতপক্ষে তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌলের এবং কাজেই হাইড্রোজেনের আচরণ তড়িৎ-ধনাত্মক মৌলের আচরণের প্রতীক স্বরূপ। সুতরাং, সংজ্ঞা দুইটির অর্থের পরিধি আরও বিস্তৃত করা হইয়াছে।

যে প্রক্রিয়ায় (i) কোন পদার্থের সহিত অক্সিজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল বা মূলক যুক্ত হয় ( বা ইহাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায় ) **অথবা,** (ii) কোন পদার্থ হইতে হাইড্রোজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ-ধনাত্মক

মৌল বা মূলক অপসারিত হয় ( বা ইহাদের অনুপাত হ্রাস পায় ) তাহাকে **জারণ** বলে।

**দৃষ্টান্ত :** কার্বনের, কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণতি $C+O_2=CO_2$ **অক্সিজেন সংযোগ** দ্বারা জারণের দৃষ্টান্ত।

স্ট্যানাস ক্লোরাইডের সহিত ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় স্ট্যানিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় : $SnCl_2$ ( স্ট্যানাস ) $+Cl_2=SnCl_4$ ( স্ট্যানিক )। এখানে **তড়িৎ-ঋণাত্মক** ক্লোরিনের **সংযোগে** স্ট্যানাস ক্লোরাইড স্ট্যানিক ক্লোরাইডে জারিত হইয়াছে।

ব্রোমিনের জলীয় দ্রবণে হাইড্রোজেন সালফাইড পরিচালিত করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড জারিত হইয়া সালফারে পরিণত হয় ; $H_2S+Br_2=2HBr+S$। হাইড্রোজেন সালফাইডের **হাইড্রোজেন** অপসারিত হওয়ায় উহা জারিত হইয়াছে।

**তড়িৎ-ধনাত্মক উপাদান** পটাসিয়ামকে **অপসারিত** করিয়া ওজোন KI-কে আয়োডিনে জারিত কর : $O_3+2KI+H_2O=2KOH+I_2+O_2$

জারণের বিপরীত প্রক্রিয়ার নাম **বিজারণ**। সুতরাং, যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় (i) কোন পদার্থের সহিত হাইড্রোজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ-ধনাত্মক মৌল বা মূলক যুক্ত হয় ( বা ইহাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায় ) **অথবা,** (ii) কোন পদার্থ হইতে অক্সিজেন কিংবা অন্য কোন তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল বা মূলক অপসারিত হয় ( বা ইহাদের অনুপাত হ্রাসপ্রাপ্ত হয় ) তাহাকে **বিজারণ** বলে।

**দৃষ্টান্ত :** ক্লোরিনের সহিত হাইড্রোজেন সালফাইডের বিক্রিয়ায় **হাইড্রোজেন সংযোগে** ক্লোরিন বিজারিত হইয়া HCl-এ পরিণত হয় ; $Cl_2+H_2S=2HCl+S$।

মারকিউরিক ক্লোরাইডের সহিত মারকারি উত্তপ্ত করিলে মারকিউরিক ক্লোরাইড বিজারিত হয় : $HgCl_2+Hg=Hg_2Cl_2$। **তড়িৎ-ধনাত্মক** মৌল মারকারি-**সংযোগে** মারকিউরিক ক্লোরাইড মারকিউরাস ক্লোরাইডে বিজারিত হইয়াছে।

উত্তপ্ত লেড অক্সাইডের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাসের বিক্রিয়ায় লেড অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতব লেডে পরিণত হয় : $PbO+H_2=Pb+H_2O$ ; এখানে লেড অক্সাইডের **অক্সিজেন অপসারিত** হইয়াছে।

উত্তপ্ত ধাতব সোডিয়ামের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড ধাতব অ্যালুমিনিয়ামে পরিণত হয় : $AlCl_3+3Na=3NaCl+Al$; অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড হইতে **তড়িৎ-ঋণাত্মক মৌল** ক্লোরিন **অপসারিত** হওয়ায় উহা ধাতব অ্যালুমিনিয়ামে বিজারিত হইয়াছে।

6-2. **জারক ও বিজারক :** হাইড্রোজেন সালফাইডের সহিত ব্রোমিনের বিক্রিয়াটি স্মরণ কর। এই বিক্রিয়ায় দেখা যায় হাইড্রোজেন সালফাইডের হাইড্রোজেন অপসারণের ফলে হাইড্রোজেন সালফাইড **জারিত** হইয়া সালফারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আবার ব্রোমিনের সহিত হাইড্রোজেন সালফাইডের হাইড্রোজেনের সংযোগ ঘটিয়াছে এবং ব্রোমিন হাইড্রোজেন ব্রোমাইডে **বিজারিত** হইয়াছে। এইরূপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে **একই বিক্রিয়ায়** জারণ ও বিজারণ একই সঙ্গে ঘটিতেছে, অর্থাৎ **জারণ ও বিজারণ যুগপৎ সম্পন্ন হয়**। এক্ষেত্রে ব্রোমিন জারক ( oxidising agent বা oxidant ) দ্রব্য। সুতরাং **জারক দ্রব্য** ব্রোমিন **বিজারিত** হইয়াছে। অন্যভাবেও বলা যায় যে, হাইড্রোজেন সালফাইড এক্ষেত্রে বিজারক দ্রব্য ( reducing agent বা reductant ) হিসাবে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সুতরাং **বিজারক দ্রব্য** হাইড্রোজেন সালফাইড **জারিত** হইয়াছে।

অতএব, যে-পদার্থ জারণ কার্য ঘটায় এবং নিজে বিজারিত হয় তাহাকে **জারক দ্রব্য** বলে ; আর যে-পদার্থ বিজারণ কার্য ঘটায় এবং নিজে জারিত হয় তাহাকে **বিজারক দ্রব্য** বলে।

## প্রশ্নাবলী

1. 'জারণ ও বিজারণ' কাহাকে বলে তাহা বিভিন্ন উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
2. 'জারণ ও বিজারণ যুগপৎ ঘটে'—আলোচনা কর।
3. জারক ও বিজারক দ্রব্য বলিতে কি বুঝ ? উপযুক্ত উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।
4. জারণ মাত্রেই কি অক্সিজেন-সংযোগ এবং সকল জারক দ্রব্যেই কি অক্সিজেন থাকা প্রয়োজন ? উদাহরণসহ উত্তর লিখ।
5. নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলির কোন্‌টি জারণ এবং কোন্‌টি বিজারণ ?

(i) $FeCl_3 \longrightarrow FeCl_2$, (ii) $CuO \longrightarrow Cu_2O$, (iii) $Al \longrightarrow AlCl_3$

প্রতিক্ষেত্রে তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

6. নিম্নে কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ দেওয়া হইয়াছে। প্রতিটি বিক্রিয়ায় কোন্টি জারক এবং কোন্টি বিজারক দ্রব্য, কোন্টি জারিত হয় এবং কোন্টি বিজারিত হয় তাহা যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দাও :—

(i) $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$,

(ii) $Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2$,

(iii) $CuO + H_2 = Cu + H_2O$,

(iv) $2H_2 + O_2 = 2H_2O$,

(v) $2H_2S + SO_2 = 2H_2O + 3S$,

(vi) $ZnO + C = Zn + CO$,

(vii) $Cl_2 + H_2O + H_2SO_3 = H_2SO_4 + 2HCl$,

7. তিনটি জারক এবং তিনটি বিজারক দ্রব্যের নাম কর। প্রতিটি জারক দ্রব্যের একটি করিয়া জারণ কার্যের এবং প্রতিটি বিজারক দ্রব্যের একটি করিয়া বিজারণ কার্যের উদাহরণ দাও। সমীকরণগুলি লিখ।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

### A Alternate response type

(i) *True or False type*

(a) জারণ ও বিজারণ যুগপৎ ঘটে। —

(b) জারণ অর্থে সর্বদাই অক্সিজেন-সংযোগ বুঝায়। —

(ii) *Yes or No type*

(a) যে-পদার্থ জারণ কার্য ঘটায় সে-পদার্থ কি বিজারিত হয়? —

(b) কোন পদার্থে তড়িৎ-ধনাত্মক মৌলের অনুপাত বৃদ্ধি কি জারণ? —

### B. Recall type

(i) জারণের ঠিক — প্রক্রিয়ার নাম বিজারণ। —

(ii) কোন যৌগের তড়িৎ-ঋণাত্মক উপাদানের অনুপাত — পাইলে ঐ যৌগ জারিত হইয়াছে বলা যায়। —

### C. Completion type

যে-প্রক্রিয়ায় কোন পদার্থের সহিত — (a) কিংবা অন্য কোন — (b) —(a),—(b)
মৌল বা মূলক — (c) হয় (বা ইহাদের অনুপাত বৃদ্ধি পায়) অথবা —(c)
কোন পদার্থ হইতে — (d) কিংবা অন্য কোন — (e) মৌল বা মূলক —(d), —(e)
— (f) হয় (বা ইহাদের অনুপাত হ্রাস পায়) তাহাকে বিজারণ বলে। —(f)

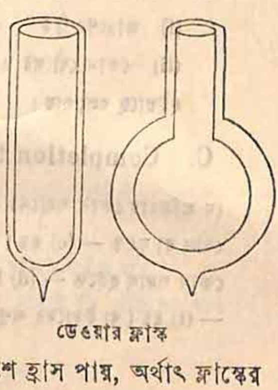
## সপ্তম অধ্যায়ঃ

## বায়ু
## ( Air )

বায়ু প্রধানতঃ অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের মিশ্রণ; ইহাতে স্বল্প পরিমাণে জলীয় বাষ্প, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও তথাকথিত নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ বর্তমান। যেহেতু বায়ু একটি মিশ্র পদার্থ, ইহাতে উপাদানসমূহের অনুপাত সর্বদা এবং সর্বত্র এক থাকে না। যাহা হউক, আয়তন হিসাবে বায়ুতে উহার উপাদানসমূহের শতকরা সংযুতি ( percentage composition ) মোটামুটি :— নাইট্রোজেন—78·1, অক্সিজেন—20·90, আর্গন ইত্যাদি নিষ্ক্রিয় গ্যাস—0·94, কার্বন ডাই-অক্সাইড—0·03।

**7·1. তরল বায়ু ( Liquid air ) :** অনুসন্ধানের ফলে এখন ইহা সুস্পষ্ট যে, কোন গ্যাসকে তরলে পরিণত করিতে হইলে উহাকে শীতল করিয়া অবশ্যই বিশেষ এক তাপমাত্রার নীচে আনিতে হইবে। গ্যাসের প্রকৃতির উপর উহার এই বিশেষ তাপমাত্রা নির্ভর করে এবং ইহার উচ্চতর তাপমাত্রায় ঐ গ্যাসের উপর যত চাপই প্রয়োগ করা হউক না কেন, উহা তরলে পরিণত হয় না।

পূর্বোক্ত লব্ধ জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগে বায়ুর তরলীকরণ সম্ভব হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে গলিত ( fused ) ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং কলিচুনের ( slaked lime ) সাহায্যে বায়ু হইতে যথাক্রমে জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারিত করা হয়। জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বিমুক্ত এই বায়ুকে চাপ ও শৈত্যের যথোপযুক্ত প্রয়োগে তরলে পরিণত করা হয়।



ডেওয়ার ফ্লাস্ক

তরল বায়ু দুই দেওয়াল বিশিষ্ট ডেওয়ার ( থার্মো—Thermos ) ফ্লাস্কে রাখা হয়। দেওয়াল দুইটির মধ্যবর্তী স্থান যথাসম্ভব বায়ুশূন্য করা হইয়া থাকে। বাহিরের দেওয়ালের ভিতর দিকে এবং ভিতরের দেওয়ালের বাহিরের দিকে রূপার একটি আবরণ থাকে। এই ব্যবস্থায় তাপ সঞ্চালন অনেকাংশে হ্রাস পায়, অর্থাৎ ফ্লাস্কের বাহির হইতে ভিতরে বা ভিতর হইতে বাহিরে তাপ সহজে যাইতে পারে না।

তরল বায়ুর স্ফুটনাঙ্ক −190°, কঠিন কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং বরফের কণার অবস্থিতির দরুন ইহাকে সাধারণত ঘোলাটে দেখায়। ইহাকে পরিস্রাবণ করিলে পরিস্রুৎটি স্বচ্ছ হয় এবং তরল অক্সিজেনের দরুন এই স্বচ্ছ তরল বায়ু দেখিতে ফিঁকে নীল রঙের হয়। ইহাকে বায়ুতে ঢালিলে ইহা বাষ্পীভূত হয় এবং ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের ঘন সাদা মেঘের সৃষ্টি হয়। তরল বায়ুর প্রচণ্ড শৈত্যের প্রভাবে বহু পদার্থের ধর্মের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ঘটে। যেমন, কাঁচা মাংস, ফল ইত্যাদি শক্ত হইয়া যায় এবং থলে ইহাদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া গুঁড়ায় পরিণত করা যায়। ফুলসমূহকে হাতের মধ্যেই গুঁড়ায় পরিণত করা যায়। পারদ একটি তরল ধাতু; এই তীব্র শৈত্যের প্রভাবে ইহা জমিয়া নমনীয় কঠিন অবস্থা লাভ করে। সীসা নামক ধাতু স্থিতিস্থাপক (elastic) নয়, কিন্তু তরল বায়ুতে শীতল করিলে উহা এই ধর্ম সবিশেষ দর্শাইয়া থাকে এবং ঘণ্টাকৃতি সীসার বস্তুতেও আঘাত করিলে উহা বাজিয়া উঠে। গন্ধকের ফিঁকে হলুদ রঙ আরও ফিঁকে হইয়া যায়, ইত্যাদি।

তরল বায়ু হইতে আংশিক পাতনের সাহায্যে বায়ুমণ্ডলীয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ বিচ্ছিন্ন করা যায়। বায়ুর মূল উপাদানদ্বয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের শিল্পোৎপাদনের একটি উৎস এই তরল বায়ু।

**7-2. নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen cycle):** উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবনধারণের জন্য নাইট্রোজেন একেবারেই অপরিহার্য। নাইট্রোজেন ঘটিত এক প্রকার জটিল যৌগকের নাম প্রোটিন এবং এই প্রোটিন জাতীয় পদার্থ ইহাদের কলার (tissues) গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন আছে; কিন্তু কিছু জীবাণু (bacteria), শেওলা (algae), ছত্রাক (fungus) ইত্যাদির কথা ছাড়িয়া দিলে কোন প্রাণী বা উদ্ভিদ বায়ু হইতে সরাসরি নাইট্রোজেন আত্তীকরণ (assimilation) করিতে পারে না।

বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎক্ষরণকালে যে প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন হয় তাহাতে বায়ুমণ্ডলস্থিত কিছু নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে। পরে উহা বায়ুর দ্বারা জারিত হয় এবং জলে দ্রবীভূত হইয়া নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিণত হয়। ইহা বৃষ্টির সহিত মাটিতে পড়িয়া মাটির নানাবিধ ক্ষারকের সহিত বিক্রিয়া করে এবং ফলে দ্রবণীয় বিভিন্ন নাইট্রেট লবণ উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ মূলরোমের সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে দ্রবণীয় নাইট্রেট

গ্রহণ করে এবং তাহা হইতে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য নিজদেহে প্রস্তুত করে। উদ্ভিদ্ কর্তৃক বায়ুর নাইট্রোজেন দেহসাৎ করিবার ইহাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। অর্থাৎ উদ্ভিদ্ সাধারণত মাটি হইতে নাইট্রোজেন লয়।

সুতরাং, যে জমিতে ফসল জন্মান হয় সেখানকার মাটির নাইট্রোজেন ক্রমে নিঃশেষ হইয়া যায়। ফলে জমির উৎপাদিকাশক্তি ক্রমশঃ কমিয়া যায়। সাধারণত উদ্ভিদ্ যদিও মাটি হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে ; শিম, মটর প্রভৃতি শিম্বিজাতীয় ( leguminous ) উদ্ভিদেরা বায়ু হইতে পরোক্ষভাবে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে। এই সকল উদ্ভিদের মূল এক প্রকার জীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়, ফলে উহাদের মূলে একপ্রকার গুটি ( nodule ) জন্মে। ঐ গুটির মধ্যে জীবাণু বাস করে। উহারা বায়ু হইতে নাইট্রোজেন গ্রহণ করে এবং পরে উহাকে নাইট্রেটে পরিণত করিয়া উদ্ভিদ্‌কে দেয়। একই জমিতে পর্যায়ক্রমে ধান ও শিম্বিজাতীয় ফসল চাষ করাকে **পর্যায়ক্রমিক চাষ** ( crop rotation ) বলে এবং এইভাবে জমির উর্বরতা বজায় রাখা যায়।

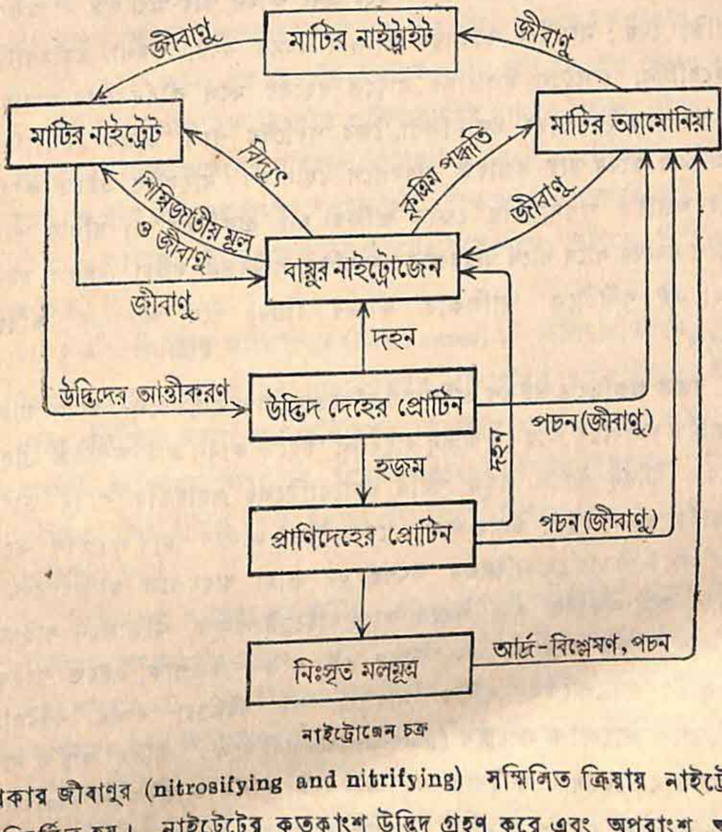
বর্তমানে প্রধানত নানা রকমের অজৈব ও জৈব সার (যেমন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, জীবজন্তুর মলমূত্র, খইল, হাড়ের গুঁড়া, পচা পাতা ইত্যাদি) মাটির সহিত মিশাইয়া কৃত্রিম উপায়ে জমির উর্বরতা বজায় রাখা হয় বা উহা বাড়ানো হয়। উদ্ভিদ্ কিন্তু সরাসরি অ্যামোনিয়া গ্রহণ করে না। সারের মাধ্যমে মাটিতে অ্যামোনিয়া দিলে মাটির কিছু জীবাণু উহাকে নাইট্রাইট ও পরে নাইট্রেটে পরিণত করিয়া উদ্ভিদের খাদ্যোপযোগী করিয়া তোলে।

উপরোক্ত উপায়ে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করিয়া উদ্ভিদ্ নিজদেহে নাইট্রোজেন ঘটিত খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রাণীরা কিন্তু উহাদের প্রয়োজনীয় ঐ খাদ্য কার্যতঃ উদ্ভিদ্ হইতে সংগ্রহ করে ;—মাংসাশী জন্তুরা তৃণভোজী প্রাণীর মাংস হইতে প্রোটিন পাইয়া থাকে, আমরা উদ্ভিদ্ ও জীবজন্তু হইতে প্রোটিন পাইয়া থাকি।

এখন স্বভাবতঃই তোমরা মনে করিতে পার যে, পূর্বোক্ত প্রক্রিয়াসমূহ যখন ক্রমাগত চলিতেছে, তখন অবশ্য একদিন বায়ুর নাইট্রোজেন ভাণ্ডার নিঃশেষ হইয়া যাইবে ; কিন্তু তাহা হয় না। প্রকৃতিতে আর কতকগুলি প্রক্রিয়া পাশাপাশি চলিতেছে যাহার ফলে নাইট্রোজেন উৎপন্ন হইয়া বায়ুর নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা করিতেছে।

প্রাণী মলমূত্রের মাধ্যমে নাইট্রোজেন ঘটিত যৌগ যেমন ইউরিয়া পরিত্যাগ করে এবং ইহা সহজেই আর্দ্র-বিশ্লেষিত হইয়া অ্যামোনিয়া এবং কার্বন ডাই-অক্সাইডে পরিণত হয়। $CO(NH_2)_2 + H_2O \rightarrow 2NH_3 + CO_2$। প্রাণীর

দেহনিঃসৃত সামগ্রীর পচনেও অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মরিয়া যাইবার পর উহাদের পচন আরম্ভ হয়। ইহাদের দেহস্থ প্রোটিন এই সময় প্রধানত অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এই পদার্থ মাটির মধ্যস্থ বিভিন্ন




নাইট্রোজেন চক্র

প্রকার জীবাণুর (nitrosifying and nitrifying) সম্মিলিত ক্রিয়ায় নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। নাইট্রেটের কতকাংশ উদ্ভিদ্ গ্রহণ করে এবং অপরাংশ আর এক প্রকার জীবাণুর (denitrifying bacteria) ক্রিয়ায় নাইট্রোজেনে পরিণত হয়। ইহা ছাড়া, উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহের দহনের ফলেও নাইট্রোজেন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নাইট্রোজেন বায়ুর নাইট্রোজেন ভাণ্ডারের ক্ষয় পূরণ করে।

এইভাবে বায়ু হইতে অপসারিত হইয়া নাইট্রোজেনের উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে প্রবেশ এবং তথা হইতে উহাদের ধ্বংস, পচন ইত্যাদির মাধ্যমে আবার বায়ুতে ফিরিয়া আসার যে অবিরাম আবর্তন প্রকৃতিতে চলিতেছে তাহাকে **নাইট্রোজেন-চক্র** বলে।

**7-3. কার্বনচক্র (Carbon cycle) :** বায়ুমণ্ডলে আয়তন হিসাবে শতকরা 0·03 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড আছে। নানাভাবে সদাসর্বদা আরও কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে আসিয়া মিশিতেছে। উদ্ভিদ্ ও প্রাণী শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয় ; নানাবিধ কার্বনযুক্ত জ্বালানি যেমন কাঠ, কয়লা, মোমবাতি, কেরোসিন, পেট্রোল ইত্যাদির বায়ুতে দহনের ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় ; ইহা ছাড়া সন্ধানক্রিয়া, জৈব পদার্থের পচন, প্রস্রবণ ইত্যাদিও কম-বেশী কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে যোগায়। বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণের কোন প্রক্রিয়া যদি প্রকৃতিতে না চলিত তাহা হইলে সময়ের সাথে সাথে বায়ুমণ্ডলের সংযুতির পরিবর্তন ঘটিয়া এইরূপ হইত যাহা এই পৃথিবীকে আজিকার জীবের (life) পক্ষে অনুপযুক্ত করিয়া তুলিত।

বস্তুত প্রকৃতিতে এইরূপ প্রক্রিয়াও চলিতেছে যাহা বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করে। উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদ্ উহার সবুজ পদার্থ ক্লোরোফিলের সহায়তায় কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল হইতে উহার খাদ্য কার্বোহাইড্রেট জাতীয় পদার্থ সংশ্লেষণ করে এবং এই বিক্রিয়ায় যে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় তাহা বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলকে কার্বোহাইড্রেট ও মুক্ত অক্সিজেনে পরিণত করিতে শক্তির প্রয়োজন এবং উদ্ভিদ্ এই শক্তি সূর্যালোক হইতে পাইয়া থাকে। সূর্যালোকের শক্তির সাহায্যে এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করিবার প্রক্রিয়াকে **সালোক-সংশ্লেষ** (photosynthesis) বলে। উদ্ভিদ্ কর্তৃক বায়ু হইতে কার্বন দেহসাৎ করিবার এই প্রক্রিয়াটি **কার্বন-আত্তীকরণ** (carbon assimilation নামেও পরিচিত। সালোক-সংশ্লেষ অর্থাৎ কার্বন-আত্তীকরণ কেবল সূর্যালোকেই সংঘটিত হয় বলিয়া উদ্ভিদের ক্ষেত্রে দুইটি বিপরীত স্বভাব দেখা যায়। দিনের বেলায় উদ্ভিদ্ স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়ায় অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিত্যাগ করে, কিন্তু কার্বন আত্তীকরণ-কালে উহা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। আবার রাত্রি বেলায় কার্বন-আত্তীকরণ প্রক্রিয়া ঘটে না শুধু শ্বাস-কার্যের জন্য উদ্ভিদ্ বায়ু হইতে অক্সিজেন গ্রহণ করে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয়। শ্বাস গ্রহণকালে উদ্ভিদ্ যে-অক্সিজেন গ্রহণ করে তাহার মোট

পরিমাণ কার্বন-আত্তীকরণ কালে উহা যে-অক্সিজেন ছাড়িয়া দেয় তাহা অপেক্ষা কম ; আবার কার্বন-আত্তীকরণে উদ্ভিদ্ যে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে তাহার মোট পরিমাণ উহা শ্বাস-ক্রিয়ার সময় যে কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে ছাড়িয়া দেয় তাহা অপেক্ষা বেশী। সুতরাং সামগ্রিকভাবে উদ্ভিদ্ বায়ুমণ্ডল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড অপসারণ করে এবং বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

ইহা ছাড়া, নানা প্রকারের শিলা বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে।

এই সকল প্রাকৃতিক বিপরীত প্রক্রিয়াসমূহের মাধ্যমে বায়ুতে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অক্সিজেনের পরিমাণ মোটামুটি অপরিবর্তিত থাকে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের উৎপন্ন হওয়া, তথা হইতে উহার অপসারণ এবং পুনরায় ফিরিয়া আসার এই যে অবিরাম আবর্তন চলিতেছে তাহাকে **কার্বন-চক্র** বলে।

**7-4. নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ (Inert gases) ঃ** হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন এবং র‍্যাডন সাধারণভাবে রাসায়নিক ধর্মের বিচারে নিষ্ক্রিয় বলিয়া **নিষ্ক্রিয় গ্যাস** নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে কেবল র‍্যাডন ছাড়া অবশিষ্ট গ্যাসসমূহ বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান এবং বায়ুমণ্ডলে ইহাদের অতি স্বল্প পরিমাণে অবস্থিতির দরুন ইহারা বায়ুমণ্ডলীয় **বিরল** (rare) গ্যাস নামেও অভিহিত হয়।

নিষ্ক্রিয় এই গ্যাসসমূহের উল্লেখযোগ্য নানারকম ব্যবহারিক প্রয়োগ আছে। হিলিয়াম অদাহ্য এবং হালকা বলিয়া বায়ুযানের গ্যাসাধারসমূহ ভর্তি করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়। ডুবুরীদের শ্বাসক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রে বায়ুর পরিবর্তে অক্সিজেন এবং হিলিয়ামের মিশ্রণ ব্যবহৃত হয়। গ্যাস থার্মোমিটারে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

ধাতব ফিলামেণ্টযুক্ত বৈদ্যুতিক বাল্‌বে আর্গন ব্যবহৃত হয়, ইহার উপস্থিতিতে ফিলামেণ্টকে উচ্চতর উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা যায়। উচ্চতর তাপমাত্রায় ফিলামেণ্টের ধাতব পদার্থের বাষ্পীভূত হইবার যে প্রবণতা থাকে, নিষ্ক্রিয় এই গ্যাসের উপস্থিতিতে তাহা হ্রাস পায়। ফলে, বায়ুশূন্য ফাঁপা গোলক হইতে যে ধরনের শুভ্র আলোক নির্গত হয়, এই বাল্‌ব তদপেক্ষা অধিক শুভ্র আলোক প্রদান করে এবং ফিলামেণ্টের আয়ুষ্কালও বৃদ্ধি পায়। বৈদ্যুতিক প্রথায় ধাতুসমূহ জোড় দেওয়ার (arc welding) কাজে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করিতে আর্গন ব্যবহৃত হয়।

অষ্টম অধ্যায়ঃ

# সাধারণ পরিচিত গ্যাসসমূহ
# (Commonly Known Gases)

## ৪-1. অক্সিজেন ( Oxygen )

চিহ্ন O, সংকেত $O_2$, পারমাণবিক গুরুত্ব 16·000 ( সংজ্ঞা অনুযায়ী )।

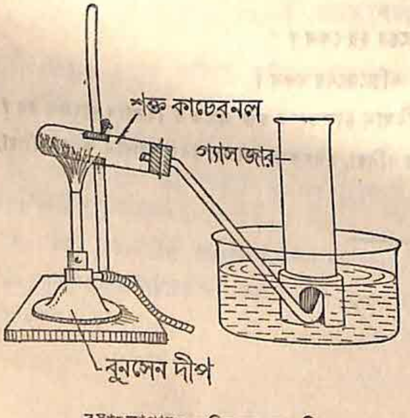
বায়ুমণ্ডলে মুক্ত অক্সিজেন আছে। যৌগ হিসাবে ইহা জল, শিলা ( rocks ), উদ্ভিদ্ ইত্যাদিতে বর্তমান। ভূ-ত্বকে মৌলসমূহের মধ্যে অক্সিজেনের পরিমাণ সর্বাধিক। ওজন হিসাবে ভূ-ত্বকের প্রায় শতকরা 50 ভাগই অক্সিজেন।

**প্রস্তুতি**—পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ একটি পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিয়া **রসায়নাগারে** অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয়।

$$2KClO_3 \; [ +MnO_2 ] = 2KCl \; [ +MnO_2 ] + 3O_2$$

ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড পটাসিয়াম ক্লোরেটের বিযোজন ত্বরান্বিত করে। এই বিক্রিয়ায় ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বা গঠন সংযুতির কোন পরিবর্তন ঘটে না, ইহা প্রভাবক (catalyst) হিসাবে কাজ করিয়া থাকে।

**পদ্ধতি ঃ** পাঁচভাগ পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং একভাগ ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইডের মিশ্রণ দ্বারা কাচের একটি শক্ত পরীক্ষা-নলের অর্ধেক ভর্তি কর। পরীক্ষা-নলটির মুখ সামান্য একটু নিম্নাভিমুখী করিয়া একটি দণ্ডের সহিত বন্ধনীর সাহায্যে আঁটিয়া দাও। পরীক্ষানলটির মুখের সহিত কর্কের ভিতর দিয়া একটি বাঁকান সরু নির্গম নল জুড়িয়া দাও; নির্গম-নলের অপর প্রান্ত গ্যাস দ্রোণীর জলের ভিতর ডুবাইয়া রাখ এবং উহার উপর একটি সচ্ছিদ্র চাক্তি (bee-hive shelf) বসাও। এইবার পরীক্ষানলটি ধীরে ধীরে সমানভাবে উত্তপ্ত কর। কিছু গ্যাস বাহির হইয়া গেলে জলপূর্ণ গ্যাসজারের মুখে একটি ঢাকনা দিয়া গ্যাসজারটি উপুড় করিয়া চাক্তির উপর রাখ এব ঢাক্না সরাইয়া লও। গ্যাসজার ভর্তি হইয়া গেলে উহার মুখে ঢাকনা আঁটিয়া দিয়া গ্যাসপূর্ণ জার জলের বাহিরে আন।




রসায়নাগারে অক্সিজেন প্রস্তুতি

এইরূপ অনেক যৌগ আছে যাহাদিগকে উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয় ; যেমন মারকিউরিক অক্সাইডকে উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া মারকারিতে পরিণত হয় এবং অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়। $2HgO = 2Hg + O_2$

বহু নাইট্রেটই তাপ প্রয়োগে বিযোজিত হয়। লেড নাইট্রেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে উহা বিযোজিত হইয়া লেড মনোক্সাইডে পরিণত হয় এবং নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড ও অক্সিজেন গ্যাস নির্গত হয়।

$$2Pb(NO_3)_2 = 2PbO + 4NO_2 + O_2.$$

একটি কূপীতে সোডিয়াম পার-অক্সাইড লইয়া বিন্দুপাতী ফানেল হইতে উহাতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া জল ঢালিয়া সহজেই অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায়। তাপপ্রয়োগের প্রয়োজন হয় না : $2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$

**অক্সিজেনের ধর্ম : ভৌতধর্ম :** অক্সিজেন স্বাদহীন, বর্ণহীন এবং গন্ধহীন গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা ঈষৎ ভারী এবং জলে স্বল্পপরিমাণে দ্রাব্য।

**রাসায়নিক ধর্ম :** অক্সিজেন দহনের সহায়ক কিন্তু নিজে অদাহ্য।

**পরীক্ষা :** একটি শলাকা জ্বালাও এবং উহাকে ফুঁ দিয়া শিখা নিভাইয়া দাও। এইবার শিখাহীন জ্বলন্ত শলাকাটি অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর প্রবেশ করাইয়া দাও। শলাকাটি আবার উজ্জ্বল শিখায় জ্বলিয়া উঠিবে, কিন্তু অক্সিজেন জ্বলিবে না।

বস্তুত অক্সিজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা খুব বেশী। কিছু কিছু **অ-ধাতু** অক্সিজেনে জ্বলিয়া অক্সাইড গঠন করে।

**পরীক্ষা :** এক টুকরা কাঠ-কয়লা একটি উজ্জ্বলন-চামচে লও এবং উহাকে উত্তপ্ত কর। যখন উহা লাল হইয়া আসিবে তখন উহাকে চামচ সহ অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে নামাইয়া দাও। দেখিবে যে কাঠকয়লা উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠিবে। এই জারের মধ্যে খানিকটা জল ঢাল এবং জারটিকে ঝাঁকাইয়া জারের ভিতরকার গ্যাস জলের সহিত ভাল করিয়া মিশাও। এই দ্রবণ নীল লিটমাস কাগজদ্বারা পরীক্ষা কর, দেখিবে নীল লিটমাস লাল হইয়া যাইবে।

কার্বন ও অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়, এই কার্বন ডাই-অক্সাইড জলে দ্রবীভূত হইয়া কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে। $C + O_2 = CO_2$, $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$।

পূর্বের মত উজ্জ্বলন চামচে ফস্‌ফরাস এবং সালফার উত্তপ্ত করিয়া পৃথকভাবে পরীক্ষা কর। উভয়ক্ষেত্রেই মৌলগুলি উহাদের অক্সাইডে পরিণত হয়, জলের সহিত ইহাদের মিলনে বিভিন্ন অ্যাসিডের সৃষ্টি হয় এবং নীল লিটমাস দিয়া পরীক্ষা করিলে দেখিবে নীল লীটমাস লাল হইয়া গিয়াছে।

$S + O_2 = SO_2$ ; $H_2O + SO_2 = H_2SO_3$ ( সালফিউরাস অ্যাসিড )।

**ধাতুর সহিত বিক্রিয়া ঃ** অনেক ধাতু উত্তপ্ত অবস্থায় অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইয়া অক্সাইড গঠন করে। বেশীর ভাগ ধাতব অক্সাইডই সাধারণত ক্ষারকীয় প্রকৃতিসম্পন্ন।

অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাসজারে উত্তপ্ত সোডিয়াম হলুদ রং-এর আলো ( এবং পটাসিয়াম বেগুনী রঙের আলো ) বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। সোডিয়াম পুড়িয়া সোডিয়াম অক্সাইড ( প্রধানত পার-অক্সাইড ) উৎপন্ন হয়। এই সোডিয়াম অক্সাইড জলের সহিত বিক্রিয়ায় কষ্টিক সোডা উৎপন্ন করে; কষ্টিক সোডা একটি ক্ষার এবং এই দ্রবণ লাল লিটমাসকে নীল করে। $2Na + O_2 = Na_2O_2$ ; $2Na_2O_2 + 2H_2O = 4NaOH + O_2$ ।

জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের তার অক্সিজেনপূর্ণ গ্যাস-জারে প্রখর সাদা আলোক-রশ্মি বিকীর্ণ করিয়া জ্বলিতে থাকে। ম্যাগনেসিয়াম জ্বলিয়া ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডে পরিণত হয়। এই ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইডের ভস্ম জলের সংস্পর্শে ধীরে ধীরে হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। ইহাতে ফিনল্‌থ্যালিন যোগ করিলে লাল রঙ উৎপন্ন হয়। $2Mg + O_2 = 2MgO$ ; $MgO + H_2O = Mg(OH)_2$ ।

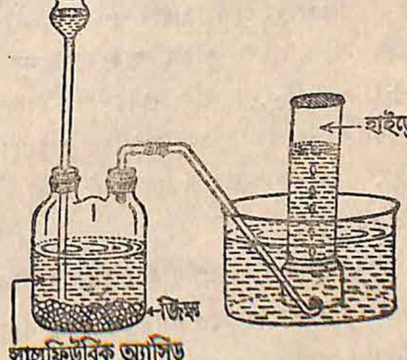
**যৌগিক পদার্থের সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঃ** স্বাভাবিক তাপ-মাত্রাতেই অনেক যৌগিক পদার্থের সহিত অক্সিজেন ক্রিয়া করে। অক্সিজেন সংস্পর্শে নাইট্রিক অক্সাইড বাদামী রঙের নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে ঃ $2NO + O_2 = 2NO_2$ । অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ায় সালফিউরাস অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিডে, ফেরাস লবণ ফেরিক লবণে পরিণত হয়; $2H_2SO_3 + O_2 = 2H_2SO_4$ । ক্রোমাস ক্লোরাইডের আম্লিক দ্রবণ, পটাসিয়াম পাইরোগ্যালেটের ক্ষারীয় দ্রবণ অক্সিজেন গ্যাসকে শোষণ করে।

## 8-2. হাইড্রোজেন (Hydrogen)

চিহ্ন H, সংকেত $H_2$, পারমাণবিক গুরুত্ব=1·008। ইহার প্রমাণ ঘনত্ব লিটার প্রতি 0·0899 গ্রাম।

সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করিয়াছেন সূর্যের আবহমণ্ডলের বহির্ভাগ প্রধানত হাইড্রোজেনে গঠিত। মুক্ত অবস্থায় হাইড্রোজেন বিশেষ পাওয়া না গেলেও যুক্ত অবস্থায় ( যৌগিক হিসাবে ) হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার প্রায় অফুরন্ত। ওজন হিসাবে জলের $\frac{1}{9}$ অংশ হাইড্রোজেন। খনিজ তৈল এবং প্রায় সকল প্রকার উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ পদার্থের একটি সাধারণ উপাদান ( common constituent) হাইড্রোজেন। ল্যাভয়সিয়র ইহার নাম রাখেন হাইড্রোজেন বা জল উৎপাদক ( গ্রীক hudor—জল, এবং genon—উৎপন্ন করা )।

**প্রস্তুতি : রসায়নাগার পদ্ধতি :** দুই মুখবিশিষ্ট একটি উল্ফ বোতলে খানিকটা দস্তার ছিবড়া* ( granulated zinc ) লও। বোতলের একটি মুখে একটি দীর্ঘ-নাল ফানেল এবং অপর মুখে ছবিতে যে-ভাবে দেখান হইয়াছে সেইভাবে একটি নির্গম-নল লাগাও। দীর্ঘ-নাল ফানেলের সাহায্যে কিছু জল ঢালিয়া দস্তার ছিবড়াগুলিকে ঢাকিয়া দাও। লক্ষ্য রাখিবে যে দীর্ঘ নাল ফানেলের প্রান্তটি যেন বোতলের তরলের ভিতর ডুবিয়া থাকে। নির্গম নলের অপর মুখটি গ্যাস-দ্রোণীর জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখ। হাইড্রোজেনের সহিত বায়ু মিশ্রিত হইলে একটি বিস্ফোরক মিশ্রণ উৎপন্ন হয় ; সুতরাং, সমগ্র যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি যাহাতে বায়ুনিরোধী† (air tight) হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিও। এইবার গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ( প্রতি 5-আয়তন জলে 1-আয়তন গাঢ় অ্যাসিড ) দীর্ঘ-নাল ফানেল দিয়া উল্ফ বোতলে ঢাল এবং যন্ত্রটিকে মাঝে মাঝে নাড়িয়া দাও। অ্যাসিড ও দস্তার সংস্পর্শ ঘটলে রাসায়নিক বিক্রিয়া আরম্ভ হয়—অ্যাসিডে দস্তা দ্রবীভূত হয় এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় :




উল্ফ-বোতলে হাইড্রোজেন প্রস্তুতি

$$Zn + H_2SO_4 = ZnSO_4 + H_2 \text{ ।}$$

কিছুক্ষণ গ্যাস বাহির হইয়া যাইতে দাও এবং পরে জলকে অপসারিত করিয়া গ্যাসজারে হাইড্রোজেন সংগ্রহ কর।

**ধর্ম : ভৌত ধর্ম :** বিশুদ্ধ হাইড্রোজেন একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। যদিও ইহা শ্বাসক্রিয়ার সহায়ক নহে, তবুও ইহা বিষাক্ত নহে। ইহা জলে প্রায় অদ্রাব্য বলিলেই চলে। ইহা সর্বাপেক্ষা হাল্কা গ্যাস, বায়ু হাই-

---

*তাপ-প্রয়োগে দস্তাকে গলাইয়া ঐ গলিত দস্তা সূক্ষ্ম ধারায় শীতল জলে ঢালিলে দস্তার ছিবড়া উৎপন্ন হয়।

† যন্ত্রটি যে সম্পূর্ণ বায়ুনিরুদ্ধ হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানিবার জন্য নির্গম নলের বাহিরের মুখে ফুঁ দাও। জল দীর্ঘ-নাল ফানেল বাহিয়া উপরে উঠে। এইবার মুখ সরাইয়া লইয়া নির্গম নলের এই মুখটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া ধর, যন্ত্রটি যদি সম্পূর্ণ বায়ু-নিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে জল একই স্থানে স্থির থাকিবে।

ড্রোজেনের 14·4 গুণ ভারী। একটি বেলুন হাইড্রোজেন দিয়া ভর্তি করিলে বেলুনটি বায়ুতে উড়িতে থাকে।

**রাসায়নিক ধর্ম :** হাইড্রোজেন দহনের সহায়ক নয় কিন্তু নিজে দাহ্য।

**পরীক্ষা :** হাইড্রোজেন গ্যাসে পূর্ণ একটি জার উপুড় করিয়া ধর এবং উহার মুখে একটি জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করাও, দেখিবে হাইড্রোজেন গ্যাস নিজে জারের মুখে ঈষৎ নীলাভ শিখায় জ্বলিতে থাকিবে কিন্তু শলাকাটি নিভিয়া যাইবে। সংগৃহীত গ্যাস হাইড্রোজেন কি-না তাহা এইভাবে অতি সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

বায়ুর অক্সিজেনের সহিত হাইড্রোজেনের সংযোগে জল উৎপন্ন হয় : $2H_2+O_2=2H_2O$। অক্সিজেনের প্রতি হাইড্রোজেনের আসক্তি খুবই বেশী। তাই উত্তপ্ত ধাতব অক্সাইডের উপর দিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করিলে, হাইড্রোজেন অনেক ধাতব অক্সাইডকেই ধাতুতে পরিণত করে ( জারণ-বিজারণ পৃঃ 39 দ্রষ্টব্য )।

বিশেষ বিশেষ পরিবেশে হাইড্রোজেন গ্যাস অনেক মৌলিক পদার্থের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইতে সক্ষম। ফুটন্ত সালফারের উপর দিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস পরিচালনা করিলে হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় : $H_2+S=H_2S$।

নাইট্রোজেন সরাসরি কিন্তু ধীরে ধীরে হাইড্রোজেনের সহিত যুক্ত হয়। উচ্চ চাপে ও তাপমাত্রায় হাইড্রোজেন এবং নাইট্রোজেনের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়ার শিল্পোৎপাদন করা হয়; লৌহচূর ( উদ্দীপক সহ ) এই বিক্রিয়ায় প্রভাবক হিসাবে কাজ করে।

$$3H_2+N_2\rightleftharpoons 2NH_3$$

আলোর বর্তমানে হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন পরস্পরে যুক্ত হইয়া হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস উৎপন্ন করে : $H_2+Cl_2=2HCl$

হাইড্রোজেন কেবল কয়েকটি উত্তপ্ত ধাতু যথা সোডিয়াম এবং ক্যালসিয়ামের সহিত যুক্ত হইয়া হাইড্রাইড নামক যৌগ গঠন করে : $2Na+H_2=2NaH$ ; $Ca+H_2=CaH_2$।

**জায়মান হাইড্রোজেন ( Nascent Hydrogen ) :** কোন মৌলের 'জায়মান অবস্থা' বলিতে—কোন যৌগ হইতে ঐ মৌলের জন্মক্ষণের অবস্থাকে বুঝায়। সেইরূপে হাইড্রোজেনের জন্মমুহূর্তে অর্থাৎ সদ্য উৎপন্ন অবস্থায় হাইড্রোজেনকে জায়মান হাইড্রোজেন বলা হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস অপেক্ষা এই অবস্থার হাইড্রোজেনের রাসায়নিক সক্রিয়তা অনেক বেশী।

পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলীয় দ্রবণের ভিতর দিয়া

হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত কর—পারম্যাঙ্গানেটের বর্ণের (বেগুনী) কোন পরিবর্তন হয় না। আবার পারম্যাঙ্গানেটের খানিকটা দ্রবণ লইয়া উহার সহিত দস্তা এবং সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত কর—সদ্যোজাত হাইড্রোজেন (জায়মান) পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেটকে বিজারিত করিয়া বর্ণহীন করে: $2KMnO_4+3H_2SO_4+10H=K_2SO_4+2MnSO_4+8H_2O$

এইরূপে পারম্যাঙ্গানেটের পরিবর্তে ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ লইয়া পরীক্ষা চালাইলেও একই ফলাফল দেখা যায়। সদ্যোজাত হাইড্রোজেন (জায়মান) ফেরিক ক্লোরাইডকে বিজারিত করিয়া বর্ণহীন করে, কিন্তু গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ইহা করিতে পারে না: $FeCl_3+H=FeCl_2+HCl$

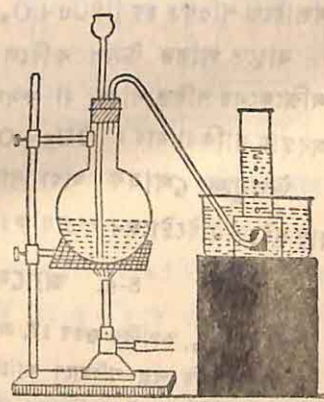
## 8-3. নাইট্রোজেন ( Nitrogen )

চিহ্ন N, আণবিক সংকেত $N_2$, পারমাণবিক গুরুত্ব 14।

মুক্ত অবস্থায় ইহা বায়ুমণ্ডলে বর্তমান এবং আয়তন হিসাবে বায়ুমণ্ডলের প্রায় শতকরা 78 ভাগই নাইট্রোজেন। যুক্ত অবস্থায় প্রোটিন হিসাবে ইহা উদ্ভিদ্ ও প্রাণিদেহে বর্তমান। চিলিতে সোডিয়াম নাইট্রেট ($NaNO_3$) হিসাবে এবং নাইটার বা সোরা ($KNO_3$) হিসাবে কোন কোন জায়গায় মাটিতে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন পাওয়া যায়।

শ্বাসকার্যের সহায়তা করে না বলিয়া ল্যাভয়সিয়র এই গ্যাসকে 'অ্যাজোট' (যাহার অর্থ হইতেছে নিষ্প্রাণ) নামে অভিহিত করেন। নাইটার অর্থাৎ পটাসিয়াম নাইট্রেটের ($KNO_3$) একটি উপাদান বলিয়া ইহার আধুনিক নামকরণ হইয়াছে নাইট্রোজেন।

**প্রস্তুতি: রসায়নাগার পদ্ধতি:** একটি দীর্ঘনাল ফানেল ও একটি নির্গম-নল-যুক্ত কাচের কূপীর (ছবিতে দেখান হইয়াছে) ভিতরে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও সোডিয়াম নাইট্রাইটের গাঢ় দ্রবণ তুল্য পরিমাণে লওয়া হয়। কূপীটিকে তারজালির উপর বসাইয়া খুব সতর্কভাবে সামান্য তাপ প্রয়োগ করা হয়—নাইট্রোজেন গ্যাস নির্গত হইতে থাকে। প্রথমে বায়ু বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া হয়। ইহার পর গ্যাস-দ্রোণীর ভিতর নির্গম-নলের মুখে জলভরা গ্যাসজার উপুড় করিয়া ধরিলে নাইট্রোজেন গ্যাসজারে সঞ্চিত হয়। $NH_4Cl+NaNO_2=NH_4NO_2+NaCl$; $NH_4NO_2=N_2+2H_2O$


রসায়নাগারে নাইট্রোজেন প্রস্তুতি

**ধর্ম ( Properties ):** ইহা একটি স্বাদহীন, গন্ধহীন ও বর্ণহীন গ্যাস। ইহা প্রায় বায়ুর সমান ভারী এবং জলে খুব সামান্য পরিমাণে দ্রবীভূত হয়।

এই গ্যাস নিতান্তই নিষ্ক্রিয় ; সাধারণ উষ্ণতায় অন্যান্য মৌলের সহিত যুক্ত হয় না। ইহা অপরের দহনের সহায়ক নহে বা নিজেও দাহ্য নয়। নাইট্রোজেন-পূর্ণ গ্যাসজারের ভিতর একটি জ্বলন্ত শলাকা প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায়। লোহিত-তপ্ত ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতু নাইট্রোজেনের সহিত যুক্ত হয় এবং এই বিক্রিয়াজাত পদার্থকে নাইট্রাইড বলা হয় : $3Ca+N_2=Ca_3N_2$ ; $3Mg+N_2=Mg_3N_2$ ।

এই নাইট্রাইডগুলি জলের সহিত ক্রিয়া করিয়া অ্যামোনিয়া গঠন করে।

$$Mg_3N_2+6H_2O=2NH_3+3Mg(OH)_2$$

তড়িৎস্ফুলিঙ্গের সংস্পর্শে উচ্চ তাপমাত্রায় নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন যুক্ত হইয়া নাইট্রিক অক্সাইড গঠন করে। $N_2+O_2\rightleftharpoons 2NO$

হাইড্রোজেনের সহিত ( পৃ: 52 ) নাইট্রোজেন সরাসরি যুক্ত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করে।

**বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বিচ্ছিন্ন করিবার কয়েকটি সরল বিক্রিয়া :**

বায়ু যে একটি মিশ্রণ তাহা তোমরা জান।

কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জলীয় বাষ্প-বিমুক্ত বায়ু লোহিত-তপ্ত **কপারের** উপর দিয়া প্রবাহিত করাইলে বায়ুর অক্সিজেন উত্তপ্ত কপারের সহিত যুক্ত হইয়া অক্সাইডে পরিণত হয় ; $2Cu+O_2=2CuO$ । নাইট্রোজেন অবিকৃত থাকে।

বায়ুতে **পারদ** উত্তপ্ত করিলে বা **ফস্‌ফরাসকে** বায়ুতে পোড়াইলে বায়ুর অক্সিজেনের সহিত পারদ বা ফসফরাস যুক্ত হয় কিন্তু নাইট্রোজেন অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকিয়া যায়। $2Hg+O_2=2HgO$, $4P+5O_2=2P_2O_5$

**উপযুক্ত শোষক** দ্বারা বায়ু হইতে অক্সিজেনকে শোষণ করিয়া লইলে বায়ু হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

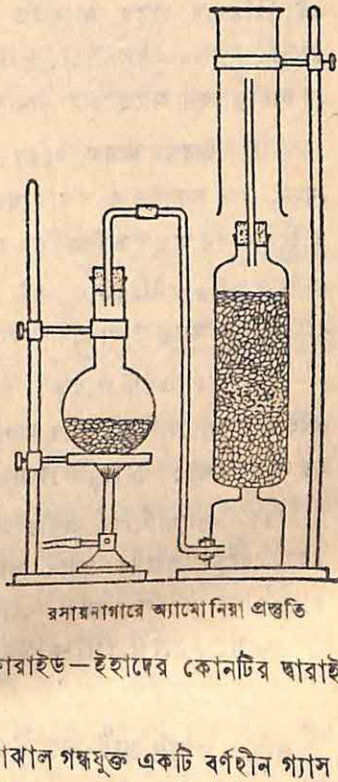
## 8-4. অ্যামোনিয়া ( Ammonia )

সংকেত $NH_3$, আণবিক গুরুত্ব 17, প্রমাণ ঘনত্ব লিটার-প্রতি 0·771 গ্রাম।

বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প পরিমাণে অ্যামোনিয়া আছে। নাইট্রোজেন-ঘটিত জৈব যৌগের পচনে অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়। প্রস্রাবাগারে এবং আস্তাবলে, অ্যামোনিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। জীবজন্তুর মূত্রে ইউরিয়া নামক একটি জৈব যৌগ বর্তমান। ইহার উপর জীবাণুর ক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম কার্বনেট গঠিত হয়। এই অ্যামোনিয়াম কার্বনেট ধীরে ধীরে বিযোজিত হইয়া অ্যামোনিয়া উৎপন্ন করিয়া থাকে এবং ফলে এই গন্ধের সৃষ্টি হয়। কয়লার পাতনে এই গ্যাস উপজাত হিসাবে পাওয়া যায়।

**প্রস্তুতি ঃ** সাধারণত অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এবং শুষ্ক কলিচুনের (slaked lime) মিশ্রণ একটি কূপীতে উত্তপ্ত করিয়া **রসায়নাগারে** অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করা হয়। $2NH_4Cl + Ca(OH)_2 = 2NH_3 + CaCl_2 + 2H_2O$

নির্গত গ্যাসকে পোড়াচুনে ( quick lime, CaO ) পূর্ণ একটি স্তম্ভের ( tower ) ভিতর দিয়া প্রবাহিত করান হয়। পোড়াচুন অ্যামোনিয়ার সহিত যে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত থাকে তাহা শুষিয়া লইবে। বায়ুর নিম্নভ্রংশ দ্বারা এই শুষ্ক অ্যামোনিয়া গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়।



রসায়নাগারে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি

অ্যামোনিয়া একটি ক্ষারক। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত ইহা রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাইয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট গঠন করে। অ্যামোনিয়া প্রায় সম্পূর্ণরূপে বিশুষ্ক এবং অতি বিশুদ্ধ না হইলে ফস্‌ফরাস পেণ্টক্সাইডের সহিত বিক্রিয়া করে। আবার ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা অ্যামোনিয়া শোষিত হয় এবং $CaCl_2, 8NH_3$ এই যুতযৌগটি উৎপন্ন হয়। তাই গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, ফস্‌ফরাস পেণ্টক্সাইড বা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড—ইহাদের কোনটির দ্বারাই অ্যামোনিয়া গ্যাস শুষ্ক করা যায় না।

**ধর্ম ঃ ভৌত ধর্ম** – অ্যামোনিয়া তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস। শৈত্য বা চাপের প্রভাবে ইহাকে সহজেই তরলে পরিণত করা যায়। ইহা বায়ু অপেক্ষা হাল্‌কা।

জলে ইহার দ্রাব্যতা খুব বেশী। 0° ডিগ্রীতে জল উহার 1148 গুণ আয়তনের অ্যামোনিয়াকে দ্রবীভূত করিতে পারে। অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ক্ষারীয় ধর্মসম্পন্ন। ইহার সংস্পর্শে লাল লিটমাস নীল হয়।

অ্যামেনিয়ার গাঢ় জলীয় দ্রবণকে লাইকার অ্যামোনিয়া ( liquor ammonia ) বলে।

**রাসায়নিক ধর্ম :** (i) অ্যামোনিয়া নিজে বায়ুতে দহনশীল নয়, অপরের দহনেও সাহায্য করে না। অক্সিজেনে ইহা সবুজাভ হলুদ শিখায় জ্বলে। অ্যামোনিয়া এবং অক্সিজেনের মিশ্রণ বিস্ফোরক, মিশ্রণে অগ্নিসংযোগ করিলে মৃদু ( feeble ) বিস্ফোরণ ঘটে : $4NH_3+3O_2=6H_2O+2N_2$ ।

(ii) উত্তপ্ত ক্ষারীয় ধাতু এবং বেরিয়াম অ্যামোনিয়াকে বিযোজিত করে। এই বিক্রিয়ায় ধাতুর অ্যামাইড গঠিত হয় এবং হাইড্রোজেন নির্গত হয় ; $2NH_3+2Na=2NaNH_2+H_2$ । এই বিক্রিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়াতে যে হাইড্রোজেন আছে তাহা প্রমাণ করা যায়।

(iii) উত্তপ্ত অনেক ধাতব অক্সাইডকে অ্যামোনিয়া বিজারিত করে। যেমন, লেড অক্সাইড বা কপার অক্সাইডের উপর দিয়া অ্যামোনিয়া প্রবাহিত করিলে ধাতব অক্সাইড বিজারিত হইয়া ধাতুতে পরিণত হয় : $3CuO+2NH_3=3Cu+N_2+3H_2O$ । এই বিক্রিয়ার সাহায্যে অ্যামোনিয়াতে যে নাইট্রোজেন আছে তাহা প্রমাণ করা যায়।

(iv) ইহা একটি ক্ষারক। ইহার সহিত অ্যাসিডের সরাসরি বিক্রিয়া ঘটে এবং ফলে অ্যামোনিয়ার লবণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই বিক্রিয়ায় জল উৎপন্ন হয় না। যথা : $NH_3+HCl=NH_4Cl$ ( অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড )।

(v) অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ক্ষারের ন্যায় আচরণ করে। কোন কোন ধাতুর লবণের দ্রবণে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ যোগ করিলে ধাতব হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। যথা :

$FeCl_3+3NH_4OH=Fe(OH)_3$(ফেরিক হাইড্রক্সাইড)$\downarrow+3NH_4Cl$.

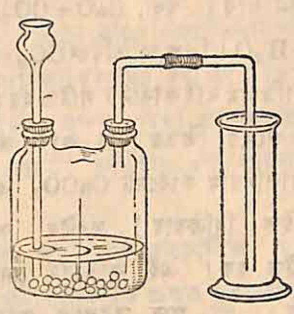
## 8-5. কার্বন ডাই-অক্সাইড ( Carbon dioxide )

সংকেত $CO_2$ । 1783 খ্রীষ্টাব্দে ল্যাভয়সিয়ে প্রমাণ করেন যে ইহা কার্বনের একটি অক্সাইড। বায়ুতে আয়তন হিসাবে শতকরা 0·03 ভাগ কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্তমান। যুক্ত অবস্থায় কার্বনেটরূপে ইহা চুনাপাথর ( limestone ), ম্যাগনেসাইট, ডলোমাইট প্রভৃতিতে পাওয়া যায়।

**প্রস্তুতি :** ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপর শীতল ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় **রসায়নাগারে** কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রস্তুত করা হয়।

$$CaCO_3+2HCl=CaCl_2+H_2O+CO_2$$

**পরীক্ষা :** একটি উল্‌ফ বোতলের ( হাইড্রোজেন প্রস্তুতির সদৃশ ) মধ্যে মার্বেলের ( ক্যালসিয়াম কার্বনেট ) ছোট ছোট টুকরা লও এবং জল ঢালিয়া ডুবাইয়া রাখ। দীর্ঘ-নাল ফানেলের মাধ্যমে মোটামুটি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢালিয়া দাও। মার্বেল অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্‌বুদ্‌ সহকারে গ্যাস নির্গত হয়। ইহাকে বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের ( অ্যামোনিয়ার ঠিক বিপরীত ) দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ কর।



রসায়নাগারে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতি

মার্বেল হইতে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতিতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিবর্তে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় না। কারণ, প্রথমে মার্বেল এবং সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় বটে, কিন্তু এই বিক্রিয়াজাত অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম সালফেট অপরিবর্তিত মার্বেলকে ঢাকিয়া ফেলে এবং ইহার ফলে অ্যাসিড আর মার্বেলের সংস্পর্শে আসিতে পারে না। সুতরাং কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপাদনের বিক্রিয়াটি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়।

**ধর্ম ঃ ভৌত ধর্ম ঃ** (i) কার্বন ডাই-অক্সাইড বর্ণহীন, ঈষৎ অম্লস্বাদযুক্ত এবং মৃদু ঝাঁঝাল ঘ্রাণবিশিষ্ট গ্যাস। (ii) ইহার বাষ্প-ঘনত্ব 22, অর্থাৎ বায়ু অপেক্ষা দেড় গুণ ভারী। অগ্নিশিখা নিভাইবার জন্য ইহাকে শিখার উপর ঢালা যাইতে পারে। (iii) ইহা শ্বাসকার্যে সহায়তা করে না, এই গ্যাসের ভিতর জীবজন্তু দম বন্ধ হইয়া মরিয়া যায়। (iv) চাপ প্রয়োগে ইহাকে সহজেই তরলে ( $31^\circ$ ডিগ্রীর নীচে ) পরিণত করা যায়। তরল কার্বন ডাই-অক্সাইডকে দ্রুত বাষ্পীভূত করিলে ইহার একাংশ জমিয়া কঠিন অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। কঠিন এই কার্বন ডাই-অক্সাইডকে 'শুকনো বরফ' (dry ice) বলা হয়। (v) ইহা জলে দ্রবণীয়, চাপ বৃদ্ধি করিলে ইহার দ্রবণীয়তা বৃদ্ধি পায়। বর্ধিত চাপে অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত করিয়া সোডা ওয়াটার, লেমোনেড প্রস্তুত করা হয়।

**রাসায়নিক ধর্ম ঃ** (i) ইহা একটি আম্লিক অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ অ্যাসিডের ন্যায় আচরণ করে। এই জলীয় দ্রবণে নীল লিটমাস অনুজ্জ্বল লাল হয়। কারণ, কার্বন ডাই-অক্সাইড জলের সহিত মৃদু ও অস্থায়ী কার্বনিক অ্যাসিড গঠন করে ; $CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3$ ।

এই গ্যাস বিভিন্ন ক্ষারক এবং ক্ষারের সহিত বিক্রিয়া করিয়া কার্বনেটসমূহ গঠন করে। যথা, $CaO + CO_2 \rightleftharpoons CaCO_3$ ; $2NaOH + CO_2 = Na_2CO_3 + H_2O$। কিন্তু অতিরিক্ত $CO_2$-এর সহিত কষ্টিক সোডার বিক্রিয়ায় স্বল্প দ্রবণীয় সোডিয়াম বাইকার্বনেট গঠিত হয়: $Na_2CO_3 + H_2O + CO_2 \rightleftharpoons 2NaHCO_3$। চুন-জলের ভিতর দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রবাহিত করিলে প্রথমে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম কার্বনেট $CaCO_3$ এবং পরে ( অতিরিক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত বিক্রিয়ায় ) দ্রবণীয় ক্যালসিয়াম বাই-কার্বনেট $Ca(HCO_3)_2$ গঠিত হয়। এই কারণেই চুন জল প্রথমে ঘোলাটে এবং পরে স্বচ্ছ হইয়া যায়। এই স্বচ্ছ তরলকে ফুটাইলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং তরলটি পুনরায় ঘোলাটে হয়: $Ca(OH)_2 + CO_2 = CaCO_3 + H_2O$ ; $CaCO_3 + H_2O + CO_2 \overset{*}{\rightleftharpoons} Ca(HCO_3)_2$ ।

(ii) কার্বন ডাই-অক্সাইডকে যদি লোহিত তপ্ত কার্বন, জিঙ্ক বা লৌহ-চূর্ণের উপর দিয়া প্রবাহিত করান হয়, তবে উহা বিজারিত হইয়া কার্বন মনোক্সাইডে পরিণত হয়। যথা, $CO_2 + C = 2CO$

(iii) ইহা দহনের সহায়ক বা নিজে দাহ্য নহে। কার্বন ডাই-অক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজারে জলন্ত কাঠি প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায় এবং গ্যাসও জলে না। কিন্তু জলন্ত ম্যাগনেসিয়াম বা পটাসিয়াম বা সোডিয়াম ইহার ভিতর যথারীতি জলিতে থাকে এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড হইতে বিশুদ্ধ কার্বন মুক্ত হয়। $2Mg + CO_2 = 2MgO + C$ ; $4K + 3CO_2 = 2K_2CO_3 + C$

এই বিক্রিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

## 8.6. হাইড্রোজেন সালফাইড ( Hydrogen sulphide ), $H_2S$

বায়ুমণ্ডলে অতি স্বল্পপরিমাণে হাইড্রোজেন সালফাইড বর্তমান। সিলভার সালফাইডের বর্ণ কালো এবং বায়ুতে রৌপ্য দ্রব্যের উপর সিলভার সালফাইডের আস্তরণ পড়ে বলিয়া রৌপ্য দ্রবগুলি কালোবর্ণ ধারণ করে। আগ্নেয়গিরি হইতে উৎপন্ন গ্যাসে এবং অনেক প্রস্রবণের জলে হাইড্রোজেন সালফাইড বর্তমান। সালফারঘটিত যৌগগুলির পচনেও হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয়। চামড়া, পচা ডিম ইত্যাদির দুর্গন্ধ অংশত হাইড্রোজেন সালফাইডের জন্য।

**প্রস্তুতি** (Preparation): একটি দীর্ঘনাল ফানেল ও একটি নির্গম-নল-যুক্ত উল্ফ বোতলে ( কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুতির সদৃশ, পৃঃ 57 ) ফেরাস সালফাইডের সহিত লঘু সালফিউরিক অথবা ( অপেক্ষাকৃত শ্রেয় ) লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় **রসায়নাগারে** হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত

* Principles of Chemistry—7th. Edn. by Profs. Hildebrand & Powell, *University of California*, Berkeley—Page 250.

করা হয়। ফেরাস সালফাইড অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসা মাত্রই হাইড্রোজেন সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং উহা নির্গম নলের মাধ্যমে বোতলের বাহিরে আসিতে থাকে; $FeS + 2HCl = FeCl_2 + H_2S$। হাইড্রোজেন সালফাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া ইহা বায়ুর ঊর্ধ্বভ্রংশের দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। ইহা জলে মোটামুটি দ্রবণীয় কিন্তু উষ্ণ জলে অদ্রবণীয়। সুতরাং ইহা গ্যাসজারে উষ্ণ জলের অপসারণের দ্বারাও সংগ্রহ করা যায়। ফস্‌ফরাস পেণ্টক্সাইড দ্বারা গ্যাসটি শুষ্ক করা যায়।

অ্যান্টিমনি সালফাইডের চূর্ণের সহিত গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করিয়া হাইড্রোজেন বিমুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করা যায়।

$$Sb_2S_3 + 6HCl = 2SbCl_3 + 3H_2S$$

**ধর্ম ঃ ভৌত ধর্ম ঃ** হাইড্রোজেন সালফাইড পচা ডিমের গন্ধযুক্ত একটি বর্ণহীন গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী। শীতল জলে মোটামুটি দ্রাব্য, উষ্ণ জলে ইহা অদ্রাব্য। ইহা একটি বিষাক্ত গ্যাস, বহুক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিলে এমন কি মৃত্যুও ঘটিতে পারে।

**রাসায়নিক ধর্ম ঃ** (i) হাইড্রোজেন সালফাইড নিজে দাহ্য, কিন্তু অপরের দহনে সহায়ক নহে। পর্যাপ্ত অক্সিজেনে ইহা নীল শিখায় জলিয়া সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে; $2H_2S + 3O_2 = 2H_2O + 2SO_2$। কিন্তু গ্যাসজারে জলিলে (অর্থাৎ কম অক্সিজেনে), জারের ভিতর সালফার জমিতে থাকে : $2H_2S + O_2 = 2H_2O + 2S$।

(ii) হাইড্রোজেন সালফাইডের জলীয় দ্রবণ একটি মৃদু অম্ল। ক্ষারীয় পদার্থের সহিত রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুই প্রকারের লবণ গঠিত হয়।

$2NaOH + H_2S = Na_2S + 2H_2O$, $Na_2S + H_2S = 2NaHS$

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইড একটি বিজারক। ক্লোরিন-জল বা ব্রোমিন-জল বা জলে ভাসমান আয়োডিনের ভিতর দিয়া হাইড্রোজেন সালফাইড প্রবাহিত করিলে, সালফার অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং হ্যালোজেন হ্যালোজেন-হাইড্রাসিডে বিজারিত হয় : $Cl_2 + H_2S = 2HCl + S$ ; $I_2 + H_2S = 2HI + S$

আর্দ্র সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রিক অ্যাসিড, গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড প্রভৃতি হাইড্রোজেন সালফাইড দ্বারা বিজারিত হয়। $SO_2 + 2H_2S = 2H_2O + 3S$ ; $2HNO_3 + H_2S = 2H_2O + 2NO_2 + S$ ; $H_2SO_4 + H_2S = 2H_2O + SO_2 + S$।

এই বিজারণ ক্রিয়ার দরুন গ্যাসটির প্রস্তুতিকরণে নাইট্রিক অ্যাসিড বা উহাকে বিশুষ্ক করিতে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় না।

ইহা ফেরিক ক্লোরাইড বা অ্যাসিডমিশ্রিত পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ বিজারিত করিয়া বিরঞ্জিত করে। $2FeCl_3 + H_2S = 2FeCl_2 + 2HCl + S$; $2KMnO_4 + 3H_2SO_4 + 5H_2S = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 8H_2O + 5S$.

বিভিন্ন পরিবেশে ধাতব লবণের দ্রবণ হইতে হাইড্রোজেন সালফাইডের ক্রিয়ায় বহু ধাতু বিশিষ্ট রঙের ধাতব সালফাইড হিসাবে অধঃক্ষিপ্ত হয়। যথা :

$$CuSO_4 + H_2S = CuS \text{ ( কালো অধঃক্ষেপ )} + H_2SO_4.$$

## 8-7. সালফার ডাই-অক্সাইড ( Sulphur dioxide ), $SO_2$

গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে পারদ উত্তপ্ত করিয়া বিজ্ঞানী প্রিস্টলী 1774 খ্রীষ্টাব্দে এই গ্যাস প্রস্তুত করেন। আগ্নেয়গিরি হইতে উত্থিত গ্যাসে এবং কোন কোন প্রস্রবণের জলে ইহার অস্তিত্ব দেখা যায়। শিল্পাঞ্চলের বায়ুতেও এই গ্যাস বিদ্যমান। বায়ুতে সালফার, খনিজ সালফাইড যেমন লৌহ মাক্ষিক ( আয়রন পাইরাইটিজ, $FeS_2$ ) দগ্ধ করিলে এই গ্যাসটি উৎপন্ন হয় : $S + O_2 = SO_2$ ; $4FeS_2 + 11O_2 = 2Fe_2O_3 + 8SO_2$.

**প্রস্তুতি :** তামার দ্বারা গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডকে বিজারিত করিয়া রসায়নাগারে ইহা প্রস্তুত করা হয়।

$$Cu + 2H_2SO_4 = CuSO_4 + 2H_2O + SO_2.$$

একটি দীর্ঘনাল ফানেল এবং নির্গমনলযুক্ত কূপীতে ( নাইট্রোজেন প্রস্তুতি, পৃঃ 53 ) তামার ছিবড়া এবং গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড একত্রে উত্তপ্ত করা হয়। গ্যাস উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইলেই তাপ দেওয়া বন্ধ করা হয়। ইহা জলে দ্রাব্য এবং বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া বায়ুর উর্ধ্বভ্রংশের ( $CO_2$-প্রস্তুতি, পৃঃ 57 ) দ্বারা গ্যাসজারে সংগ্রহ করা হয়। সালফিউরিক অ্যাসিডে পূর্ণ গ্যাসধাবকের ভিতর দিয়া গ্যাসটিকে প্রবাহিত করাইয়া পারদের উপর সংগ্রহ করিলে শুষ্ক এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ গ্যাস পাওয়া যায়। এই গ্যাসকে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড বা ফস্‌ফরাস পেন্টক্সাইড দ্বারাও শুষ্ক করা যাইতে পারে।

সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইটের সহিত তীব্র অ্যাসিডের ( যেমন গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড ) বিক্রিয়ায় রসায়নাগারে সহজেই সালফার ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করা যাইতে পারে। $NaHSO_3 + H_2SO_4 = NaHSO_4 + SO_2 + H_2O$ ; এই বিক্রিয়ায় তাপ প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না।

**ধর্ম : ভৌতধর্ম :** সালফার ডাই-অক্সাইড একটি বর্ণহীন, শ্বাসরোধী গন্ধযুক্ত গ্যাস। ইহা বায়ু অপেক্ষা ভারী এবং জলে দ্রাব্য। হিমমিশ্রণে শীতল করিলে কিংবা স্বাভাবিক উষ্ণতাতেই চাপ প্রয়োগ করিলে ইহা সহজেই তরলে পরিণত হয়।

**রাসায়নিক ধর্ম :** ইহা সাধারণত দহনশীল বা দহনের সহায়কও নহে। কিন্তু প্রভাবকঘটিত (প্লাটিনাম, ভ্যানেডিয়াম পেণ্টক্সাইড ইত্যাদির উপস্থিতিতে) জারণে ইহা সালফার ট্রাই-অক্সাইডে পরিণত হয় : $2SO_2+O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$। উত্তপ্ত পটাসিয়াম, এবং লৌহ বা টিনের চূর্ণ গ্যাসের মধ্যে জ্বলে : $4K+3SO_2 = K_2SO_3+K_2S_2O_3$, $3Fe+SO_2=2FeO+FeS$।

সালফার ডাই-অক্সাইডের জলীয় দ্রবণ আম্লিক, জলের সহিত ইহা একটি মৃদু ও অস্থায়ী অ্যাসিড গঠন করে ; ইহার সংস্পর্শে নীল লিটমাস লাল হয়। $SO_2+H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$ ( সালফিউরাস অ্যাসিড )। সালফিউরাস অ্যাসিড ক্ষারের সহিত দুই রকমের লবণ গঠন করে। চুনজলের সহিত প্রথমে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম সালফাইট এবং পরে ( অতিরিক্ত গ্যাসে ) দ্রাব্য ক্যালসিয়াম বাই-সালফাইট গঠিত হয়। এইজন্য চুনজল প্রথমে ঘোলাটে এবং পরে স্বচ্ছ হইয়া যায় : $Ca(OH)_2+SO_2=CaSO_3+H_2O$, $CaSO_3+SO_2+H_2O=Ca(HSO_3)_2$।

ইহা সাধারণতঃ একটি বিজারক। ইহার ক্রিয়ায় ফেরিক ক্লোরাইড (হলুদ), পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট দ্রবণ (বেগুনী) বিজারিত হইয়া বর্ণহীন হয়। সেইরূপে ডাইক্রোমেটও ( অ্যাসিডযুক্ত ) বিজারিত হয়, কমলা রঙের দ্রবণ সবুজ বর্ণ ধারণ করে। $2FeCl_3+SO_2+2H_2O=2FeCl_2+2HCl+H_2SO_4$, $2KMnO_4 + 5SO_2 + 2H_2O = K_2SO_4 + 2MnSO_4 + 2H_2SO_4$, $K_2Cr_2O_7 + 3SO_2 + H_2SO_4 = K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + H_2O$। ক্লোরিন, ব্রোমিন এবং আয়োডিনকে সালফার ডাই-অক্সাইড উহাদের হাইড্রাসিডে বিজারিত করে ; $Cl_2+SO_2+2H_2O=2HCl+H_2SO_4$। সালফার ডাই-অক্সাইড আবার জারক হিসাবেও কার্য করিতে পারে ; যেমন হাইড্রোজেন সালফাইডকে ( পৃঃ 59 ) ইহা জারিত করে।

জলের উপস্থিতিতে ইহা একটি মৃদু বিরঞ্জক হিসাবে কাজ করে। এইজন্য পশম, রেশমের ন্যায় কোমল দ্রব্যসামগ্রী যাহা ক্লোরিনের ক্রিয়ায় বিনষ্ট হইতে পারে উহাদিগকে বিরঞ্জিত করিতে ইহা ব্যবহৃত হয়।

# প্রশ্নাবলী

## অক্সিজেন

1. অক্সিজেন প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি বর্ণনা কর। অক্সিজেনের প্রধান প্রধান ধর্মাবলী বিবৃত কর।

2. কাচের একটি শক্ত পরীক্ষা-নলে মারকিউরিক অক্সাইডকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করিলে একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন গ্যাস নির্গত হয়। গ্যাসটির নাম কি? বিক্রিয়াটির সমীকরণ লিখ। পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে ঐ গ্যাস প্রস্তুত করিবার রসায়নাগার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

3. পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে রসায়নাগারে কিভাবে অক্সিজেন প্রস্তুত করা হয় তাহা বর্ণনা কর। পটাসিয়াম ক্লোরেটের সহিত ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত করা হয় কেন? 'অক্সিজেন' শব্দের অর্থ 'অ্যাসিড উৎপাদক'। এই নাম যে যথার্থ তাহা দুইটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও। আবার এই নাম যে সার্থক নহে তাহাও দুইটি উদাহরণের সাহায্যে দেখাও।

4. এইরূপ তিনটি পদার্থের নাম কর যাহাদিগকে এককভাবে কিংবা অন্য পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তপ্ত করিলে অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। পরিবর্তনগুলি সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ কর। তাপ প্রয়োগ না করিয়া অক্সিজেন প্রস্তুত করা যায় কি? সংশ্লিষ্ট একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্নিহিত বিক্রিয়াটির সমীকরণ লিখ।

5. যখন—

(i) নাইট্রিক অক্সাইডপূর্ণ গ্যাসজার বায়ুতে খোলা হয়;

(ii) কার্বন, সালফার, সোডিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম পৃথক্ পৃথক্ভাবে অক্সিজেনে দগ্ধ করা হয়;

—তখন কি কি ঘটে তাহা সমীকরণ সহ বিবৃত কর।

6. বায়ু হইতে (a) ভৌত এবং (b) রাসায়নিক পদ্ধতিতে কিরূপে অক্সিজেন বিচ্ছিন্ন করিতে পারা যায় তাহা অতি সংক্ষেপে নির্দেশ কর।

[ ইঙ্গিত: তরল বায়ুর আংশিক পাতন; $Hg \xrightarrow{\text{বায়ু}} HgO \xrightarrow{\text{তাপ}} O_2$ ]

সালফার, সোডিয়াম এবং হাইড্রোজেন পৃথক্ পৃথক্ভাবে অক্সিজেনে দগ্ধ করা হইল। দেখাও যে উৎপন্ন অক্সাইডগুলি শ্রেণীগতভাবে পরস্পর অসদৃশ।

[ ইঙ্গিত: জলের সংস্পর্শে লিটমাসের বর্ণের পরিবর্তন ঘটে না। ]

## হাইড্রোজেন

1. হাইড্রোজেন প্রস্তুত করিবার রসায়নাগার পদ্ধতি বর্ণনা কর। উহার প্রধান প্রধান ধর্মাবলী বিবৃত কর।

2. অ্যাসিডের হাইড্রোজেন যে প্রতিস্থাপনযোগ্য তাহা একটি পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও। সংগৃহীত গ্যাস হাইড্রোজেন কি-না তাহা কিরূপে পরীক্ষা করিবে? জায়মান হাইড্রোজেন বলিতে কি বুঝ? কি প্রকারে প্রমাণ করিবে যে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন অপেক্ষা ইহা অধিক সক্রিয়?

## নাইট্রোজেন

1. নাইট্রোজেন প্রস্তুতির রসায়নাগার পদ্ধতি বর্ণনা কর। ইহার ধর্মাবলী সম্পর্কে যাহা জান সংক্ষেপে লিখ।

2. বায়ু হইতে নাইট্রোজেন বিচ্ছিন্ন করিবার রাসায়নিক পদ্ধতিসমূহের অন্তর্নিহিত মূল বিক্রিয়া সমীকরণ সহ উল্লেখ কর। ল্যাভয়সিয়ে ইহাকে 'অ্যাজোট' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন কেন? ইহার আধুনিক নাম 'নাইট্রোজেন' দেওয়া হইয়াছে কেন? ইহার দুইটি ভৌত এবং তিনটি রাসায়নিক ধর্ম বিবৃত কর।

3. কি কি শর্তে নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সহিত নাইট্রোজেনের বিক্রিয়া ঘটে এবং এই বিক্রিয়াসমূহে কি কি পদার্থই বা উৎপন্ন হয় তাহা সমীকরণ সহ বর্ণনা কর:

(i) হাইড্রোজেন, (ii) অক্সিজেন, (iii) ক্যালসিয়াম এবং (iv) ম্যাগনেসিয়াম?

4. একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে উত্তপ্ত ম্যাগনেসিয়ামের উপর দিয়া প্রবাহিত করাইলে ম্যাগনেসিয়াম ঐ গ্যাসকে শোষণ করে। এই বিক্রিয়াজাত পদার্থের সহিত জলের বিক্রিয়ায় একটি নূতন গ্যাস উৎপন্ন হয়। নূতন গ্যাসকে আবার উত্তপ্ত কপার অক্সাইডের উপর দিয়া চালনা করিলে মূল গ্যাসটি ফিরিয়া পাওয়া যায়। মূল গ্যাসটি কি? বিক্রিয়াগুলি সমীকরণ সহ উল্লেখ করিয়া প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।

[ইঙ্গিত: $NH_3 \xrightarrow{\text{উত্তপ্ত } CuO} N_2$, অ্যামোনিয়া দ্রষ্টব্য]

## অ্যামোনিয়া

1. শুষ্ক অ্যামোনিয়া কি প্রকারে রসায়নাগারে প্রস্তুত করা হয়? গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড অথবা ফসফরাস পেণ্টক্সাইড অথবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দ্বারা অ্যামোনিয়াকে শুষ্ক করা যায় না কেন?

2. কিরূপে এবং কি অবস্থায় অ্যামোনিয়া নিম্নলিখিত পদার্থগুলির সহিত বিক্রিয়া করে:
কপার অক্সাইড, সোডিয়াম এবং অক্সিজেন?—সমীকরণসমূহ লিখ।

3. সমীকরণ সহ বিক্রিয়া বর্ণনা কর যাহার সাহায্যে বলা যায় যে—

(a) অ্যামোনিয়া একটি বিজারক হিসাবে কাজ করিতে পারে,

(b) অ্যামোনিয়াতে নাইট্রোজেন আছে, এবং

(c) অ্যামোনিয়াতে হাইড্রোজেন আছে।

## কার্বন ডাই-অক্সাইড

1. রসায়নাগারে কিভাবে কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রস্তুত করা হয় তাহা বর্ণনা কর। এই পদ্ধতিতে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহার না করিয়া হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হয় কেন? কার্বন ডাই-অক্সাইডের গুরুত্বপূর্ণ ধর্মাবলী বিবৃত কর।

2. 'শুকনো বরফ' কাহাকে বলে? সোডাওয়াটার বোতলের ছিপি খুলিলে বুদ্‌বুদন আরম্ভ হয় কেন?

সমীকরণ সহ এইরূপ একটি বিক্রিয়া উল্লেখ কর যাহা কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের অস্তিত্ব নির্দেশ করে।

3. নিম্নলিখিত ক্রিয়াগুলিতে কি কি ঘটে তাহা সমীকরণ সহ বর্ণনা কর:—

(i) চুনজলের ভিতর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ক্রমাগত প্রবাহিত করা হয় এবং অবশেষে উহাকে ফুটান হয়;

(ii) লোহিত তপ্ত কার্বনের উপর দিয়া কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করা হয়;

(iii) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের ফিতা কার্বন ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ জারের ভিতর প্রবেশ করান হয়।

## হাইড্রোজেন সালফাইড

1. রসায়নাগারে হাইড্রোজেন সালফাইড কিরূপে প্রস্তুত করা হয়? ইহাকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড দ্বারা বিশুষ্ক করা যায় না কেন? ইহার একটি ভৌত এবং দুইটি রাসায়নিক ধর্ম বর্ণনা কর।

2. হাইড্রোজেন বিমুক্ত হাইড্রোজেন সালফাইড প্রস্তুত করিবার পদ্ধতি-সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটি সমীকরণ সহ বিবৃত কর।

গ্যাসটি প্রস্তুত করিতে নাইট্রিক অ্যাসিড ব্যবহৃত হয় না কেন?

3. হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস (i) নাইট্রিক অ্যাসিড, (ii) জলে ভাসমান আয়োডিন, (iii) গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড, এবং (iv) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণের ভিতর দিয়া পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে প্রবাহিত করাইলে যে পরিবর্তনগুলি ঘটে তাহা বিবৃত কর। প্রতিটি বিক্রিয়ার সমীকরণ লিখ।

## সালফার ডাই-অক্সাইড

1. রসায়নাগারে সালফার ডাই-অক্সাইড কিরূপে প্রস্তুত করা হয়? এই গ্যাসকে শুষ্ক এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ কিরূপে করিবে? ইহার প্রধান প্রধান ধর্মাবলী বিবৃত কর।

2. যখন সালফারকে বা পাইরাইটিজকে বায়ুতে দগ্ধ করা হয় এবং সোডিয়াম হাইড্রোজেন সালফাইটের সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড ক্রিয়া করে, তখন শ্বাসরোধী গন্ধযুক্ত বর্ণহীন একটি গ্যাস নির্গত হয়। আনুষঙ্গিক বিক্রিয়াগুলি সমীকরণ সহ উল্লেখ কর। এই গ্যাসটি রসায়নাগারে সাধারণত কিভাবে প্রস্তুত করা হয় তাহা বর্ণনা কর।

3. যখন সালফার ডাই-অক্সাইড (i) ক্লোরিন-জল, (ii) পটাসিয়াম, (iii) ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ, (iv) হাইড্রোজেন সালফাইড এবং (v) চুনজলের সহিত পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে ক্রিয়া করে তখন কি কি পরিবর্তন ঘটে সমীকরণ সহ উল্লেখ কর।

## বিষয়মূলক পরীক্ষার প্রশ্নের কয়েকটি নমুনা

**A. Alternate response type :**

(i) *True or False type* :

(a) অক্সিজেন নিজে দাহ্য নহে, দহনের সহায়ক। —

(b) হাইড্রোজেন দহনের সহায়ক নহে কিন্তু নিজে দাহ্য। —

(c) জ্বলন্ত ম্যাগনেসিয়ামের ফিতা কার্বন ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ জারের ভিতর প্রবেশ করাইলে উহা নিভিয়া যায়। —

(ii) *Yes or No type* :

(a) হাইড্রোজেন সালফাইড কি বিজারক হিসাবে কার্য করিতে পারে? —

(b) অ্যামোনিয়াকে কি গাঢ় $H_2SO_4$ বা $P_2O_5$ বা $CaCl_2$ দ্বারা শুষ্ক করা যায়? —

(c) শুধু পটাসিয়াম ক্লোরেটকে উত্তপ্ত করিয়া কি অক্সিজেন প্রস্তুত করা যাইতে পারে? —

**B. Recall type**

(i) রসায়নাগারে পটাসিয়াম ক্লোরেট হইতে অক্সিজেন প্রস্তুতিতে ম্যাঙ্গানিজ ডাই-অক্সাইড — হিসাবে কার্য করে। —

(ii) — হাইড্রোজেন গ্যাসীয় হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিক সক্রিয়। —

(iii) হাইড্রোজেন সালফাইডের সহিত আর্দ্র সালফার ডাই-অক্সাইডের বিক্রিয়ায় — জারক হিসাবে কার্য করে। —

---

| Zerovalent শূন্য-যোজী | Monovalent এক-যোজী | Divalent দ্বি-যোজী | Trivalent ত্রি-যোজী | Tetravalent চতুর্যোজী | Pentavalent পঞ্চ-যোজী | Hexavalent ষড়-যোজী | Heptavalent সপ্ত-যোজী | Octavalent অষ্ট-যোজী |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| হিলিয়াম | হাইড্রোজেন | নাইট্রোজেন | নাইট্রোজেন | কার্বন | ফস্‌ফরাস | সালফার | ক্লোরিন | অসমিয়াম |
| নিয়ন | ফ্লুয়োরিন | অক্সিজেন | ফস্‌ফরাস | সালফার | ক্লোরিন | ক্রোমিয়াম | ব্রোমিন | |
| আর্গন | ক্লোরিন | সালফার | বোরন | সিলিকন | ব্রোমিন | ম্যাঙ্গানিজ | আয়োডিন | |
| ইত্যাদি | ব্রোমিন | ম্যাগনেসিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | টিন (ষ্ট্যানিক) | আয়োডিন | | ম্যাঙ্গানিজ | |
| | আয়োডিন | ক্যালসিয়াম | আয়রন | লেড (প্লাম্বিক) | | | | |
| | সোডিয়াম | জিঙ্ক | (ফেরিক) | ম্যাঙ্গানিজ | | | | |
| | পটাসিয়াম | কপার | ক্লোরিন, ব্রোমিন | | | | | |
| | কপার | (কিউপ্রিক) | আয়োডিন | | | | | |
| | (কিউপ্রাস) | মারকারি | ক্রোমিয়াম | | | | | |
| | মারকারি | (মারকিউরিক) | ম্যাঙ্গানিজ | | | | | |
| | (মারকিউরাস) | লেড (প্লাম্বাস) | | | | | | |
| | $Hg_2^{++}$ | টিন (ষ্ট্যানাস) | | | | | | |
| | | আয়রন (ফেরাস) | | | | | | |
| | | ক্রোমিয়াম | | | | | | |
| | | ম্যাঙ্গানিজ | | | | | | |

| Monovalent<br>একযোজী | Divalent<br>দ্বি-যোজী | Trivalent<br>ত্রি-যোজী | Tetravalent<br>চতুর্যোজী |
|---|---|---|---|
| হাইড্রক্সিল (OH)<br>নাইট্রেট ($NO_3$)<br>সায়ানাইড (CN)<br>বাই-কার্বনেট ($HCO_3$),<br>বাই-সালফাইট ($HSO_3$),<br>বাই-সালফেট ($HSO_4$)<br>পারম্যাঙ্গানেট ($MnO_4$)<br>মিথাইল ($CH_3$) | কার্বনেট ($CO_3$)<br>সালফাইট ($SO_3$)<br>সালফেট ($SO_4$)<br>ক্রোমেট ($CrO_4$)<br>ডাইক্রোমেট ($Cr_2O_7$) | বোরেট ($BO_3$)<br>ফস্‌ফেট ($PO_4$)<br>ফেরিসায়ানাইড [ $Fe(CN)_6$ ] | ফেরোসায়ানাইড [$Fe(CN)_6$] |